Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: জান্নাত

রোলঃ 23100120172

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোসা: জান্নাত

রোলঃ 23100120172

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোসা: জান্নাত, আইডিঃ 23100120172 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মোসা: জান্নাত

আইডিঃ 23100120172

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5

- কেন ইসলামি পরিবার গঠন জরুরি:.....7
- বর্তমান সমাজে পারিবারিক সংকট:.....8
- কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব:.....10

থিসিস লেখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:.....11

সারসংক্ষেপ:.....12

প্রথম অধ্যায়: পরিবার.....13

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে দ্বীনি ইলম এর অপরিহার্যতা.....45

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামীর বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ.67

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে স্ত্রীর বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ....160

পঞ্চম অধ্যায়: পারিবারিক সমস্যার কারণ ও সমাধান.....173

ষষ্ঠ অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) শিশুর জন্মের আগে ও পরে করনীয় দায়িত্ব.....209

সপ্তম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য.....224

অষ্টম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান ও সচ্চরিত্র গঠন.....242

নবম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং)সন্তানদের ধর্মীয় অনুশাসনে অভ্যস্ত করা.....257

দশম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের সুন্নাতী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা.....266

একাদশ অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা.....271

দ্বাদশ অধ্যায়: তরুণ ছেলেমেয়েদের কিছু সমস্যা ও সমাধান.....275

পরিশিষ্ট.....280

উপসংহার.....283

তথ্যসূত্র.....285

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লহর নামে শুরু করছি।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা ও আমাদের কর্মসমূহের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হিদায়াত দেওয়ারও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম নাযিল হোক তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তার সাহাবীদের ওপর এবং যারা কিয়ামত অবধি ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের ওপর।

মানবসভ্যতার ইতিহাসের প্রথম যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছিলেন, তা হলো *'পরিবার'*। আদি পিতা আদম (আ.) ও আদি মাতা হাওয়া (আ.)-এর পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে জান্নাতে যে যাত্রার সূচনা হয়েছিল, তা আজও পৃথিবীতে মানব বংশধারা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে টিকে আছে। ইসলাম কেবল একটি ধর্ম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান (Complete Code of Life)। আর এই জীবনবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ হলো একটি আদর্শ পরিবার। মানুষের জীবনে পরিবার হলো শান্তি, ভালোবাসা ও নিরাপত্তার প্রথম আশ্রয়স্থল। একটি সুন্দর পরিবার শুধু ব্যক্তির জীবনকে নয়, পুরো সমাজ ও জাতিকে প্রভাবিত করে। ইসলাম পরিবারকে কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে ঈমান, চরিত্র ও মানবিকতা গঠনের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মানুষ বাইরে যত বড় সফলতাই অর্জন করুক না কেন, যদি তার পরিবারে শান্তি না থাকে, তবে তার জীবন অপূর্ণ থেকে যায়।

বর্তমান যুগে প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের জীবনকে সহজ করলেও পারিবারিক বন্ধনকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল করে দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব, সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়, বৃদ্ধ পিতামাতার অবহেলা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের অভাব সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। এমন পরিস্থিতিতে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক পরিবার গঠন সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

(— সূরা আর-রূম : ২১)

এই আয়াত আমাদের শেখায়, দাম্পত্য জীবন কেবল পার্থিব সম্পর্ক নয়; এটি আল্লাহর একটি বড় নেয়ামত এবং প্রশান্তির মাধ্যম। তাই একটি ইসলামি পরিবার গঠন মানে কেবল একসাথে বসবাস নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা, দায়িত্ব, ত্যাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

এই ভূমিকা অংশে আমরা জানবো কেন বর্তমান যুগে একটি ইসলামি পরিবার গঠন অপরিহার্য এবং এই বইটির মূল উদ্দেশ্য কী।

■ কেন ইসলামি পরিবার গঠন জরুরি:

একটি বহুতল ভবনের স্থায়িত্ব যেমন নির্ভর করে তার মজবুত ভিত্তির ওপর, ঠিক তেমনি একটি সুস্থ, সুন্দর ও নৈতিকতাসম্পন্ন সমাজের ভিত্তি হলো একটি আদর্শ পরিবার। ইসলামি পরিবার গঠন করা কেবল কোনো সামাজিক রীতি বা ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় নয়, বরং এটি একটি দ্বীনি আমল ও ইবাদত।

ইসলামি পরিবার হলো এমন একটি পরিবার, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ জীবন পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়। এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের অধিকার আদায় করে, সন্তানদের দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলে এবং আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়।

বর্তমান সমাজে অনেক সমস্যার মূল কারণ পরিবার থেকে দ্বীনি শিক্ষা হারিয়ে যাওয়া। যখন পরিবারে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও আখলাকের চর্চা কমে যায়, তখন সেখানে অশান্তি ও বিভ্রান্তি বৃদ্ধি পায়। অথচ ইসলাম পরিবারকে জান্নাতের পথে চলার একটি মাধ্যম হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন:

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।”

(— সুনানে তিরমিযি!)

এই হাদিস আমাদের শেখায়, একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র তার পারিবারিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইসলামি পরিবার গঠন জরুরি কারণ—

এটি সমাজে নৈতিকতা ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করে। সন্তানদের ঈমানি পরিবেশে বড় হতে সাহায্য করে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া বৃদ্ধি করে। পারিবারিক অশান্তি ও বিচ্ছেদ কমায়। সমাজকে অপরাধ ও অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ তৈরি করে। একটি নেক পরিবার থেকেই নেক সমাজ গড়ে ওঠে, আর নেক সমাজই একটি শক্তিশালী উম্মাহ প্রতিষ্ঠা করে।

■ বর্তমান সমাজে পারিবারিক সংকট:

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ এক ভয়াবহ পারিবারিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতি, লাগামহীন আধুনিকতা এবং দ্বীনি শিক্ষার অভাব আমাদের পারিবারিক কাঠামোকে ভেতর থেকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে পরিবার ব্যবস্থা নানা সংকটের মুখোমুখি। আধুনিকতার নামে অনেক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ বাহ্যিক সফলতার পিছনে ছুটতে গিয়ে পরিবারকে সময় দিতে ভুলে যাচ্ছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং সন্তানরা সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমান সমাজে যেসব সংকটগুলো আজ আমরা সবচেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ করছি তা হলো:

১. দাম্পত্য কলহ ও বিচ্ছেদ বৃদ্ধি

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ধৈর্য, সহমর্মিতা ও ক্ষমাশীলতার অভাবের কারণে ছোট বিষয় বড় বিরোধে রূপ নিচ্ছে। সামান্য মতবিরোধ বা ইগোর লড়াইয়ের কারণে আজ অগণিত পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সহনশীলতা ও ক্ষমার অভাব এর প্রধান কারণ।

২. জেনারেশন গ্যাপ ও নৈতিক অবক্ষয়

পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে। সন্তানরা বাবা-মার চেয়ে মোবাইল স্ক্রিন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভার্চুয়াল বন্ধুদের বেশি আপন ভাবছে। ফলে মাদকাসক্তি, পর্নোগ্রাফি এবং অনৈতিক জীবনযাপনে জড়িয়ে পড়ছে তরুণেরা।

৩. দ্বীনি শিক্ষার অভাব

অনেক পরিবারে দুনিয়াবি শিক্ষার গুরুত্ব থাকলেও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি অবহেলা রয়েছে। ফলে সন্তানদের চরিত্র গঠনে দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

৪. অধিকারের লড়াই, দায়িত্বের অবহেলা

আধুনিক সমাজ মানুষকে কেবল নিজের 'অধিকার' নিয়ে সচেতন করতে শিখিয়েছে, কিন্তু নিজের 'দায়িত্ব' বা 'কর্তব্য' সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যখন ত্যাগের মানসিকতা ভুলে কেবল পাওয়ার হিসাব মেলায়, তখনই সংসারে অশান্তি দানা বাঁধে।

৫. প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার

মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিবারের সদস্যদের কাছাকাছি আনার বদলে অনেক ক্ষেত্রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

৬. পিতামাতার ব্যস্ততা

অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার কারণে সন্তানরা পর্যাপ্ত সময় ও ভালোবাসা পাচ্ছে না। এতে তারা মানসিকভাবে একাকী হয়ে পড়ে।

৭. বৃদ্ধ পিতা-মাতার একাকীত্ব

যে পিতা-মাতা সারা জীবন কষ্ট করে সন্তানকে বড় করলেন, শেষ বয়সে তারা হয়ে পড়ছেন অবহেলিত। যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার কারণে পারিবারিক সহানুভূতি ও মায়া-মমতা সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে।

৮. পারিবারিক দায়িত্ববোধের অভাব

অনেকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলেও দায়িত্ব পালনে উদাসীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।”(— সূরা আত-তাহরীম : ৬)

এই আয়াত প্রমাণ করে, পরিবারের দ্বীনি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব।

■ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব:

ইসলামে দাম্পত্য জীবন বা বিয়েকে অত্যন্ত পবিত্র এবং সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এটি কোনো চুক্তি মাত্র নয়, বরং আল্লাহর দেওয়া এক মহান নিয়ামত। দাম্পত্য জীবন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। বিয়ের মাধ্যমে মানুষ চরিত্র সংরক্ষণ করে, শান্তি লাভ করে এবং একটি পবিত্র সমাজ গঠনের সুযোগ পায়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বিয়েকে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।
রাসূল ﷺ বলেছন__
“বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম, সহিহ ইবনে মাজাহ)

ইসলামে একজন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তম চরিত্র পরিমাপের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে তার স্ত্রীর সাথে আচরণের ওপর ভিত্তি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।"
(সুনানে তিরমিযী)

সন্তান লালন-পালন বা প্যারেন্টিংয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রতিটি পিতা-মাতাকে দায়িত্বশীল বা রাখাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের (রক্ষণাবেক্ষণ) সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর একজন নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের দায়িত্বশীল, তাকে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"
(সহীহ বুখারী)

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।"

(— সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)

পোশাক যেমন মানুষকে আচ্ছাদিত করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং নিরাপত্তা দেয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মানের মাধ্যম।

দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব হলো—

এটি মানুষকে হারাম থেকে রক্ষা করে

মানসিক প্রশান্তি প্রদান করে

মানবজাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখে

সন্তানদের সঠিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে

পরিবারে দয়া, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ তৈরি করে

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ খুলে দেয়

রাসূল ﷺ নিজের জীবনে স্ত্রীদের সাথে কোমল আচরণ, পরামর্শ গ্রহণ, হাসি-আনন্দ এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের বাস্তব নমুনা উপস্থাপন করেছেন।

থিসিস লেখার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

এই থিসিস লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি আদর্শ ইসলামি পরিবার গঠনের সঠিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরা। বর্তমান সময়ে অনেক পরিবার ভাঙনের পথে এগিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র দ্বীনি জ্ঞানের অভাব ও পারস্পরিক দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। এই থিসিস সেই শূন্যতা পূরণের একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এই থিসিসের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে—

-স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার

-দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার গুরুত্ব

-ইসলামি প্যারেন্টিংয়ের মূলনীতি

-সন্তানদের ঈমানি ও নৈতিক শিক্ষা

-পারিবারিক সংকট সমাধানের ইসলামি পদ্ধতি

-রাসূল ﷺ এর পারিবারিক জীবনের আদর্শ
-জান্নাতমুখী পরিবার গঠনের বাস্তব উপায়
এই থিসিস কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ উপদেশ, কুরআনের আয়াত, সহিহ হাদিস এবং নববী জীবনের আলোকে সাজানো একটি ব্যবহারিক দিকনির্দেশনা হওয়ার চেষ্টা করবে, ইন শা আল্লাহ।
আমাদের লক্ষ্য এমন পরিবার গঠন করা, যেখানে থাকবে ঈমান, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, আখলাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিক চেষ্টা। কারণ একটি নেক পরিবারই হতে পারে একটি সুন্দর সমাজ ও সফল উম্মাহর ভিত্তি।

সারসংক্ষেপ:

এই থিসিসের প্রতিটি পাতা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, আপনার ঘরটি কেবল ইট-পাথরের দেয়াল নয়, এটি জান্নাতে যাওয়ার একটি পথ। যদি আমরা আমাদের পরিবারকে ইসলামি ছাঁচে গড়তে পারি, তবেই আমাদের দুনিয়ার জীবন হবে শান্তিপূর্ণ এবং আখিরাতের জীবন হবে চিরস্থায়ী সফলতায় ঘেরা। আল্লাহ আমাদের এই যাত্রাকে কবুল করুন।আমাদের লক্ষ্য এমন পরিবার গঠন করা, যেখানে থাকবে ঈমান, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, আখলাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আন্তরিক চেষ্টা। কারণ একটি নেক পরিবারই হতে পারে একটি সুন্দর সমাজ ও সফল উম্মাহর ভিত্তি।

প্রথম অধ্যায়: পরিবার

■ পরিবার পরিচিতি :

পরিবার হলো মানব সমাজের সবচেয়ে মৌলিক, আদিম এবং ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। সাধারণত রক্ত-সম্পর্ক, বিবাহ বন্ধন অথবা দত্তক গ্রহণের (adoption) মাধ্যমে যুক্ত একদল মানুষের সমষ্টিকে পরিবার বলা হয়, যারা একসাথে বসবাস করে এবং একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক একক হিসেবে কাজ করে।
সহজ কথায়, পরিবার হলো এমন একটি নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে মানুষ স্নেহ, ভালোবাসা, নিরাপত্তা এবং দায়িত্ববোধের মাধ্যমে একে অপরের সাথে আবদ্ধ থাকে।

পরিবারের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ-

একটি আদর্শ পরিবার সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে:

* **বিবাহ বন্ধন বা রক্ত-সম্পর্ক:** পরিবারের সূচনা সাধারণত পিতা-মাতা, ভাই-বোন বা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আইনি, ধর্মীয় বা সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে হয়।

* **একত্রে বসবাস:** পরিবারের সদস্যরা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট গৃহ বা বাসস্থানে একসাথে বসবাস করে এবং একই হাড়ি বা রান্নাঘরের খাবার ভাগ করে নেয়।

* **অর্থনৈতিক সহযোগিতা:** পরিবারের সদস্যরা যৌথভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং একে অপরের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে।

* **যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য:** পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থাকে (যেমন: সন্তানদের লালন-পালন, বৃদ্ধ পিতা-মাতার যত্ন নেওয়া ইত্যাদি)।

কাঠামোর ভিত্তিতে পরিবারের প্রকারভেদ_

সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবারের গঠনে ভিন্নতা দেখা যায়। প্রধানত দুই ধরনের পরিবার সবচেয়ে বেশি প্রচলিত:

1. **একক বা অণু পরিবার (Nuclear Family):** স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে যে পরিবার গঠিত হয়, তাকে একক পরিবার বলে। বর্তমান আধুনিক ও নগর সমাজে এই ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়।

2. **যৌথ পরিবার (Joint/Extended Family):** যেখানে রক্ত-সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রজন্ম (যেমন: দাদা-দাদী, পিতা-মাতা, চাচা-চাচী, ভাই-বোন ও কাজিন) একসাথে একই ছাদের নিচে বসবাস করে, তাকে যৌথ পরিবার বলে। গ্রামীণ সমাজে এটি ঐতিহাসিকভাবে বেশি জনপ্রিয় ছিল।

মানব জীবনে পরিবারের গুরুত্ব ও কার্যাবলী_

সমাজবিজ্ঞানী ও মনস্তাত্ত্বিকদের মতে, পরিবার কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানই নয়, এটি মানুষের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের প্রথম পাঠশালা। এর প্রধান কার্যাবলী হলো:

* **জৈবিক কাজ:** মানব প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং নতুন প্রজন্মের জন্ম দেওয়া।

* **লালন-পালন ও সামাজিকীকরণ:** সন্তানকে সমাজের একজন আদর্শ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব পরিবারের।

* **মানসিক ও আবেগীয় নিরাপত্তা:** জীবনের কঠিন সময়ে মানসিক সমর্থন, ভালোবাসা এবং পরম নিরাপত্তা কেবল পরিবারই দিতে পারে।

* **ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা:** সততা, দয়া, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং পারিবারিক কর্তব্যবোধের মতো মৌলিক গুণগুলো মানুষ পরিবার থেকেই প্রথম শেখে।

■ **পরিবারের সূচনাকাল :**

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আঃ) ও প্রথম মানবী হযরত হাওয়া (আঃ)-কে কেন্দ্র করে মানব জাতির প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছিল জান্নাতে। এই প্রথম পরিবারের সদস্য ছিল মাত্র দু'জন; আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)।

তাদেরকে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেছিলেন_

يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ

'হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং সেখান থেকে যা চাও খুশীমনে খাও। কিন্তু তোমরা দু'জন এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'

(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত : ৩৫)।

মানব জাতি এই প্রথম পরিবারের মাধ্যম দিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا-

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা করে থাক এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সদা সতর্ক তত্ত্বাবধায়ক'

(সূরা নিসা, আয়াত : ১)।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى - وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا

'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। তারপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার'।
(সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১৩)।

অনুরূপভাবে সকল নবী-রাসূলের ব্যক্তিগত জীবনে ও সময়কালে পরিবার বিদ্যমান ছিল।
যেমন আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ،ً

এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দিয়েছি'
(সূরা রা'দ আয়াত: ৩৮)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন,

ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا - إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيم
‘হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য হ'তেও আপনার অনুগত একটা দল সৃষ্টি করুন। আর আপনি আমাদেরকে আমাদের হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি বাৎলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তওবা কবুলকারী ও দয়াময়'
(সূরা বাক্বারাহ, আয়াত: ১২৮)।

■ পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

পরিবার মানব সমাজের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবন ব্যতিরেকে মানব সভ্যতা কল্পনা করা যায় না। মানুষের অস্তিত্বের জন্য পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি-অগ্রগতি ইত্যাদি সুষ্ঠু পারিবারিক ব্যবস্থার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। পারিবারিক জীবন অশান্ত ও নড়বড়ে হলে, তাতে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিলে সমাজ জীবনে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দানা বেঁধে উঠে। শান্তিপূর্ণ

সমাজে অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। তাই বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে কল্যাণকর সমাজের ভিত্তি। সুতরাং আদর্শ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত আদর্শ পরিবার গঠন।

পরিবারের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক নিম্নে উল্লেখ করা হল_

১. মানববংশ বৃদ্ধি:
পরিবারের মাধ্যমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ বলেন_

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ * - وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

'আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র বস্তুসমূহ হ'তে রূযী দান করেছেন'।
(সূরা নাহল, আয়াত : ৭২)।

এভাবে রাসূলে (স:) এর উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর সংখ্যাধিক্য পরকালে রাসূল (স:) এর জন্য গর্বের বিষয় হবে।

রাসূল (স:) বলেছেন_

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ

'সোহাগিনী ও অধিক সন্তানদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব'।

(আবু দাউদ হা/২০৫০; মিশকাত হা/৩০৯১, সনদ ছহীহ)।

২. মানববংশ সংরক্ষণ :

পরিবারের মাধ্যমে মানববংশ রক্ষা হয়।

আল্লাহ বলেন_

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার
বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' (সূরা ফুরক্বান, আয়াত : ৫৪)।

এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে স্নেহ-মায়া-মমতা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব তৈরী হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে থাকে সুসম্পর্কের সুদৃঢ় সেতুবন্ধন। কারণ সেখানে থাকে পিতামাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, অনেক ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদি নানান সম্পর্কের মানুষ। পরিবারে পিতামাতা সন্তানকে শৈশবে লালন-পালন করেন। তেমনি সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পিতামাতাকে দেখাশোনা করে। পৌত্ররাও দাদা-দাদীর সেবাযত্ন করে থাকে। এভাবে একে অপরের মাধ্যমে মানব বংশ রক্ষা হয়। পরিতাপের বিষয় হ'ল, এখন মানুষ বিভিন্ন অযুহাতে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধ করছে। লাইগেশনের মাধ্যমে বা অন্য কোন উপায়ে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা জন্ম নিরোধ করা হারাম। কেউবা ভ্রূণ হত্যা করে। শারঈ কোন কারণ ব্যতীত ভ্রূণ হত্যা হারাম।
(সূরা আন'আম, আয়াত : ১৫১; সূরা বনী ইসরাঈল,
আয়াত : ৩১)।

এসব থেকে বিরত থাকা অতীব আবশ্যক।

৩. শিক্ষা প্রদান:

পরিবারের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিশুকে সামাজিক ও সুনাগরিক করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দেওয়া। পরিবারের ধারা ও রীতিনীতির উপর ভিত্তি করে শিশুর মনোজগত তৈরী হয় এবং পরিবারে তার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। সুতরাং

শিশুকে সুষ্ঠু শিক্ষা দিতে পরিবার বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাই পরিবার এক অনন্য শিক্ষাগার। পিতামাতার নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেই সন্তান সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেছেন_

كُلّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِه أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِه

'প্রত্যেক সন্তানই স্বভাব ধর্মের (ইসলাম) উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বা খৃষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়'।

(বুখারী হা/১৩৬৫; মুসলিম হা/২৬৫৮; মিশকাত হা/৯০)।

সুতরাং পরিবারে যে শিশু সঠিকভাবে গড়ে ওঠে, সে বড় হয়েও সঠিক পথে অবিচল থাকে। পক্ষান্তরে যে শিশু পরিবারে খারাপ শিক্ষা পায়, সে বড় হয়েও খারাপ পথেই চলতে থাকে।

এজন্য পিতা-মাতা সন্তানকে আল্লাহভীতি, পরকালীন জবাবদিহিতা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য, আল্লাহর হক, বান্দার হক, পারস্পরিক সহমর্মিতা শেখানোর চেষ্টা করবেন। এর পাশাপাশি সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিবেন।

যাতে তারা নিজেদের অভিভাবকহীন না ভাবে এবং সঠিক তত্ত্বাবধায়নের অভাবে বখে না যায়।

পাশাপাশি তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবেন এবং তাদের সঙ্গী-সাথী ও বন্ধু-বান্ধবদের সম্পর্কেও নযর রাখবেন। যাতে অসৎসঙ্গে সর্বনাশ না হয়।

যেমন রাসূল (স:) বলেছেন_

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكَيْرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎসঙ্গী ও অসৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরীওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরীওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হ'তে তুমি সুগন্ধ পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার নিকট হ'তে পাবে দুর্গন্ধ'।'
(বুখারী হা/৫৫৩৪, ২১০১; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০)।

৪. শান্তি লাভ ও পারিবারিক মহব্বত সৃষ্টি:
পরিবারেই মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করে এবং তাদের মধ্যে মহব্বত-ভালবাসা তৈরী হয়।
আল্লহ বলেন_

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ،

নিদর্শনের মধ্যে হ'ল এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হ'তেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি লাভকরতে পার আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। এর মাঝে অবশ্যই বহু নিদর্শন আছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে'
(সূরা রূম, আয়াত : ২১)।

পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি একত্রে বসবাস করেন। একসাথে থাকার ফলে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সুখে সুখী হয়, এক অপরের দুঃখে দুঃখী ও সমব্যথী হয়।
এভাবে পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। পরিবারের এ বন্ধন আমাদের দেশে খুবই পরিচিত চিত্র।
কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, বর্তমানে চিরচেনা এ পরিবার প্রথা বিলুপ্তির পথে। একে সামাজিক বিপর্যয় বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না।
পারিবারিক বিপর্যয় রোধে অনেকেই সচেষ্ট। নানাবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করে পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত। অথচ মানব চিন্তা যতই শাণিত হোক, উন্নত ও

আধুনিক বলে দাবী করা হোক না কেন, আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাই পারিবারিক বিপর্যয় রোধে ইসলামের বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই। এ পথেই রয়েছে সুষ্ঠু সমাধান। ইসলাম আগে ব্যক্তি সংশোধনে গুরুত্বারোপ করেছে। কারণ ব্যক্তি ঠিক হ'লে পরিবার ও সমাজ উভয়ই ঠিক হয়ে যায়।

একটি বহুতল ভবন নির্মাণের পূর্বে যেমন ভিত্তি ঠিক করতে হয়, তেমনি পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করতে হ'লে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করতে হয়।

এজন্য সমাজবিজ্ঞানী ও মুসলিম মনীষীগণের দৃষ্টিতে মানবসমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি হচ্ছে পরিবার।

পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় আমাদের মানবিক মূল্যবোধ ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারের বড়দের সম্মান এবং ছোটদের প্রতি স্নেহসুলভ আচরণ করা হচ্ছে না।

অথচ রাসূল (স:) বলেছেন_

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفُ حَقَّ ،كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'।

(আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; ছহীহাহ হা/২১৯৬)।

ইসলামে পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু ইসলামে বিদ্যমান। সুতরাং সে বিধান মেনে চলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত।

পারিবারিক জীবন যে শুধু দুনিয়াতেই কল্যাণ বয়ে আনে এবং এ বন্ধন যে কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের জন্য এ বন্ধন জান্নাতেও বিদ্যমান থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ ،عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ

‘তা হ'ল স্থায়ী বসবাসের জান্নাত। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি।

ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে'।
(সূরা রা'দ, আয়াত : ২৩)।

৫. জৈবিক চাহিদা পূরণ ও লজ্জাস্থান হেফাযত :
পারিবারিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জৈবিক চাহিদা বৈধ পথে পূরণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে লজ্জাস্থান হেফাযত করা যায়।
রাসূল (স:) বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

'হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা তা চক্ষুকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। আর এই বৈধপন্থায় নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে উভয়ে নৈতিক স্খলন থেকে বেঁচে যায়, পাপাচার থেকে পরিত্রাণ পায় এবং ছওয়াব লাভ করে।
(বুখারী হা/৫০৬৬; মুসলিম হা/১৪০০; মিশকাত হা/৩০৮০)।

অন্যত্র রাসূল (স:) বলেছেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ،

'তোমাদের কারো স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও ছাদাক্বাহ। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করলেও তাতে ছওয়াব পাবে?
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন_
তোমাদের অভিমত কি যে, কোন ব্যক্তি যদি হারাম উপায়ে কামভাব চরিতার্থ করে তাহ'লে সে কি গুনাহগার হবে?
ঠিক এভাবেই হালাল উপায়ে (স্ত্রীর সাথে) জৈবিক চাহিদা পূরণকারী ছওয়াব পাবে'।
(মুসলিম হা/১০০৬; মিশকাত হা/১৮৯৮)।

৬. পারিবারিক জীবন যাপন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য:
মুমিন বান্দাদের অন্যতম গুণ সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপন।
এজন্য তারা মহান আল্লাহকে বলেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও'
(সূরা ফুরক্বান, আয়াত : ৭৪)।

■ **পরিবার গঠনে ইসলামের গুরুত্ব :**

ইসলামী শিক্ষার সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সত্যবাদী মুমিন' 'রক্ষণশীল প্রতিনিধি' এবং 'দৃঢ়-বিশ্বাসী' মানুষ তৈরি করা। আল্লাহর পরিচয় জানা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালিন মুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন করা একমাত্র পরিতৃপ্ত ঈমানী শক্তি দ্বারাই সম্ভব। প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্বশীলতার মাধ্যমে সামনের দিক এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হতে হবে। এছাড়াও সঠিক অনুভূতি, বাস্তবধর্মী কর্ম পদ্ধতি, হৃদয়ের সাহস, আমানত ও বিশ্বাসের দৃঢ়টা এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আবশ্যিক উপকরণ। কাজের দক্ষতা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ছাড়া এ লক্ষ্যে পৌঁছা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।
আর সম্ভাবনাময় একজন মানুষ গঠন করতে হলে, এ সকল উন্নত গুণাবলীর বীজ মানব শিশুর মূল উৎস শিশু বয়সেই স্থাপন করতে হবে। এ জন্যই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্কই হচ্ছে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা তথা নববী শিক্ষার কারিকুলামের মূল ভিত্তি। কারণ, পরিবারই শিশুর মানসিক ও বৈষয়িক বিকাশের সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও বৈষয়িক যে কোনোও ধরনের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।
তখন একমাত্র পরিবারই তার সকল প্রকার প্রয়োজন পূরণে সহায়তা ও ব্যবস্থা করে তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালনের যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

এজন্যই পরিবার গঠন ও পরিবারের সুসম্পর্কই হচ্ছে মানবিক গঠন ও বিকাশের প্রাণকেন্দ্র। যার ওপর ভিত্তি করে মানবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

এজন্যই পবিত্র আল-কুরআন ও রাসূলের বাণী এবং মানবতার মুক্তির ধর্ম ইসলাম পরিবার এবং পরিবারের সুসম্পর্ককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে এবং ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে পরিবারকে প্রথম বীজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

আমাদেরকে তাই পরিবার এবং পারিবারিক সুসম্পর্ক বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে হবে যাতে সঠিকভাবে পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করে মুসলিম শিশুদেরকে যথাযথ তা'লীম-তরবিয়তের ব্যবস্থা করে সঠিকভাবে লালন পালন করা যায়।

তাদের থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতির আগ্রাসনের শিকার, অন্ধবিশ্বাস, ভ্রান্ত-অনুকরণ, বিচ্যুতি এবং চিন্তার স্থবিরতা ইত্যাদি অপসারণ করা যায়। বিশেষ করে বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম জাতিকে যেন হিফাযত করা যায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ আল-কুরআনে বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনা-বলীর মধ্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"।

[সূরা আর-রূম, আয়াত: ২১]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর"।
[সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِير ُ *

وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَبُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير* ٌ
يَبْنَى أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِير ِ

"যখন লোকমান উপদেশ হিসেবে তার পুত্রকে বললেন: হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছর বয়সে। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।
পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমার দিকে।
এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে অবহিত করবো। হে বৎস, কোনো বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর খণ্ডের গর্ভে অথবা আকাশে,

অথবা ভূগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন-ভেদ জানেন, সবকিছু খবর রাখেন।
হে বৎস! সালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবুর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনোও দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। পাদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু কর। নিঃসন্দেহে গাধার আওয়াজ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আওয়াজ"।
[সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩-১৯]

আল্লাহ আরও বলেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب ُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি আমাদের বার্ধক্য বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণ করেন। হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমার রব! কবুল করুন আমাদের দো'আ। হে আমাদের রব আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে"।
[সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩৯-৪১]

আল্লাহ আরও বলেন,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"স্মরণ করুন, যখন তাকে তার রব বললেন: অনুগত হও। সে বলল আমি বিশ্ব পালকের অনুগত হলাম। এরই অসিয়ত করেছেন ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকূবও যে, হে আমার সন্তানগণ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত

করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে কখনো মারা যেও না"। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত:১৩১-১৩২]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * أُوْلَابِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُون َ

"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। যাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার রব! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নি'আমতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎ কাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্ম পরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। আমরা এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দ কর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে, যা তাদেরকে দেওয়া হতো"। [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ১৫-১৬]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমাদের জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উহ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচার-পূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার

সাথে নম্র-ভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে রব তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন"।
[সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৩-২৪]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون* ۘ
يابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيْتَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُون ۘ

"এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন: হায় আফসোস ইউসুফের জন্য এবং দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। তারা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মারা না যান। তিনি বললেন: আমি তো তোমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না। বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না”।
[সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৪-৮৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ۔

"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রবান এবং তার পরিবারের প্রতি দয়াবান'।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন,

“তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ঐ ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে ভালো। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি"।
(' মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৭৪০২।)
(* ইবন মাজাহ ও হাকেম।)

ইমাম মুসলিম রহ. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ

يداك
"চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয়। (১) তার ধন-সম্পদের কারণে, (২) বংশ মর্যাদার কারণে, (৩) শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে এবং (৪) তার দীনদারীর কারণে। অতএব, তুমি ধার্মিকতাকে প্রাধান্য দাও। তোমার দু'হাত ধূলি ধূসরিত (তথা উত্তম) হোক।
(' তিরমিযী, হাদীস নং ১০৮৪।)

ইমাম তিরমিযী রহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

"যখন তোমাদের নিকট এমন কোনোও দীনদার, আমানতদার পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দীনদারী এবং চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট থাক, তাহলে তার সাথে তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তোমরা এমতাবস্থায় বিয়ে না দাও তাহলে জমিনে বড় ধরনের ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হতে পারে"।

ইমাম আহমদ, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম রহ. সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী মেয়েদেরকে বিবাহ কর, যাতে আমি কিয়ামতের দিন অধিক উম্মতের মাধ্যমে গর্ব করতে পারি।"
(* আহমদ, হাদীস নং ১২৬১৩।)

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, নেতাও দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষও তার পরিবারের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন নারীও তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল সেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"
(তিরমিযী, হাদীস নং ১৭০৫।)

এ হচ্ছে ইসলামে পরিবারের গুরুত্ব, একমাত্র পরিবারই হচ্ছে সঠিকভাবে মানব তৈরির কারখানা এবং মানব শিশুর সর্বপ্রথম আশ্রয়স্থল। আর ইসলাম পরিবারকে এ ধরনের গুরুত্ব প্রদান- এটা আশ্চর্যের কোনোও বিষয় নয়।

কারণ, মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। অপরদিকে এ সৃষ্টি জগতের প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানব সন্তানের শিশুকাল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়। এমনকি এক দশকের চেয়েও বেশি সময় অতিক্রম করতে হয় শিশুকাল/বাল্যকাল পাড়ি দিতে।
এ জন্যই শিশুকে তার বাল্যজীবনে মানসিক, শারীরিক আত্মিক তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। খলিফা হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত ও প্রস্তুত করার জন্য। আর এ সকল প্রয়োজন একমাত্র পরিবারই দিয়ে থাকে।

সুতরাং মানব শিশুর আত্মিক, শারীরিক, বৈষয়িক বিকাশ এবং সকল প্রকার উন্নতি, অগ্রগতি-অবনতি, ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক সকল ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি।

এ সকল কারণে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, কেন ইসলাম পরিবার ও পরিবার গঠন এত বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিয়েছে এবং পরিবার গঠনকে পৈত্রিক ও মাতৃক সুসম্পর্ক এবং মানুষের ফিরাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পরিবারের ভীত মজবুত করা এবং পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। আর এ জন্যই ইসলাম পরিবার গঠন, মানুষের ফিরাত, পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক অধিকার ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করেছে।

■ পরিবার গঠনে শরী'আতের ভিত্তি ও পদ্ধতি :

পরিবার গঠনে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনে মানুষে স্বভাবসুলভ দিকগুলো সম্পর্কে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব ও একে অপরের পরিপূরক ভূমিকা সম্পর্কে অনুধাবন করতে না পারবে। কারণ, মানুষ যখন এ সকল বিষয়ে অনুধাবন করতে পারবে তখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে। আর যখন ইসলামী শরী'আতকে বুঝতে পারবে, তখন পরিবার গঠন সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের রহস্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং পরিবারের সকল সদস্যদের দায়িত্ব বুঝাও তখন সহজ হবে।

অতএব, পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যের পরিপূরকমূলক দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই দায়িত্ব অর্পণ ও পরিবার পরিচালনা করা। এটিই হচ্ছে মানুষের পারিবারিক সদস্যদের মাঝে আত্মিক ও জৈবিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি।
সাধারণত মানুষের মধ্যকার এ সম্পর্ক এবং বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে এ ধরনের সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দিক নির্দেশনাগুলো না বুঝার কারণে পরিবার গঠন ও পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বুঝতে পারে না। যার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব ও সম্পর্কের বিষয়ে ভুল করে থাকে। তারা মনে করে যে, পরিবারের সকলের দায়িত্ব ও সম্পর্ক সমান। ফলে তারা মানুষের ফিত্রাত বা স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে। আর যখন স্বভাবকে অনুধাবন করতে ভুল করে, তখনই পরিবারের সদস্যদের মাঝে দায়িত্ব অর্পণে বিশৃঙ্খলা ও সীমালঙ্ঘন করে থাকে- যা শেষ পর্যন্ত পরিবারের মন্দ ডেকে নিয়ে আসে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে মানুষের ফিৎরাত সম্পর্কে অনুধাবন না করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবার গঠনের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।

আর পরিবারের সদস্যদের পরস্পর সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা পরিবারের নারী-পুরুষ, বাবা-মা, ভাই-বোন, তথা সকল সদস্যের মাঝে ভালোবাসা, দয়া, অনুগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। আর যখনই পরিবার থেকে সম্মতি ও পরিপূরক ভূমিকা, ভালোবাসা, দয়া অনুগ্রহ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়, তখনই বাবার সম্পর্ক মায়ের সাথে এবং ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক বাবার সাথে তথা পরিবারের প্রতিটি সদস্যের একে অপরের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই পরিবারের প্রতিটি সদস্য তার মানসিক, আর্থিক, জৈবিক, ও দৈহিক বিকাশে প্রয়োজনীয় তা'লীম-তরবিয়ত, সেবা-যত্ন, সহযোগিতা ও নিরাপত্তা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত হয়। একটি শিশুর মানবিক আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক বিকাশ এবং একটি আদর্শ পরিবার গঠন তখনই সম্ভব, যখন পরিবারের সকল সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব আদায় করে বা আদায় করতে চেষ্টা করে।

পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তানের সাথে নারীর বৈষয়িক ও আত্মিক আবেগ ও দয়াময় সম্পর্ক তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ, সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার

প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক দুর্বলতা এবং নারীত্বের কামনা- বাসনা ও তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসার প্রতি অনুপ্রেরণা যোগায়। এ জন্যই আল্লাহ নারীর হাতে জৈবিক প্রশান্তির লাগাম তুলে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের এ জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর পুরুষ সহজে প্রভাব ফেলতে পারে না, বরং নারী তার ইচ্ছায় জৈবিক ও বৌদ্ধিক প্রশান্তির ওপর অবিচল থাকতে পারে। সে তার এ অবিচলতা ততক্ষণ পর্যন্ত হারায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ তাকে দৈহিকভাবে স্পর্শ না করে বা দৈহিকভাবে স্পর্শ করার অনুমতি না দেয়। সুতরাং যখন একজন পুরষ নারীকে জৈবিক আবেগে স্পর্শ করে, তখন আর নারী তার জৈবিক ও বুদ্ধিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না। অপর দিকে নারীর তুলনায় পুরুষের জৈবিক ও কাম-দুর্বলতার কারণে একজন নারীর দৃষ্টি বরং শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ও চিন্তা-ধ্যান তাকে জৈবিক-ভাবে প্রভাবিত করে ফেলে। এমন কি অনেক সময় নারী তার বুদ্ধির মাধ্যমে একজন পুরুষকে তার প্রতি দুর্বল করে ফেলতে পারে। যার ফলে পুরুষ স্বাভাবিকভাবে নারী ও সন্তানদের প্রতি দুর্বল, নম্র ও দয়াপরবশ হয়ে পড়ে। এ সকল দিক বিবেচনায় নারী-পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষা ও তাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী শরী'আত নারী-পুরুষের মাঝে বিবাহের ব্যবস্থা করেছে। সেই বিবাহের মাধ্যমে বা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে মানুষের বংশ মর্যাদা ও রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে। এ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিশুর মানবিক, দৈহিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটে এবং নারী ও সন্তানদের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। এ জন্যই আল্লাহ পুরুষদেরকে নারী ও সন্তানদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ ও বহন করার ক্ষমতা দান করেছেন।

এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, গড়ে উঠে পরিবার। সেই পরিবারই হয় সন্তানের শান্তি, নিরাপত্তা ও আশ্রয়স্থল। নিশ্চয় পুরুষকে নারীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য তাকে নারীর তুলনায় সাহসিক ও শক্তিশালী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে তারা পারিবারিক প্রয়োজনে নারী ও সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের লালন পালন ও পরিচালনা করতে পারে। নারীদেরকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল, নম্র, কোমল ও আবেগময়ী করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পরনির্ভরশীল দুর্বল শিশু ও আবেগময়ী পুরুষ তাদের কাছে শান্তি ও আশ্রয় নিতে পারে। এ জন্যই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আর নারীদেরকে তাদের শক্তি সামর্থ্য ও ইচ্ছানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে কাজ-কর্ম করার নির্দেশ প্রদান করেছে। তার চেয়ে বেশি কিছু তাদের ওপর

চাপিয়ে দেওয়া বা বাধ্য করা, তাঁদের প্রতি যুলুম ও দুর্ব্যবহারের নামান্তর, যা শরী'আত, মানুষের স্বভাব এবং নারী পুরুষের একে অন্যের পরিপূরক নীতির পরিপন্থী।

■ **পারিবারিক জীবনের সুফল :**

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ।

পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি; যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা। বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা।

পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুনধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়।

স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মযবৃত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য।

পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয়

এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে; স্ত্রী যখন তার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবে; স্বামী স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করবে ও তাদের অধিকার পাবে; আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোন স্ত্রী অধিকারের দাবীতে প্রকাশ্য রাজপথে বের হবে না, কোন স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোন সন্তানই পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না। বরং পরিবারে সবার মাঝে সুসম্পর্কের কারণে আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকবে।

অপরদিকে ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হ'ল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'লে সমাজ থেকে পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ-অপহরণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা ও প্রেমে ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ নির্মূল হবে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরানোর মতো দুঃসহ জীবন-যাপন বন্ধ হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল (স:)-এর নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

■ পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ :

পরিবার মানুষের জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তেমনি মানসিক প্রশান্তি লাভের স্থান। মানবজীবনে পরিবার তাই এক গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। কিন্তু পরিবার না থাকলে মানুষকে নানা ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হ'তে হয়।

তন্মধ্যে কয়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল_

ক. নিরাপত্তাহীন হওয়া:

পার্থিব জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-যাতনা ইত্যাদির শিকার হয়ে মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে যায়। এ সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। অসুখে সেবা করে, বিপদে সাহায্য করে, দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দেয় এবং শোকে সমব্যথী হয়। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন

মানুষের জন্য এসব পাওয়ার উপায় থাকে না। ফলে সে হয়ে পড়ে উদ্ভ্রান্ত। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকে না।

খ. সহযোগিতা না পাওয়া:

অর্থ মানব জীবনের এক আবশ্যিক বিষয়। রক্ত ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না, অর্থ ছাড়া তেমনি জীবন চলে না। তাই বিভিন্ন

সময়ে মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়। পরিবারের লোকেরাই সেই প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে। তাছাড়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ কর্মক্ষম থাকে না।

জীবনের সূচনাকালে যেমন সে অক্ষম ও পরনির্ভরশীল থাকে, তেমনি জীবনের শেষ বেলায় সে আবার অক্ষম ও পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। এ সময়ে পরিবারভুক্ত মানুষ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য পায়। তার সার্বিক প্রয়োজন পূরণে তারা এগিয়ে আসে। অথচ পরিবার বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের সাহায্যে তেমন কেউ এগিয়ে আসে না।

গ. বন্ধনহীন হওয়া:

পরিবারে আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে কতগুলি মানুষ। যারা একে অপরের সহযোগী ও সহমর্মী, পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ এসব সুযোগ-সুবিধা পায় না।

উল্লেখ্য যে, দেশ-কাল, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও রীতিনীতির কারণে পরিবারের রূপ ভিন্ন হয়। কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবারের কাঠামো ও এর পরিধি বা আকার-আয়তন। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে গঠিত হচ্ছে একক পরিবার। দেখা দিচ্ছে এক ধরনের বন্ধনহীনতা। যা কোন জ্ঞানী মানুষের কাম্য নয়।

ঘ. নৈতিক অবক্ষয়:

বর্তমানে পরিবারকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ঘরে ঘরে জ্বলছে অশান্তির আগুন। পরিবারের অশান্তির প্রভাব পড়ছে সমাজে। ডিস, সিডি, ইন্টারনেট, মোবাইল, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণোছবি প্রদর্শন, ব্লাক মেইলিং, ইভটিজিং বাড়ছে মহামারীর ন্যায়। অশালীন পোশাক, রূপচর্চা, ফ্যাশন, অবাধ মেলামেশা, যত্রতত্র আড্ডা, প্রেমালাপ, মাদক, পরকীয়া, অবৈধ যৌনাচার ও সন্ত্রাসের সয়লাব চলছে সমাজের

সর্বত্র। এ সকল কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের সাথে বাক-বিতণ্ডা, মনোমালিন্য, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানী, কিডন্যাপ ও খুন-খারাবী কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এর নেতিবাচক পরিণতি হিসাবে পারিবারিক সহিংসতার বিস্তার ঘটছে। বস্তুতঃ এ ধরনের সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পুরো সমাজকে এক চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

নানা অত্যাচারে অতিষ্ঠ অভিজাত পিতা-মাতা যেন যিম্মী হয়ে আছেন তরুণ-যুবক সন্তান-সন্ততির কাছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনও যেন পিতামাতার মতই অসহায়। সমাজের অবক্ষয়ের কারণে যুব সমাজের কল্যাণময় অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সকলে। এজন্য পারিবারিক ব্যবস্থাকে সংস্কারে নযর দেয়া সকলের জন্য যরূরী।

বর্তমানে যে সকল পরিবার সন্তানের প্রতি উদাসীন, সন্তানের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেন না, তাদের অধিকাংশের যুবক-তরুণ সন্তান-সন্ততি উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

এদের মাঝে ধর্মীয় অনুশীলন, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ নেই বললেই চলে। ধনী শ্রেণী বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করে এবং ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে অধিকাংশ সময়।

সন্তান-সন্ততি চাইলেই তারা টাকা-পয়সা দিয়ে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, দামি মোবাইল, গাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েই দায়মুক্ত হয়। অন্ধস্নেহে সন্তানের কোন ভুল-ত্রুটি অভিভাবকের চোখে ধরা পড়ে না।

বর্তমান সময়ের অভিভাবকগণ এসব ব্যাপারে আগের মত সিরিয়াস নন, তারা কেবল অর্থের পিছনে ছুটছেন। সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধর্মকর্ম, নীতি-নৈতিকতা তাদের কাছে গৌণ হয়ে গেছে।

সন্তান-সন্ততিকে সময় দেয়ার মত তাদের ফুরসত নেই, সন্তান-সন্ততিও তাই কথা শুনছে না। ছোট-বড় সকলে তথাকথিত প্রগতি বা উন্নয়নের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়ায় সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত নষ্ট ও দূষিত হয়ে যাচ্ছে।

অপর দিকে দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অশিক্ষা-কুশিক্ষা পেয়ে বেড়ে ওঠে। সন্তান একটু বড় হ'লেই তারা অর্থ উপার্জনে লাগিয়ে দেয়। এই শ্রেণী সাধারণত নিজেরাও ধর্মকর্ম করে না, সন্তানকে খুব একটা শিক্ষা দেবারও প্রয়োজন অনুভব করে না।

ফলে স্বাভাবিকভাবে এই শ্রেণীর সন্তানদের মাঝে অপরাধ প্রবণতা বেশী থাকে। তাই এ শ্রেণীসহ সমাজের সকল শ্রেণীর পরিবারে নৈতিকতার মানোন্নয়নের মাধ্যমে অবক্ষয় রোধ করার চেষ্টা করতে হবে।

ঙ. সংসার বিরাগী হওয়া:

সংসার বিরাগী হওয়া বা বৈরাগ্য জীবন যাপন করার অনুমতি ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন,

وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِم ْ

'আর বৈরাগ্যবাদ- তা তারা নিজেরাই নতুনভাবে চালু করেছে। আমরা তাদের উপর এ বিধান অপরিহার্য করিনি'। (সূরা হাদীদ, আয়াত : ২৭)।

আয়াতে খ্রীষ্টানদের বৈরাগ্যবাদের কথা বলা হয়েছে। এসব থেকে ইসলাম মানুষকে সাবধান করেছে।

হাদীছে এসেছে_
সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্নিত_

رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ التَّبَتُّلَ، - وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَخْتَصَيْنَا
রাসূল (স:) উসমান ইবনু মাযঊনকে অবিবাহিত জীবন যাপনের অনুমতি দেননি। তাকে অনুমতি দিলে আমরা নির্বীর্য হয়ে যেতাম'।"
(বুখারী হা/৫০৭৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১, 'বিবাহ' অধ্যায়)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى - عَنِ التَّبَتُّل ِ

'নিশ্চয়ই রাসূল (স:) অবিবাহিত থাকাকে নিষেধ করেছেন'।

(নাসাঈ হা/৩২১৩; তিরমিযী হা/১০৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৮৬৭)।

সুতরাং পারিবারিক জীবন পরিহার করে সংসারত্যাগী হওয়ার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক তাবলীগের নামে পরিবার-পরিজনকে ফেলে রেখে এক মাস, তিন মাস, এক বছর বা জীবন চিল্লায় বের হয়। পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ এবং ক্ষেত্র বিশেষে খোঁজ-খবরও থাকে না। এভাবে দ্বীন প্রচার করা নবী-রাসূলগণের পদ্ধতি নয়। অতএব এসব পরিত্যাজ্য।

চ. উদ্দেশ্যহীন জীবন:

পরিবার মানুষকে একটি স্থানে ও একটি লক্ষ্যে চলতে সাহায্য করে। কখনও সে লক্ষ্যচ্যুত হ'লে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সঠিক পথে চলতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরে আনতে তৎপর হয়।

কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকে না। সে যা ইচ্ছা তাই করে, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যায়। পারিবারিক বন্ধনহীন এই জীবন যেন হাল বিহিন নৌকার মত।

সুতরাং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনকে অশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া কোন বিবেকবান মানুষের জন্য সমীচীন নয়।

■ আদর্শ জাতি গঠনে পরিবারের ভূমিকা :

মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, স্থপতি, সংস্কারকগণ শিশুর লালন-পালন, পরিচর্যা, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত, ও তার কারিকুলাম উন্নয়ন এবং শিশু বিষয়ক সংস্কৃতির সংস্কার ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন নি, বরং তারা গুরুত্ব দিয়েছে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামী ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে, যার ফলে জাতির নতুন প্রজন্ম থেকে আমাদের আলো নির্বাপিত হয়ে গেছে, স্থবির হয়ে গেছে আশা আকাঙ্ক্ষা আর কল্পনা। জাতি পরিণত হয়েছে একটি প্রাণহীন দেহতে। অথচ উচিৎ ছিল বাল্য বয়সেই একটি শিশুর ভিতরে সে সকল মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা প্রতিষ্ঠিত করা।

সুতরাং এ নিষ্প্রাণ জাতির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করতে হলে এবং সমস্যার সমাধান করতে হলে, শিশু বিষয়ক তা'লীম-তরবিয়ত-পরিচর্যা এবং নারী ও পরিবার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, যে জাতি আজ সর্বস্তরে পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ এবং উপনিবেশ ও রাজনৈতিক আগ্রাসনের শিকার, তেমনিভাবে ধাঁধা লাগানো অত্যাধুনিক নানা আবিষ্কারে আর বিজ্ঞাপনে দিশেহারা, সে জাতি কীভাবে তাদের শিশুর সেই হারানো অদৃশ্য শক্তিকে ফিরে পাবে এবং নতুন প্রজন্ম থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারবে। এবং তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারবে?

এ সকল প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে একটিই। তা হচ্ছে, পারিবারিক ভূমিকাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক ভূমিকার মাধ্যমে সঠিকভাবে শিশুর লালন-পালন ও তার পরিচর্যা করে শিশুর আত্মিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে হবে। তাহলে এক পর্যায়ে জাতি এহেন পরিস্থিতি থেকে মুক্তির লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে।

■ পশ্চিমা পরিবার এবং ইসলামি পরিবারের মধ্যে

পার্থক্য :

পশ্চিমা পরিবার ব্যবস্থা এবং ইসলামি পরিবার ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শগত, গাঠনিক এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের দিক থেকে বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

নিচে এই দুটি সংস্কৃতির পরিবার ব্যবস্থার মূল দিকগুলো তুলনা করে আলোচনা করা হলো:

১. আদর্শিক ও দার্শনিক ভিত্তি

পশ্চিমা পরিবার: আধুনিক পশ্চিমা সমাজের পরিবার ব্যবস্থা মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism),ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখানে পরিবারের চেয়ে ব্যক্তির সুখ, অধিকার এবং আত্মউন্নয়নকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়।

ইসলামি পরিবার: ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ) এবং ধর্মীয় বিধানের ওপর ভিত্তি করে। এখানে পরিবারকে একটি পবিত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়, যেখানে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। ব্যক্তির চেয়ে পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি এখানে বেশি গুরুত্ব পায়।

২. পরিবারের গঠন ও কাঠামো

পশ্চিমা পরিবার: পশ্চিমে ঐতিহ্যগত যৌথ পরিবার ভেঙে এখন মূলত একক পরিবার (Nuclear Family) প্রধান হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া সেখানে সিঙ্গেল-প্যারেন্ট (একক অভিভাবক), লিভ-ইন-টুগেদার (বিয়ে ছাড়া লিভিং), কিংবা পুনর্গঠিত পরিবার (Blended Family) খুবই সাধারণ বিষয়।

ইসলামি পরিবার:ইসলামে সাধারণত বর্ধিত বা যৌথ পরিবার (Extended Family) ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা হয়। বাবা-মা, ভাই-বোন এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা (সিলাহ রেহেম) ধর্মীয়ভাবে বাধ্যতামূলক।

৩. বিয়ে এবং সম্পর্কের বৈধতা

পশ্চিমা পরিবার: বিয়ে একটি আইনি বা সামাজিক চুক্তি মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ে ছাড়াও লিভ-ইন পার্টনারশিপ বা সহাবস্থানকে সামাজিকভাবে এবং আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সন্তানের বৈধতার জন্য বিয়ে সেখানে সবসময় জরুরি নয়।

ইসলামি পরিবার: ইসলামে পরিবার গঠনের একমাত্র বৈধ মাধ্যম হলো নিকাহ (বিয়ে), যা একই সাথে একটি দেওয়ানি চুক্তি এবং ইবাদত। বিয়ে বহির্ভূত যেকোনো শারীরিক সম্পর্ক (জিনা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এর ফলে জন্ম নেওয়া সন্তানের আইনি বা উত্তরাধিকারগত অধিকার থাকে না।

৪. ভূমিকা ও দায়িত্বের বণ্টন

পশ্চিমা পরিবার: এখানে সম্পূর্ণ সমতা (Egalitarianism) নীতি অনুসরণের চেষ্টা করা হয়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সাধারণত অর্থ উপার্জন করেন এবং ঘরের কাজ ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করেন। নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এখানে কঠোরভাবে দেখা হয় না।

ইসলামি পরিবার: ইসলামে স্বামী ও স্ত্রীর ভূমিকাকে পরিপূরক (Complementary) হিসেবে দেখা হয়, সমান বা অভিন্ন (Identical) হিসেবে নয়।

স্বামীর দায়িত্ব: পরিবারের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক দায়িত্ব (ভরণপোষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা) স্বামীর ওপর ন্যস্ত। তাকে পরিবারের অভিভাবক (কাউয়াম) করা হয়েছে।
স্ত্রীর দায়িত্ব: স্ত্রী হলেন ঘরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সন্তান লালন-পালনের মূল চালিকাশক্তি। তবে ইসলাম নারীকে অর্থ উপার্জনের বা ব্যবসা করার অধিকার দিয়েছে, এবং স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে স্বামীর কোনো অধিকার নেই।

৫. পিতা-মাতা এবং প্রবীণদের অবস্থান

পশ্চিমা পরিবার: সন্তানরা ১৮ বছর বয়স পার হওয়ার পর সাধারণত স্বাধীনভাবে বসবাস শুরু করে। বাবা-মার ওপর সন্তানদের বা সন্তানদের ওপর বাবা-মার আইনি বা অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা কমে যায়। প্রবীণ বয়সে অনেক বাবা-মা ওল্ড হোম বা বৃদ্ধাশ্রমে জীবন কাটান।
ইসলামি পরিবার: ইসলামে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবা করার গুরুত্ব আল্লাহর ইবাদতের ঠিক পরেই স্থান দেওয়া
হয়েছে। সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলেও বাবা-মার প্রতি তার দায়িত্ব শেষ হয় না।
প্রবীণ বয়সে বাবা-মাকে নিজের কাছে রেখে সেবা করা সন্তানের জন্য জান্নাত লাভের মাধ্যম এবং নৈতিক কর্তব্য।

পশ্চিমা পরিবার ও ইসলামি পরিবারের মধ্যে তুলনামূলক সারসংক্ষেপ:

বৈশিষ্ট্য	পশ্চিমা পরিবার ব্যবস্থা	ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা
মূল চেতনা	ব্যক্তি স্বতন্ত্রবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।	ধর্মীয় জ্ঞান, খোদাভীরু ও সামাজিক সংহতি।
কেন্দ্রবিন্দু	ব্যাক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার।	পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও ত্যাগ।

অর্থনৈতিক দায়িত্ব	স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের উপর সাধারণ বণ্টন।	সম্পূর্ণভাবে স্বামীর উপর ন্যাস্ত(স্ত্রীর অধিকার সুরক্ষিত)।
বিচ্ছেদ ও তালাক	আইনি প্রক্রিয়ায় সহজ এবং অত্যন্ত সাধারণ।	আইনগত অধিকার রয়েছে, তবে একে সবচেয়ে অপ্রিয় হালাল কাজ মনে করা হয়।
প্রবীণদের যত্ন	রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা ওল্ড হোমের উপর নির্ভরতা বেশি	পরিবারের অভ্যন্তরে সরাসরি সন্তানদের তত্ত্বাবধান বাধ্যতামূলক

সংক্ষেপে বলা যায়, পশ্চিমা পরিবার ব্যবস্থা যেখানে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সমতার আধুনিক ধারণার ওপর জোর দেয়, সেখানে ইসলামি পরিবার ব্যবস্থা পারস্পরিক অধিকার, সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং একটি সুশৃঙ্খল আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে দ্বীনি ইলম এর অপরিহার্যতা

ইসলামি পরিবার কেবল রক্তের সম্পর্কের একটি কাঠামো নয়; বরং এটি ঈমান, আমল, আখলাক এবং আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান। একটি পরিবার তখনই প্রকৃত অর্থে শান্তিময় ও বরকতময় হয়, যখন সেই পরিবারের ভিত্তি হয় কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান।

দ্বীনি ইলম ছাড়া মানুষ সঠিক-ভুলের পার্থক্য বুঝতে পারে না, ইবাদতের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারে না এবং পরিবারকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করতেও ব্যর্থ হয়।

বর্তমান যুগে মানুষ দুনিয়াবি শিক্ষায় যত অগ্রসর হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দ্বীনি জ্ঞান থেকে তত দূরে সরে যাচ্ছে।

ফলে পরিবারে অশান্তি, সম্পর্কের অবনতি, সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয় এবং দাম্পত্য জীবনে বরকতের অভাব দেখা দিচ্ছে। তাই ইসলামি পরিবার গঠনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন দ্বীনি ইলম।

ইসলামী জীবনদর্শনে একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও আদর্শ পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর দ্বীনি ইলম (ধর্মীয় জ্ঞান) অর্জন ও তার চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পরিবারকে সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর বলা হয়েছে। আর এই ভিত্তিকে মজবুত করতে দ্বীনি ইলমের কোনো বিকল্প নেই।

একটি পরিবারের শিকড়ে থাকে দুজন ব্যক্তি স্বামী ও স্ত্রী। এই দুজন ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন পরিচয় বহন করে। তারা কখনো হয় মা-বাবা, কখনো হয় শ্বশুর-শাশুড়ি, কখনো বা হয় দাদা দাদি, নানা-নানি। তাই এই দুইজন ব্যক্তির পারিবারিক দায়িত্বের পরিধি বিশাল। একটি ইসলামী পরিবার গঠনে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা থাকে মুখ্য।

একটি ইসলামী পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হল স্বামী স্ত্রীর দ্বীনি ইলম থাকা। স্বামী স্ত্রী দ্বীনদার হলে, তাদের দ্বীনের জ্ঞান যথেষ্ট থাকলে তাদের সংসার পরিচালনা করা সহজ হবে। কেননা দ্বীনদার ব্যক্তি শরীয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু বিবেচনা করে চলার চেষ্টা করবে।

ফলে তারা সুষ্ঠুভাবে সংসার পরিচালনা করতে পারবে।।অপরদিকে কোনো পরিবারের স্বামী স্ত্রীর দ্বীনি ইলম না থাকলে তাদের ইলম অর্জন করা জরুরি। ইলমবিহীন জীবন সুখের হয়না। যার ইলম নেই সে আল্লাহকে চিনতে পারবেনা, আল্লাহর হুকুম আহকাম সম্পর্কে গাফেল থাকবে,অন্যকে আল্লাহর পথে ডাকতে পারবেনা। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গাফেল থাকলেও তাদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেনা। ফলে তার পরবর্তী প্রজন্ম হবে আরো নাফরমান। আল্লাহর নাফরমানীর কারণে তারা পথভ্রষ্ঠ হবে এবং সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবে।
ফলে পারিবারিক কলহ বেড়ে যাবে। আমাদের ইলমের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বেসিক কিছু জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
যেমন- ঈমান ও আরকানুল ঈমান, ইসলাম ও আরকানুল ইসলাম, কুফর-শিরক, ফিক্বহ, কুরআন সহীহ্ শুদ্ধ করণ, সীরাহ (রাসূল (স:) এর জিন্দেগী) ও সাহাবিদের জিন্দেগী ইত্যাদি।

আমরা যদি সরাসরি কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে শিখতে না পারি অন্তত অনলাইনে এসব বিষয়ে কোর্স করার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ ।
Islamic Online Madrasa (IOM) সহ বিভিন্ন দ্বীনী অনলাইন প্লাটফর্ম আছে। যেখানে এই সামগ্রিক বিষয়কে ফরজে আইন কোর্স হিসেবে চালু করেছে।
যার মূল লক্ষ্য হলো অন্তত মানুষ যেনো দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে যতটুকু বিষয় জানা আবশ্যক অন্তত ততটুকু যেনো প্রত্যেকের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারে।
আল্লহ তাদের এই মেহনতকে কবুল করুক। আমিন।

ইসলামের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে ঈমান এবং এর মৌলিক রুকন বা স্তম্ভগুলোর ওপর। একজন মানুষের মুসলিম হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো ঈমান। নিচে ঈমান এবং আরকানুল ঈমান (ঈমানের স্তম্ভসমূহ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

- **ঈমান (الإيمان):**

'ঈমান' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা, আস্থা রাখা, স্বীকার করা বা মেনে নেওয়া। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক।

কেবল মুখে স্বীকার করার নাম ঈমান নয়, বরং এর জন্য ৩টি বিষয়ের সমন্বয় জরুরি:
১. তাসদিকুম বিল কালব (تصديق بالقلب): অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।
২. ইকরারুম বিল লিসান (إقرار باللسان): মুখে তা স্বীকার করা।
৩. আমালুম বিল আরকান (عمل بالأركان): সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজে পরিণত করা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা।
সহজ কথায়, আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল (সা.) এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে অন্তরে সত্য বলে বিশ্বাস করা, মুখে তা স্বীকার করা এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার নামই ঈমান।

■ **আরকানুল ঈমান (أركان الإيمان) বা ঈমানের স্তম্ভসমূহ:**
'আরকান' শব্দটি 'রুকন'-এর বহুবচন, যার অর্থ স্তম্ভ বা খুঁটি। আরকানুল ঈমান অর্থ ঈমানের স্তম্ভসমূহ। বিখ্যাত 'হাদিসে জিবরাইল'-এ মহানবী (সা.) ঈমানের ৬টি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ছয়টি বিষয়ের ওপর কোনো সন্দেহ ছাড়া দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরজ।

নিচে স্তম্ভ ৬টি বিস্তারিত দেওয়া হলো:

ক. আল্লাহর ওপর বিশ্বাস (الإيمان بالله):
এটি ঈমানের সবচেয়ে প্রধান এবং প্রথম স্তম্ভ। এর অর্থ হলো— আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় (তাওহীদ)। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বশক্তিমান এবং সমস্ত রাজত্বের মালিক। তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী রয়েছে, যেগুলোতে সৃষ্টির কোনো সাদৃশ্য নেই। একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য।

খ. ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস (الإيمان بالملائكة):
ফেরেশতারা আল্লাহর এক নূরানী সৃষ্টি। তারা পুরুষও নন, নারীও নন। তাদের আহার, নিদ্রা বা প্রজননের প্রয়োজন হয় না। তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর আদেশ পালনে নিয়োজিত থাকেন। ফেরেশতাদের সংখ্যা অসংখ্য, যার সঠিক হিসাব কেবল আল্লাহই জানেন। তবে চারজন প্রধান ফেরেশতা হলেন: জিবরাইল (আ.), মিকাইল (আ.), আজরাইল (আ.) এবং ইসরাফিল (আ.)।

গ. আসমানী কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস (الإيمان بالكتب):

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসুলগণের ওপর যে কিতাব বা সহীফা নাজিল করেছেন, সেগুলোর ওপর বিশ্বাস রাখা।

বড় আসমানী কিতাব ৪টি:

১.তাওরাত: হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর।

২.যবুর: হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর।

৩.ইঞ্জিল: হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর।

৪.কুরআন মাজীদ: সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর।

বর্তমানে কেবল কুরআনই অবিকৃত ও অপরিবর্তিত রয়েছে এবং এটি কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির একমাত্র পথপ্রদর্শক।

ঘ. রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস (الإيمان بالرسل):

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনার জন্য পৃথিবীতে বহু নবী ও রাসুল পাঠিয়েছেন। প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আ.) এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। নবী-রাসুলদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ না করে সবাইকে আল্লাহর প্রেরিত সত্যদূত হিসেবে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ।

ঙ. আখিরাত বা পরকালের ওপর বিশ্বাস (الإيمان باليوم الآخر):

এই পার্থিব জীবনই শেষ নয়, মৃত্যুর পর আরেকটি অনন্তকালের জীবন রয়েছে— এই বিশ্বাস রাখা। পরকালের জীবনের মধ্যে রয়েছে— কবরের সওয়াল-জওয়াব ও আজাব, কিয়ামত (পুনরুত্থান), হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ, মিযান (আমলনামা পরিমাপ), পুলসিরাত এবং চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে জান্নাত ও জাহান্নাম।

চ. তাকদীর বা ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস (الإيمان بالقدر):

বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটে, ভালো বা মন্দ, লাভ বা ক্ষতি— সবকিছু আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত জ্ঞান এবং ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে। মানুষ চেষ্টা ও আমল করবে, কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর ফয়সালার ওপর নির্ভরশীল। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং সুখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার মূল চাবিকাঠি হলো তাকদীরের ওপর বিশ্বাস।

জেনে রাখা জরুরি_
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী, মানুষের ঈমান বাড়ে এবং কমে।

ঈমান বৃদ্ধি পায়: আল্লাহর আনুগত্য, জিকির, সৎ কাজ এবং ইবাদতের মাধ্যমে।
ঈমান হ্রাস পায়: গুনাহের কাজ, আল্লাহর অবাধ্যতা এবং দ্বীনের প্রতি উদাসীনতার মাধ্যমে।

আরকানুল ঈমানের এই ছয়টি স্তম্ভের কোনো একটিকে অস্বীকার করলে বা তা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলে মানুষ ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। একজন প্রকৃত মুমিন এই বিষয়গুলোকে অন্তরে লালন করে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটায় তার দৈনন্দিন জীবনে ও আমলে।

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা, ঈমান কিভাবে ভাঙ্গে কিভাবে বাড়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। ঈমান বিষয়ক কিতাব গুলো আমাদের অধ্যায়ন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকের মনের একান্ত চাওয়া ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার মধ্যেই রয়েছে আখিরাতের সফলতা। আমরা মহান আল্লাহর নিকট ঈমানী মৃত্যুর জন্য দুয়া করি।।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত_
হাদিসে এসেছে, “হে আল্লাহ আপনি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রাখেন তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দেন তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করুন।”
ঈমানী মৃত্যুর জন্য বিশুদ্ধ ঈমান থাকা জরুরী। তাই বিশুদ্ধ ঈমান আনতে হলে এবং ঈমানের উপর মৃত্যু চাইলে ঈমানের যাবতীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান করা অর্জন আবশ্যক।

■ **ইসলাম (الإسلام):**

'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, শান্তির পথে চলা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়— একমাত্র আল্লাহর তাওহীদের (একত্ববাদের) সামনে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে মুক্ত থাকার নামই ইসলাম।

একজন মানুষ যখন অন্তরে বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করে মুখে তা স্বীকার করে এবং আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে সঁপে দেয়, তখন সে 'মুসলিম' হিসেবে গণ্য হয়।

■ **আরকানুল ইসলাম (أركان الإسلام) বা ইসলামের স্তম্ভসমূহ:**

'আরকানুল ইসলাম' অর্থ ইসলামের রুকন বা মৌলিক স্তম্ভসমূহ। বিখ্যাত 'হাদিসে জিবরাইল' এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ ৫টি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত."*
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

নিচে এই ৫টি স্তম্ভ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. শাহাদাহ্ বা সাক্ষ্য দেওয়া (الشهادة):

এটি ইসলামের প্রথম ও প্রধান স্তম্ভ। এর অর্থ হলো মুখে ও অন্তরে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে_

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

অর্থ-আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

এই সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করে।

খ. সালাত বা নামাজ কায়েম করা (إقامة الصلاة):

শাহাদাহ্-এর পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ইবাদত হলো সালাত। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলিমের জন্য দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ। নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে। হাদিসে সালাতকে 'দ্বীনের খুঁটি' বলা হয়েছে।

গ. যাকাত প্রদান করা (إيتاء الزكاة):

যাকাত হলো একটি আর্থিক ইবাদত। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য ইসলাম এটিকে ফরজ করেছে। শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের (নিসাব পরিমাণ) মালিক হলে, প্রতি বছর তার উদ্বৃত্ত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (২.৫ %) গরীব ও অভাবী মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা আবশ্যক। এটি ধনীদের দয়া নয়, বরং দরিদ্রদের অধিকার।

ঘ. সওম বা রোজা পালন করা (صوم رمضان):

পবিত্র রমজান মাসে দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তসহকারে আহার, পানীয় এবং যাবতীয় পাপাচার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম সওম। এটি মানুষের অন্তরে তাকওয়া (আল্লাহভীতি), ধৈর্য ও সহানুভূতির গুণাবলি জাগ্রত করে।

ঙ. হাজ্জ বা হজ করা (حج البيت):

শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান (বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়া-আসার খরচ বহনে সক্ষম) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জীবনে একবার মক্কা শরীফে গিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে হজ সম্পাদন করা ফরজ। এটি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের এক অনন্য নিদর্শন, যেখানে বর্ণ, ভাষা ও জাতীয়তার উর্ধ্বে উঠে সব মানুষ এক আল্লাহর দরবারে সমবেত হয়।

ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক_

ইসলামী আকিদা অনুযায়ী, ঈমান এবং ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত:

- **ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ বিষয়:** যা মানুষের অন্তরের বিশ্বাস, নিয়ত ও অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত (যেমন: আল্লাহ, ফেরেশতা ও আখিরাতের ওপর বিশ্বাস ইত্যাদি)।
- **ইসলাম হলো বাহ্যিক বিষয়:** যা মানুষের কর্ম, ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায় (যেমন: নামাজ, রোজা, যাকাত ইত্যাদি)।

অন্তরে ঈমান না থাকলে বাহ্যিক ইসলামের কোনো মূল্য নেই (যা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য), আবার বাহ্যিক আমল বা ইসলাম না থাকলে অন্তরের ঈমান পূর্ণতা পায় না।

আরকানুল ইসলাম হলো একজন মুসলিমের দৈনন্দিন ও সামগ্রিক জীবন পরিচালনার ফ্রেমওয়ার্ক। এই পাঁচটি স্তম্ভকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই একজন মানুষ

ইহকালে শান্তি এবং পরকালে মুক্তির মহাসড়কে অবতীর্ণ হতে পারে।

■ আক্বীদা (العقيدة) (কুফর-শিরক):

আক্বীদা শব্দটি আরবী, যা 'আক্দ' (العقد) ধাতু থেকে এসেছে। এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ নিম্নরূপ:

আভিধানিক অর্থ (Literal Meaning):'আক্বীদা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো— দৃঢ় বিশ্বাস, গিঁট দেওয়া, মজবুত বন্ধন বা মনের অটল ফয়সালা। অর্থাৎ, এমন একটি বিশ্বাস যা মানুষের মনে এমনভাবে গেঁথে যায়, যেখানে কোনো সন্দেহ বা সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

পারিভাষিক অর্থ (Technical Meaning):ইসলামী পরিভাষায় আক্বীদা বলতে বোঝায়—"আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাকুল, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের প্রতি মনে-প্রাণে এমন দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস স্থাপন করা, যাতে বিন্দুমাত্র কোনো সন্দেহ, দ্বিধা বা সংশয় থাকে না।"

সহজ কথায়, একজন মুসলিমের ঈমানের মূল বিষয়গুলোকে অন্তরে শতভাগ সত্য বলে মেনে নেওয়ার নামই হলো আক্বীদা। একেই মূলত 'ইসলামী আক্বীদা' বলা হয়।

ইসলামী আকিদা বা বিশ্বাস ব্যবস্থার সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দুটি পরিভাষা হলো কুফর ও শিরক। ঈমান আনার পর একজন মুসলিমের জন্য এই দুটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কারণ কুফর ও শিরকের মাধ্যমে মানুষের ঈমান ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরকালের চিরস্থায়ী মুক্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

নিচে কুফর ও শিরকের বিস্তারিত বিবরণ, প্রকারভেদ এবং এদের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

ক. কুফর (الكفر):

'কুফর' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গোপন করা, ঢেকে রাখা বা অস্বীকার করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়— আল্লাহ তাআলা, তাঁর রাসুল (সা.) এবং ইসলামের মৌলিক ও আবশ্যিক বিশ্বাস্য বিষয়গুলোর (যেমন: ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, আখিরাত, তাকদীর ইত্যাদি) কোনো একটি বা সবগুলোকে অস্বীকার করা বা অবজ্ঞা করার নাম কুফর।

যে ব্যক্তি কুফর লিপ্ত হয়, তাকে কাফির বলা হয়।

কুফরের প্রধান প্রকারভেদ:

উলামায়ে কেরাম কুফরকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

১. কুফরে আকবার (বড় কুফর): যা মানুষকে ইসলামের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয় এবং এর ওপর মৃত্যু হলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

২. কুফরে আসগার (ছোট কুফর): একে 'নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা' বা 'আমলী কুফর'-ও বলা হয়। এর দ্বারা মানুষ কাফির হয় না, তবে এটি বড় গুনাহ (যেমন: কোনো মুসলিমকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা বা আল্লাহর নিয়ামতের পীত অবজ্ঞা করা)।

বড় কুফরের কিছু রূপ:

- কুফরে তাকযীব (অস্বীকারবশত কুফর): অন্তরে এবং মুখে ইসলামের সত্যতাকে সরাসরি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।
- কুফরে ইবা ও ইস্তিকবার (অহংকারবশত কুফর): সত্য জানার পরও কেবল অহংকার বা হঠকারিতার কারণে তা মেনে না নেওয়া (যেমনটি ইবলিস করেছিল)।
- কুফরে শাক (সন্দেহবশত কুফর): ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ে (যেমন পরকাল বা আল্লাহর অস্তিত্ব) সন্দেহ পোষণ করা।
- কুফরে নিফাক (মুনাফিকী কুফর): মুখে ইসলামের প্রকাশ করা কিন্তু অন্তরে কুফর বা অবিশ্বাস লুকিয়ে রাখা।

খ. শিরক (الشرك):

'শিরক' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অংশীদার করা, অংশী স্থাপন করা বা সমকক্ষ নির্ধারণ করা। ইসলামী পরিভাষায়— আল্লাহর জাত (সত্তা), সিফাত (গুণাবলী), ইবাদত বা রুবুবিয়্যাত (সার্বভৌমত্ব ও পরিচালন ক্ষমতা)-এর ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার সাব্যস্ত করার নাম শিরক। যে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হয়, তাকে মুশরিক বলা হয়।

কোরআন মাজীদে শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বা অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

"নিশ্চয়ই শিরক হলো চরম জুলুম।" (সূরা লোকমান: ১৩)

শিরকের প্রকারভেদ:

শিরক মূলত দুভাগে বিভক্ত:

১. শিরকে আকবার (বড় শিরক):

আল্লাহর সুনির্দিষ্ট কোনো গুণ বা ইবাদত অন্য কারো জন্য উৎসর্গ করা। এই শিরক করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিয (বহিষ্কৃত) হয়ে যায়। এর উদাহরণ:

- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবেহ বা মানত করা।
- কোনো পীর, মাজার, মূর্তি বা সৃষ্টির কাছে সন্তান, আরোগ্য বা রিযিক প্রার্থনা করা (দোয়ায় শিরক)।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ অদৃশ্যের খবর (গায়েবের জ্ঞান) জানে বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আইন বা বিধান দাতা হিসেবে নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়া।

২. শিরকে আসগার (ছোট শিরক):

যেসব কর্ম বা কথা বড় শিরকের সমপর্যায়ের নয়, কিন্তু তাওহীদের পরিপন্থী এবং বড় শিরকের মাধ্যম। এর দ্বারা মানুষ ইসলাম থেকে বের হয় না, তবে এটি কবিরা গুনাহের চেয়েও মারাত্মক। এর উদাহরণ:

- রিয়া (লোকদেখানো ইবাদত): মানুষের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে নামাজ, দান বা অন্য কোনো ভালো কাজ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) একে 'গুপ্ত শিরক' বলেছেন।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম খাওয়া: যেমন- বিদ্যা, মাটি বা সন্তানের মাথা ছুঁয়ে কসম খাওয়া ইত্যাদি।
- তাবীজ-কবজ বা কোনো পাথর নিজের ভাগ্য পরিবর্তন বা রোগমুক্তির মাধ্যম হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা (যদি বিশ্বাস থাকে যে পাথরটি নিজেই ক্ষমতা রাখে, তবে তা বড় শিরক হবে)।

সহজ উদাহরণ: কেউ যদি বলে "আল্লাহ বলতে কেউ নেই" বা "নামাজ ফরয নয়"— তবে সে কুফর করল। আর কেউ যদি বলে "আল্লাহ আছেন, তবে এই পীর বা মূর্তিও আমাকে সাহায্য করতে পারে"— তবে সে শিরক করল।

ভয়াবহতা ও পরিণতি_

১. ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ: কোনো ব্যক্তি শিরক বা কুফরের ওপর তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্য যেকোনো গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন।"

(সূরা আন-নিসা: ৪৮)

২. আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়া: শিরক বা কুফরে লিপ্ত হলে মানুষের জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত ভালো আমল (নামাজ, রোজা, হজ) বাতিল বা ধ্বংস হয়ে যায়।

৩. জান্নাত হারাম হওয়া: মুশরিক ও কাফিরদের জন্য জান্নাত চিরতরে হারাম এবং জাহান্নাম অবধারিত।

বাঁচার উপায়:

কুফর ও শিরক থেকে বাঁচতে হলে খাঁটি নিয়তে তাওহীদ (একত্ববাদ)-এর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে কথাবার্তা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। ভুলবশত কোনো কুফরি বা শিরকি কাজ হয়ে গেলে অবিলম্বে অনুতপ্ত হয়ে 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে খাঁটি তাওবার মাধ্যমে পুনরায় ঈমান নবায়ন করে নিতে হবে।

■ **ফিক্বহের পরিচয় এবং ফিক্বহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:**

ইসলামী শরীআতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক শাখা হলো ফিক্বহ (الفقه)। দ্বীনের বিধি-বিধান সঠিকভাবে পালন করার জন্য ফিক্বহ শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। নিচে ফিক্বহের পরিচয় এবং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ফিক্বহের পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ (Literal Meaning):

'ফিকহ' শব্দের অর্থ গভীর জ্ঞান, উপলব্ধি করা, বা সূক্ষ্মদর্শিতা।

ফিকহ (Fiqh) হলো কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা (ঐকমত্য) ও কিয়াস (যুক্তি)-এর আলোকে দৈনন্দিন জীবনের বিস্তারিত প্রমাণসহ ইসলামি শরিয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধান বা আইনশাস্ত্র। এটি মুসলমানদের হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ এবং ইবাদতের সুনির্দিষ্ট নিয়ম (ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত) বুঝতে সাহায্য করে, যা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সঠিক পথ নির্দেশ করে।

পারিভাষিক অর্থ (Technical Meaning):

বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের আলোকে শরিয়তের শাখাগত বিধি-বিধান (হুকুম-আহকাম) জেনে নেওয়াকে ফিকহ বলে। সহজ কথায়, এটি হলো কুরআন ও হাদীস থেকে আহরিত ইসলামি আইন। ফিকহের মূল ভিত্তি হলো কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস।

ফিক্বহ শাস্ত্রের গুরুত্ব

ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাসের নাম নয়, বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এই জীবনবিধানকে বাস্তব জীবনে রূপ দেওয়ার জন্য ফিক্বহ শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

দ্বীনের সঠিক সমঝ বা জ্ঞান লাভ: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিক্বহ) দান করেন।" *(সহীহ বুখারী)*

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ফিক্বহ বা সঠিক উপলব্ধি লাভ করা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ।

কুরআন ও সুন্নাহর প্রায়োগিক রূপ: পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অনেক বিধান সংক্ষেপে বা মূলনীতি আকারে বর্ণিত হয়েছে। ফিক্বহ শাস্ত্রের মাধ্যমেই সেই মূলনীতিগুলোকে আমাদের বাস্তব জীবনের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইবাদত কবুল হওয়ার মাধ্যম: সঠিক নিয়মে ইবাদত না করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও যাকাত আদায়ের সঠিক ও সূক্ষ্ম পদ্ধতিগুলো আমরা ফিক্বহ শাস্ত্রের মাধ্যমেই জানতে পারি।

ফিক্বহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

মানবজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ফিক্বহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এর মূল প্রয়োজনীয়তাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

ক. দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান:

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সামনে নতুন নতুন সমস্যা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় (যেমন: আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল লেনদেনের

বিধান)। কুরআন ও হাদীসের আলোকেও এসব সমসাময়িক সমস্যার সমাধান ফিক্বহ শাস্ত্রের (ইজতিহাদের) মাধ্যমেই বের করা সম্ভব হয়।

খ. হালাল ও হারামের পার্থক্য নিরূপণ:

মানবজীবনে কোন কাজটি বৈধ (হালাল) এবং কোনটি অবৈধ (হারাম), কোন ব্যবসাটি সঠিক আর কোনটিতে সুদ বা জুয়া রয়েছে—এসবের সূক্ষ্ম সীমানা নির্ধারণ করে দেয় ফিক্বহ। ফলে একজন মুমিন খুব সহজেই পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে।

গ. পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা:

বিবাহ, তালাক, সন্তানের লালন-পালন, ভরণপোষণ এবং মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পত্তির সঠিক বন্টন—এই বিষয়গুলো ফিক্বহের 'মুআমালাত' (পারিবারিক ও সামাজিক লেনদেন) অংশের অন্তর্ভুক্ত। ফিক্বহের জ্ঞান না থাকলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন পরিচালনা:

একটি ইসলামী রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা কেমন হবে, অপরাধের শাস্তি (হুদুদ ও তাযীর) কীভাবে কার্যকর হবে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কেমন হবে—এসবের নিখুঁত গাইডলাইন দেয় ফিক্বহ শাস্ত্র।

সংক্ষেপে বলা যায়, ফিক্বহ হলো ইসলামের একটি জীবন্ত চালিকাশক্তি। কুরআন ও সুন্নাহ যদি হয় ইসলামের উৎস, তবে ফিক্বহ হলো সেই উৎস থেকে আহরিত সুপেয় পানি, যা মানবজাতির তৃষ্ণা মেটায় এবং জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই ইসলামের বিধান অনুযায়ী নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফিক্বহের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

■ কুরআন সহীহ্ করণ:

ইসলামী পরিভাষায়, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফ বা অক্ষরকে তার নির্ধারিত মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) এবং সিফাত (উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী) অনুযায়ী নিখুঁত ও চমৎকারভাবে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করার নিয়মাবলীকে তাজবিদ বলে।

সহজ কথায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেভাবে জিবরাইল (আ.)-এর কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শিখেছিলেন, ঠিক সেই নিয়ম ও ধ্বনি বজায় রেখে কুরআন পড়ার বিজ্ঞানসম্মত নিয়মই হলো তাজবিদ।

১. কুরআন সহীহ্ শুদ্ধ করণ মানে:

সহীহ্-শুদ্ধকরণের মূল ভিত্তি হলো দুটি বিষয়:

মাখরাজ (مَخْرَج): আরবি হরফগুলো মুখের ঠিক কোন জায়গা (জিহ্বা, তালু, কণ্ঠনালী, ঠোঁট) থেকে উচ্চারিত হয়, তা সঠিকভাবে আদায় করা। যেমন: 'আলিফ' এবং 'আইন', কিংবা 'হা' (ح) এবং 'হা' (ه) এর উচ্চারণ আলাদা করা।

তাজবিদ (تَجْوِيد): কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ নিয়মাবলী। কোথায় গুন্নাহ (নাক দিয়ে উচ্চারণ) করতে হবে, কোথায় টানতে (মদ্দ) হবে, কোথায় মোটা বা চিকন করে পড়তে হবে—এসব নিয়ম মেনে চলা।

সহজ কথায়, আরবি নিয়মের কোনো পরিবর্তন না করে, মহানবী (সা.) যেভাবে জিবরাইল (আ.)-এর কাছ থেকে কুরআন শিখেছিলেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করাকে সহীহ্-শুদ্ধকরণ বলে।

ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ফরজ): আল্লামা ইবনুল জাযারী (রহ.)-এর মতে, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কুরআন পড়ার সময় ন্যূনতম তাজবিদ (যাতে অর্থ বিকৃত না হয়) মেনে চলা ফরজ বা আবশ্যিক।

অর্থ ঠিক রাখা: আরবি এমন একটি সংবেদনশীল ভাষা, যেখানে সামান্য উচ্চারণের ভুলে পুরো অর্থ বদলে যায়। অর্থ ঠিক রাখার জন্য সঠিক উচ্চারণ আবশ্যক।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"ورتل القرآن ترتيلا"

"এবং কুরআন আবৃত্তি করো সুবিন্যস্তভাবে ও সুস্পষ্টভাবে (তাজবিদসহ তারতীলের সাথে)।" (সূরা মুযযাম্মিল: ৪)

সালাত বা নামাজ কবুল হওয়া: সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ। এখন কেউ যদি ভুল উচ্চারণে কুরআন পড়ে এবং তার ফলে যদি অর্থ মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়ে যায়, তবে নামাজ নষ্ট বা ফাসেদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইবাদতের পূর্ণতা ও প্রশান্তি: সহীহ্ ও সুন্দর তিলাওয়াত হৃদয়ে প্রশান্তি আনে এবং ইবাদতের একাগ্রতা বাড়িয়ে দেয়।

৩. কুরআন সহীহ্ শুদ্ধ না করার কিছু বিশেষ ক্ষতি:

কুরআন অশুদ্ধভাবে পড়ার পরিণতি বা ক্ষতি মারাত্মক হতে পারে:

অর্থের মারাত্মক বিকৃতি (লাহনে জালী): উচ্চারণের ভুলের কারণে অনেক সময় অর্থ কুফরীর পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

উদাহরণ: কেউ যদি 'ক্বালব' (قَلْبٌ - অর্থ: অন্তর) শব্দের 'ক্বফ' হরফটিকে সাধারণ 'কাফ' দিয়ে 'কালব' (كَلْبٌ) উচ্চারণ করে, তবে তার অর্থ হয়ে যাবে "কুকুর"। নামাজে এমন ভুল হলে নামাজ ভেঙে যায়।

সওয়াবের বদলে গুনাহ হওয়া: ইচ্ছাকৃতভাবে শেখার চেষ্টা না করে ভুল পড়তে থাকলে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাদিসে এসেছে, কিছু মানুষ কুরআন পড়ে অথচ কুরআন তাদের ওপর লানত (অভিশাপ) বর্ষণ করে।

পরকালে জবাবদিহিতা: আল্লাহ আমাদের যে মেধা ও সময় দিয়েছেন, তা দুনিয়াবী কাজে নিখুঁতভাবে ব্যবহার করে আল্লাহর কিতাব শেখার পেছনে ব্যয় না করলে কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে।

৪. পরিত্রাণের উপায়:

অশুদ্ধ তিলাওয়াতের এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে এবং কুরআন সহীহ্ করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

দৃঢ় ইচ্ছা ও নিয়ত করা: প্রথমেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের তিলাওয়াত শুদ্ধ করার খাঁটি নিয়ত ও মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

উস্তাদ বা শিক্ষকের শরণাপন্ন হওয়া: কুরআন শুধু বই বা অডিও শুনে নিজে নিজে নিখুঁতভাবে শেখা কঠিন। একজন অভিজ্ঞ ক্বারী বা হাফেজের কাছে সরাসরি বসে লোকমা (ভুল সংশোধন) নেওয়া সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

তাজবিদের প্রাথমিক নিয়ম ও কায়দা শেখা:নুরানী কায়দা বা নাদিয়াতুল কুরআন কায়দার মাধ্যমে মাখরাজ ও গুন্নাহর নিয়মগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করা।

বেশি বেশি শোনা (Listening): বিশ্ববিখ্যাত ও দক্ষ ক্বারীদের (যেমন: ক্বারী আব্দুল বাসেত, মিশারী রাশিদ আলাফাসী) তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তারা কীভাবে হরফ উচ্চারণ করছেন তা লক্ষ্য করা।

নিয়মিত মশক বা অনুশীলন (Practice): প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে জোরে জোরে পড়ার অনুশীলন করা।

লজ্জা ও জড়তা পরিহার করা: বয়স যাই হোক না কেন, আল্লাহর কালাম শেখার ক্ষেত্রে কোনো লজ্জা রাখা যাবে না। হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কষ্ট করে আটকে আটকে কুরআন পড়ে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পায় (একটি পড়ার, অন্যটি কষ্টের)।

সুতরাং কুরআন সহীহ্ করা কঠিন কোনো বিষয় নয়, প্রয়োজন কেবল একটু সময় ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। আজই কোনো মসজিদের ইমাম সাহেব বা নির্ভরযোগ্য কোনো শিক্ষকের মাধ্যমে আপনার তিলাওয়াতটি একবার পরীক্ষা করিয়ে নিন এবং ভুল থাকলে তা সংশোধনের যাত্রা শুরু করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সহীহ্ভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

■ **সীরাহ' (السيرة) পড়া:**

'সীরাহ' (السيرة) বা সীরাতুন নবী হলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবন ইতিহাস। এটি কেবল তাঁর জন্ম-মৃত্যুর সাধারণ বিবরণ নয়; বরং তাঁর শৈশব, নবুয়ত লাভ, মক্কার দাওয়াতী জীবন, হিজরত, মদিনার রাষ্ট্র পরিচালনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি, তাঁর উন্নত চরিত্র এবং ওফাত পর্যন্ত সমগ্র জীবনের একটি নিখুঁত ও জীবন্ত দলিল।

ইসলামী শরিয়তে কুরআনের পরেই যেমন হাদিসের স্থান, তেমনি ইসলামের বাস্তব রূপকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য 'সীরাহ' জানা অপরিহার্য।

১. সীরাহ জানার গুরুত্ব:

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনকে জানা এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

এর প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কুরআনকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য:

পবিত্র কুরআন মাজীদের বহু আয়াত কোনো না কোনো প্রেক্ষাপট বা ঘটনার প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় **'শানে নুযুল'** বলা হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন তথা সীরাহ না জানলে কুরআনের আয়াতগুলোর প্রকৃত অর্থ, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োগ পদ্ধতি সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

খ) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য:

কাউকে না চিনে বা না জেনে তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা যায় না। সীরাহ পড়ার মাধ্যমে যখন একজন মুমিন জানতে পারে যে, আল্লাহর রাসুল (সা.) উম্মতের হেদায়েতের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন, তায়েফের ময়দানে কীভাবে রক্ত দিয়েছেন—তখন তাঁর প্রতি মনের ভেতর থেকে প্রকৃত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। আর রাসুল (সা.)-কে ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম শর্ত।

গ) বাস্তব জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ (Role Model) পাওয়ার জন্য:

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন_

"নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।"

(সূরা আহযাব: ২১)

তিনি একাধারে একজন আদর্শ পারিবারিক ব্যক্তি, বিশ্বস্ত বন্ধু, সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি এবং পরম দয়ালু শিক্ষক ছিলেন। আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কীভাবে চলতে হবে, তার বাস্তব রূপ আমরা সীরাহ থেকেই পাই।

ঘ) দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার প্রেরণা:

মক্কার কাফেরদের চরম অত্যাচার ও বয়কটের মুখেও রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে ঈমানের ওপর টিকে ছিলেন, সেই ইতিহাস আমাদের সমসাময়িক যুগের বিভিন্ন সংকট ও প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণ করার এবং দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার মানসিক শক্তি জোগায়।

২. সীরাহ না জানার কিছু ক্ষতিকর কিছু দিক :

সীরাহ না পড়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়; এর ফলে একজন মুসলিমের দ্বীনি ও আত্মিক জীবনে নানাবিধ মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে:

ক) অন্ধ অনুকরণ ও পথভ্রষ্টতার ঝুঁকি:

বর্তমানে মুসলিম সমাজে অনেক বিদআত ও ভুল ধারণার প্রচলন ঘটেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খাঁটি জীবনপদ্ধতি জানা না থাকলে মানুষ সহজেই বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ, উগ্রপন্থা অথবা অপসংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হতে পারে।

খ) ইসলাম সম্পর্কে সংশয় ও ভুল ধারণা তৈরি হওয়া:

বর্তমানে ইসলামবিদ্বেষীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুদ্ধ, বহুবিবাহ এবং শরিয়তের বিভিন্ন বিধান নিয়ে নানা অপপ্রচার ও তথ্য বিকৃতি ঘটায়। একজন মুসলিম যদি নিজেই সীরাহ না জানে, তবে সে এই অপপ্রচারের ফাঁদে পড়ে নিজের ঈমান নিয়ে সংশয়ে ভুগতে পারে এবং ইসলামের সঠিক প্রতিরক্ষা করতে ব্যর্থ হবে।

গ) ইবাদতে প্রাণহীনতা এবং সুন্নাহর প্রতি উদাসীনতা:

সীরাহ না জানলে ইসলামকে কেবল কিছু রীতিনীতি বা যান্ত্রিক নিয়মের সমষ্টি মনে হতে পারে। রাসুল (সা.)-এর ত্যাগ ও সংগ্রামের ইতিহাস না জানলে ইবাদতের ভেতরের আধ্যাত্মিকতা ও সুন্নাহর প্রতি যে পরম আগ্রহ থাকা দরকার, তা হারিয়ে যায়।

ঘ) আদর্শ সমাজ ও পরিবার গঠনে ব্যর্থতা:

ব্যক্তিগত অহংকার বর্জন, স্ত্রীর সাথে সদাচরণ, প্রতিবেশীর হক আদায়, ব্যবসার সততা এবং অমুসলিমদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ কেমন হওয়া উচিত—তা আমরা সীরাহ থেকে শিখি। এটি না জানার ফলে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়।

৩. সীরাহ পড়ার সঠিক পদ্ধতি ও কিছু নির্ভরযোগ্য বই:

সীরাহ পড়ার সময় কেবল গল্প বা ইতিহাসের মতো না পড়ে, **"এই ঘটনা থেকে আমার জীবনের জন্য কী শিক্ষা রয়েছে"**—এই নিয়তে পড়া উচিত।

শুরু করার জন্য নিচে কয়েকটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সীরাহ গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো:

১. আর-রাহীকুল মাখতূম (الرحيق المختوم): আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী রচিত এই বইটি বিশ্বব্যাপী সীরাহ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী এবং বর্তমান যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও নির্ভরযোগ্য সীরাহ গ্রন্থ।

২. সীরাতুন নবী (সা.): ইবনে হিশাম রচিত (এটি ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন ও মূল সীরাহ গ্রন্থগুলোর একটি)।

৩. **আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ:** ড. আলী মুহাম্মদ আস-সাল্লাবী রচিত (এটিতে প্রতিটি ঘটনার রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ এবং শিক্ষা চমৎকারভাবে তুলে করা হয়েছে)।

মোটকথা, সীরাহ জানা মানে স্বয়ং ইসলামকে জীবন্তরূপে দেখা। তাই নিজের ঈমানকে মজবুত করতে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে আমাদের প্রত্যেকেরই নিয়মিত সীরাহ চর্চা করা উচিত।

■ **সাহাবীদের জীবনী পড়া:**

সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হলেন তাঁরা, যাঁরা ঈমানের সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য বা দর্শন লাভ করেছেন এবং ঈমানের সাথেই মৃত্যুবরণ করেছেন। নবী-রাসুলদের পর মানবজাতির ইতিহাসে সাহাবীদের দলই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে পবিত্র জামাত।

ইসলামের সামগ্রিক রূপটি বুঝতে এবং নিজের ঈমান ও আমলকে খাঁটি করতে সাহাবীদের জীবনী জানা অত্যন্ত জরুরি।

এর প্রধান কারণসমূহ নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো:

১. কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক প্রয়োগ বোঝার জন্য:

পবিত্র কুরআন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসসমূহ কীভাবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হয়, সাহাবীরাই তার প্রথম ও জীবন্ত উদাহরণ।

- রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিটি নির্দেশ সাহাবীরা কীভাবে বুঝতেন এবং কীভাবে আমল করতেন, তা না জানলে দ্বীনের অনেক বিধানের ভুল ব্যাখ্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
- তাঁরা ছিলেন ইসলামের প্রথম ও প্রধান কিতাবের (কুরআন) সরাসরি সাক্ষী এবং বাহক। তাই ইসলামের সঠিক রূপটি বুঝতে সাহাবীদের জীবন জানা অপরিহার্য।

২. ঈমান ও আত্মত্যাগের প্রেরণা লাভ:

সাহাবীদের জীবনী হলো ঈমানের জন্য চরম ত্যাগ, ধৈর্য ও বীরত্বের এক অনন্য মহাকাব্য।

- হযরত বিলাল (রা.)-এর তপ্ত বালুর বুকে পাথরের নিচে চাপা পড়েও 'আহাদ' 'আহাদ' বলা, হযরত খাব্বাব (রা.)-এর জ্বলন্ত কয়লার ওপর শুয়ে থাকা, কিংবা

হযরত উসমান ও আবু বকর (রা.)-এর দ্বীনের জন্য অকাতরে সব সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার ঘটনাগুলো অলীক কোনো গল্প নয়।

- এসব সত্য ইতিহাস আমাদের বর্তমান যুগের নানাবিধ সংকট, হতাশা ও প্রতিকূলতায় দ্বীনের ওপর অবিচল থাকার এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির সবচেয়ে বড় উৎস।

৩. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মানদণ্ড (Criteria) চেনা:

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সাহাবীদের ওপর তাঁর সন্তুষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং তাঁদের ঈমানকে পরবর্তী মানবজাতির জন্য আদর্শ বা মানদণ্ড ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

"আর যদি তারা ঈমান আনে, যেভাবে তোমরা (সাহাবীরা) ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হেদায়েত পাবে।"

(সূরা বাকারা: ১৩৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।"

(সূরা তাওবা: ১০০)

সুতরাং, আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র হতে হলে সাহাবীদের ঈমানী মানদণ্ড ও জীবনপদ্ধতি কেমন ছিল, তা জানা এবং তা অনুসরণ করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য।

৪. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও সুন্নাহর অনুকরণ:

সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নিজের জান, মাল এবং পরিবারের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। রাসুল (সা.)-এর হাঁটা, চলা, কথা বলা, ইবাদত থেকে শুরু করে হাসিমুখে কথা বলার মতো ছোটখাটো সুন্নাতগুলোও তাঁরা নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতেন। সাহাবীদের জীবনী পড়লে নবীপ্রেমের আসল স্বরূপ এবং সুন্নাহর প্রতি পরম অনুরাগের বাস্তব শিক্ষা পাওয়া যায়।

৫. চারিত্রিক ও সামাজিক সংশোধন:

সাহাবীদের সমাজটি ছিল একটি "আদর্শ সমাজ"। ইসলামের ছোঁয়ায় জাহেলিয়াত বা অন্ধকারের যুগের মানুষগুলো কীভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন, তা সীরাত ও সাহাবীদের জীবনী থেকে জানা যায়।

- তাঁদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, আমানতদারী, ব্যবসার সততা, ইনসাফ, নম্রতা এবং অহংকারহীন জীবনযাপনের পদ্ধতি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের নৈতিক অবক্ষয় দূর করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. ভ্রান্ত মতবাদ ও বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা:

রাসুলুল্লাহ (সা.) ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছেন যে, শেষ জামানায় উম্মতের মধ্যে অনেক দল ও উপদলের সৃষ্টি হবে। তখন হেদায়েতের ওপর টিকে থাকার উপায় হিসেবে তিনি নিজের সুন্নাহর পাশাপাশি সাহাবীদের পথ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিখ্যাত হাদিস রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: "বনী ইসরাঈল (৭২) বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত (৭৩) **তিয়াত্তর দলে** বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! সেই মুক্তিকামী দল কোনটি? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: **আমি এবং আমার সাহাবাগণ আজ যে পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ যারা এই পথ অনুসরণ করবে)।**"

(সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৬৪১)

এই হাদিসের মূল শিক্ষা:

- **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত:** এই মুক্তিকামী দলটিকে ইসলামী পরিভাষায় "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত" বলা হয়। অর্থাৎ যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত এবং তাঁর সাহাবীদের সম্মিলিত পথ ও আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে।
- **বিভক্তির কারণ:** এই দলগুলোর বিভক্তি মূলত দ্বীনের মৌলিক আকিদা ও বিশ্বাসের বিচ্যুতির কারণে হবে, সাধারণ ছোটখাটো ফিকহী বা আমলী মতভেদের কারণে নয়।
- **আমাদের করণীয়:** যেকোনো ধরনের চরমপন্থা, নতুন উদ্ভাবিত ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদআত বর্জন করে পবিত্র কুরআন, সহীহ হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে অবিচল থাকা।

সুতরাং সাহাবীদের জীবন ইতিহাস কেবল কোনো অতীত কাহিনী নয়, এটি ইসলামের মূল ভিত্তির সাথে আমাদের জুড়ে রাখার অবিচ্ছেদ্য সেতু। বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কিতাব

(যেমন: *হায়াতুস সাহাবাহ, আসহাবে রাসুলের জীবনকথা* ইত্যাদি) থেকে সাহাবীদের জীবন চর্চা করা আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামীর বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ

■ বিবাহ পূর্ববর্তী হবু স্বামীর করনীয় দায়িত্ব সমূহ :

ইসলামী শরিয়ত এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের মাধ্যমে একটি নতুন ও পবিত্র বন্ধন তৈরি হয়। তবে এই বন্ধনটি সুন্দরভাবে শুরু করার জন্য বিয়ের পূর্বেই একজন হবু স্বামীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও প্রস্তুতি রয়েছে। এই প্রস্তুতিগুলো দাম্পত্য জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী ও সুখময় করতে ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

বিবাহের পূর্বে একজন হবু স্বামীর করণীয় দায়িত্বগুলোকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মানসিক প্রস্তুতি ও নিয়ত পরিশুদ্ধ করা:

মানসিক প্রস্তুতি:

বিয়ে মানবজীবনের একটি পবিত্র সম্পর্ক, যেখানে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের মেলবন্ধন ঘটে। ইসলামে বিয়ে কেবল সামাজিক প্রথা নয়, এটি নবীজি (সা.)-এর সুন্নত, ইবাদত ও দ্বীন রক্ষার অর্ধেক অংশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

‘বিয়ে আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।’

(ইবন মাজাহ ১৮৪৬)

বিয়ের আগে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়া মানে নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা, যাতে বিয়ে পরবর্তী সময়ে প্রশান্তি, ভালোবাসা ও দয়ায় ভরপুর থাকে জীবন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন—

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

‘তিনিই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।’

(সুরা আর-রূম: আয়াত ২১)

কুরআনের এই আয়াতে তিনটি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসলামী দাম্পত্য জীবনের মূল দর্শন। তাহলো—

> সাকিনা (প্রশান্তি),

> মাওয়াদ্দাহ (ভালোবাসা) এবং

> রহমাহ (দয়া)। এগুলো অর্জনের জন্যই বিয়ের আগে নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করা অপরিহার্য।

বিয়ের ব্যাপারে নবীজি (সা.) শুধু উৎসাহই দেননি, বরং প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়েছেন। বিয়ের আগে প্রত্যেক তরুণের থাকতে হবে আর্থিক, মানসিক ও আত্মিক প্রস্তুতি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

'হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিয়ে করে।' (বুখারি ৫০৬৫, মুসলিম ১৪০০)

বিয়ে মানে নতুন দায়িত্ব। একজন মুসলিম পুরুষ বা নারীকে বুঝতে হবে, এটি শুধু রোমান্টিক সম্পর্কই নয়, বরং একে অপরের জন্য হবে নিরাপদ আশ্রয়। বিয়ের পর মানসিকভাবে দায়িত্ব নিতে না পারলে, ভালোবাসা থাকলেও সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন-

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

'পুরুষগণ নারীদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল।'

(সুরা আন-নিসা: আয়াত ৩৪)

জীবনের প্রতিটি সম্পর্কেই মতবিরোধ আসে। তাই বিয়ের আগে ধৈর্য ও ক্ষমার গুণ অর্জন করা উচিত। কারণ মানুষ নিখুঁত নয়; ধৈর্যই সম্পর্কের রক্ষাকবচ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিন যেন তার স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো দোষ অপছন্দ হয়, তবে অন্য গুণ নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।'

(মুসলিম ১৪৬৯)

আজকের সমাজে বাহ্যিক সৌন্দর্য বা অর্থ-সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু ইসলাম বলেছে— প্রকৃত সৌন্দর্য হলো চরিত্র ও তাকওয়া। সুন্দর চরিত্র ও তাকওয়াই সংসারকে জান্নাতমুখী করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন-

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

'যখন এমন কেউ প্রস্তাব দেয় যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদের পছন্দ হয়, তাহলে তাকে বিয়ে কর।

(তিরমিজি ১০৮৪)

বিয়ের আগে নিজের মতামত প্রকাশ ও অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ভালো যোগাযোগ পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়া তৈরি করে, যা দাম্পত্য জীবনের প্রাণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

'তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করো।'

(সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১৫৯)

বিয়ে কেবল মানুষের সিদ্ধান্ত নয়, এটি তাকদিরের অংশ। তাই বিয়ের আগে ও পরে আল্লাহর ওপর ভরসা করা ও দোয়া করা অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

'মুমিনদের উচিত আল্লাহর ওপরই ভরসা করা।'

(সুরা আল-ইমরান: আয়াত ১২২)

তাই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সর্বোত্তম দোয়া হলো—

اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي وَلَا تُخَيِّرْ عَلَيَّ

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনি পছন্দ করুন, আমাকে নিজের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেবেন না।'

বিয়ে সফল হয় তখনই, যখন উভয়েই একে অপরের জন্য দয়া, প্রশান্তি ও নিরাপত্তার উৎস হয়। পরস্পর জান্নাতমুখী সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যায়। এক অপরের জন্য হয়ে যায় একাকার।

যেমনটি আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তোমরা একে অপরের জন্য পোশাকস্বরূপ।'
(সুরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৭)

পোশাক যেমন দেহকে আবৃত করে ও সুরক্ষা দেয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ ঢেকে রাখে, মানসিক আশ্রয় দেয় এবং আল্লাহর রহমতের ছায়া বেড়ে ওঠে। এই হলো ইসলামী বিবাহের প্রকৃত সৌন্দর্য।

নিয়ত পরিশুদ্ধ করা (إخلاص النية):
ইসলামে যেকোনো কাজের গ্রহণযোগ্যতা ও সওয়াব নির্ভর করে নিয়তের ওপর। লোকদেখানো বা কেবল সামাজিক প্রথা পূরণের জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়তকে খাঁটি করাই হলো পরিশুদ্ধি।
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইখলাস বা নিয়ত খাঁটি করার ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিয়েছেন:
"তাদেরকে এ ছাড়া কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে"।
(সূরা আল-বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৫)
বিয়ে এবং সংসার জীবনের ক্ষেত্রেও নিয়ত হতে হবে আল্লাহর ইবাদতের অংশ।
সূরা রুম-এ আল্লাহ বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন:
"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন"।
(সূরা আর-রুম, আয়াত: ২১)

ইসলামী শরিয়তের সবচেয়ে বিখ্যাত হাদিসটি নিয়ত সম্পর্কিত। আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সেটাই পাবে, যা সে নিয়ত করবে"।

(সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ১)

বিবাহের পূর্বে রূপ, যৌবন বা অর্থ-সম্পদের চিন্তার চেয়ে নিজের মনোজগতকে আল্লাহর বিধানের অনুগত করা এবং একটি মানুষের সব দায়িত্ব নেওয়ার জন্য মনকে শক্ত ও উদার করাই হলো প্রকৃত দ্বীনি প্রস্তুতি।

অতএব, হবু স্বামীর নিয়ত হতে হবে—আমি আল্লাহর এই নিদর্শনকে সম্মান জানাতে, নিজের চরিত্র রক্ষা করতে এবং একটি শান্তিময় দ্বীনি পরিবার গঠন করতে বিয়ে করছি।

■ ঈমানদার ও উত্তম স্ত্রী নির্বাচন করা :

পরিবারের কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ঈমানদার নারীকে বিবাহ করা যরূরী। মুমিনা সতি-সাধ্বী নারী স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সাথে সাথে দ্বীনী কাজে সহায়তা করে। এজন্য মুমিনা নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সে কুৎসিৎ অসুন্দরও হয়।

আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন নারীর চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।

(মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয়

আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবজাতির জন্য স্বীয় আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে'

(বাক্বারাহ ২/২২১)।

নারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (স:) বলেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأربع لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ،

'নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে (১) তার সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) তার দ্বীনদারির কারণে। এর মধ্যে তুমি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তুমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে'।

(বুখারী হা/৫০৯০; 'বিবাহ' অধ্যায়।)

অন্যত্র রাসূল(স:) বলেছেন,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الْأَرْض وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ

'তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধার্মিকতা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহ'লে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে'। সুতরাং দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করতে হবে"।

(তিরমিযী হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; ইরওয়া হা/১৮৬৮, ছহীহাহ হা/১০২২, সনদ হাসান।)

আর মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত।

রাসূল (স:) বলেছেন,

احْرِصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِالله

'তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর'।
(মুসলিম হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ হা/৭৯; মিশকাত হা/৫২৯৮।)

উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য:

মুমিনা হওয়ার পরও নারীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল_

ক. সতী-সাধ্বী, অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী:
সেই উত্তম নারী যে সতী-সাধ্বী ও অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী।
আল্লাহ বলেন, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه ُ
অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে'
(নিসা ৪/৩৪)।
আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরটি স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ তথা সে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মেনে চলে, তাঁর ইবাদত নিয়মিত আদায় করে এবং দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলি পালনে অলসতা করে না। এসবই আল্লাহর অনুগত হওয়ার পরিচায়ক। স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ তথা স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় করে এবং তার সন্তানাদি ও সম্পদ হেফাযত করে। আর নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

রাসূলুল্লাহ (স:)) বলেছেন, ، إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَت ْ

যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'।'

(সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩; সহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩১, ২৪১১: মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ সহীহ।)

নারীর লজ্জাস্থান হেফাযত করা তার সবচেয়ে বড়গুণ। কারণ এর দ্বারা বিপর্যয়-বিশৃংখলার পথ বন্ধ হয়। আর এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবেশ করে এবং পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হেফাযত নারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। তাই যে নারী তার নিজের কল্যাণ কামনা করে সে যেন নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীয় কথা-কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাছিলের চেষ্টা করে। সেই স্বামীর অনুগত থাকবে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে ও স্বামীর হক আদায়ে সদা তৎপর থাকবে।

খ. দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী:

মুমিন নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। নেকীর কাজে উৎসাহিত করবে এবং পাপের কাজে বাধা দিবে; এটাই হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান'

(সূরা তাওবা ৭১)।

মুমিনা নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিহিত করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ. لَوْ عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَنَتَّخِذَهُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ.

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

'যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করে না তাদেরকে পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও"।
সূরা তাওবা ৩৪ নাম্বার আয়াত নাযিলের সময় আমরা নবী করীম (স:)-এর সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন ছাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম"।

(ইবনে মাজাহ হা/১৮৫৬; ছহীহাহ হা/২১৭৬।)

তখন রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন,
উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল (আল্লাহ তা'আলার) যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।

لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ
তোমাদের লোকেরা যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী'।

(তিরমিযী হা/৩০৯৪; মিশকাত হা/২২৭৭, সনদ ছহীহ।)

গ. প্রেম-ভালবাসা বিনিময়কারিণী:
স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকা পরিবারে শান্তি বজায় থাকার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী হওয়া যরূরী। এতে অন্য নারীর প্রতি

স্বামীর মনে কখনো কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না এবং তার বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। আর এ ধরনের নারীর জন্যই জান্নাত রয়েছে।
রাসূল (স:) বলেছেন,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُودُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى-

'তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও স্বামীর নিকটে বারবার আগমনকারিণী। স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।
هذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى 'এই আমার হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখছি, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখ মুদিত করব না'।" অর্থাৎ আমি ঘুমাব না, আরাম-আয়েশ করব না।

(ছহীহুল জামে' হা/২৬০৪; ছহীহাহ হা/২৮৭।)

ঘ. স্বামীকে মুগ্ধকারিণী:

উত্তম স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজের প্রতি স্বামীকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেটা কয়েকভাবে হতে পারে। নিজের আকার-আকৃতিকে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর করা। স্বামীর সামনে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেই সাথে স্বামী যে ধরনের পোশাক পসন্দ করে সেগুলো পরিধান করা কেবল স্বামীর নযর কাড়ার জন্য। আচার-ব্যবহারে সর্বদা খোশ মেজাযী ও হাসি-খুশী থাকা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করে নেওয়া। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার অনুগত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করা।

ঐসব বিষয়ে হাদীছে এসেছে, রাসূল (স:)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَه.

উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না'।অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপসন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না।

(ছহীহাহ হা/৩৩৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪১।)

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْه তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে"।
(নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২২৭; ছহীহাহ হা/১৮৩৮।)

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সব কিছুই হবে স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে নারী স্বামীর জন্য নিজেকে মোহনীয় ও সুসজ্জিত করে না। বরং সে নিজেকে সুশোভিত করে কেবল বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য বা কোন পার্টি ও উৎসবে অংশগ্রহণ কিংবা কোন বিশেষ কারো বাড়ীতে গমনের জন্য।
পক্ষান্তরে স্বামীর কাছে যখন থাকে তখন অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে থাকে, চুল থাকে এলোমেলো ও অপরিপাটি, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য খারাপ গুণ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফলে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে।

ঙ. বিপদাপদে সান্ত্বনা দানকারিণী:
মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও অসুখ-বিসুখে অনেক সময় মুষড়ে পড়ে। এসময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপদে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা।
রাসূল (স:)) আরো বলেন,

خَيْرٌ نِسَائِكُمُ الوَلُوْدُ الوَدُوْدُ الْمُوَاسِيَةُ الْمُوَاتِيَةُ إِذَا أَتَّقِينَ الله

'তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হ'ল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, সান্ত্বনাদানকারিণী ও (স্বামীর) অনুগতা যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে'।

(আবুদাউদ হা/১৬৬৪; মিশকাত হা/১৭৮১; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।)

এক্ষেত্রে প্রথম অহী নাযিলের প্রাক্কালে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (স:)-কে প্রদত্ত সান্ত্বনাবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুকরণীয়।
(বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা; ছহীহুল জামে' হা/৩৩৩০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।)

অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম (রাঃ) কর্তৃক তার স্বামীকে প্রদত্ত সান্ত্বনার শিক্ষণীয় ঘটনাটি স্মর্তব্য।
ঘটনাটি হ'ল এরূপ- তাদের একটি ছেলে মারা গেল। উম্মু সুলাইম পরিবারের সদস্যদের বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত তাকে সন্তান মৃত্যুর কথা কেউ বলবে না। আবু তালহা আসলে তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। তিনি পানাহার করলেন। এরপর সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করলেন। স্বামী আবু ত্বালহা পরিতৃপ্ত হ'লে তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত ফেরত নিয়ে নেয়, তাহ'লে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন? তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আপনার আছে কি? আবু তালহা উত্তর দিলেন, না। উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ছেলেকে সেই আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য বিবেচনা করুন।
(বুখারী হা/৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১।)

এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (স:) بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا .. রাতের মিলনে বরকত দান করুন'। এরপর উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

(বুখারী হা/৫৪৭০; মুসলিম হা/২১৪৪ (১০৭), 'আবু তালহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।)

চ. স্বামীর চাহিদা পূরণকারিণী:

গুণবতী স্ত্রী সদা স্বামীর সেবা-যত্ন ও তার সার্বিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور -উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন তার নিকট আসে, যদিও সে চুলার উপর রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে'।
(তিরমিযী হা/১১৬০; মিশকাত হা/৩২৫৭; ছহীহাহ হা/১২০২।)

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْتُجِبْ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب
'যখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ডাকে সে যেন তার ডাকে সাড়া দেয় যদিও সে উটের গদির উপরে থাকে'।
(মুসনাদুল বায্যার; ছহীহাহ হা/১২০৩।)

উপরের হাদীছে চুলায় রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যদিও কিছু সম্পদ বিনষ্ট করে হয়। পরের হাদীছে উটের উপরে থাকলেও স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে তাকে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখা।
(মিরকাত, ৫/২১২৬ পৃঃ।)

ছ. স্বামীর অধিকার পূরণে অগ্রগামী:

উত্তম নারী হচ্ছে যে স্বামীর অধিকার আদায়ে কমতি করে না বরং তার খেদমতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। উম্মুল হুছাইন বিন মিহছান তার ফুফু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার কোন প্রয়োজনে রাসূল (স:)-এর দরবারে গমন করেন। তার প্রয়োজন শেষ হ'লে রাসূল (স:) বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (স:) বললেন, তুমি তার (স্বামীর) জন্য কেমন? তিনি বললেন, আমি অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তার সেবা করি।
রাসূল (স:) বললেন, انظرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُك-
'লক্ষ্য কর, তার থেকে তুমি কোথায় (তার হক্ব আদায়ের ক্ষেত্রে)? কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।

(মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৩৯২; ছহীহুল জামে' হা/১৫০৯; ছহীহাহ হা/২৬১২।)

জ. খরচের ক্ষেত্রে স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া:

জীবন যাত্রার মান সবার সমান নয়। অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সুতরাং স্বামীকে ভরণ-পোষণের ব্যাপারে কষ্টে নিপতিত করা আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য নয়। বরং তার আয় বুঝে ব্যয় করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রী কখনোই বিলাসী, অপব্যয়ী ও সম্পদ বিনষ্টকারিনী হবে না। বরং মিতব্যয়ী হওয়া তার জন্য অবশ্য কর্তব্য।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ

قوامًا، 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে'

(সূরা ফুরক্বান, ৬৭)।

রাসূল (স:) বলেন,

كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ مُغْلَقٍ مُطْبَقٍ ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ فَمَرَّتْ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوْهَا فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا

'বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা দীর্ঘকায় দু'জন মহিলার সাথে চলাফেরা করত। অতঃপর সে কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। তা হ'ল সুগন্ধিগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। পরে সে ঐ মহিলাদ্বয়ের মধ্যে চলতে লাগল এবং লোকেরা তাকে চিনতে পারল না। তখন সে তার হাত দিয়ে (ইশারা করে) এভাবে বলল'।

(মুসলিম হা/২২৫২; নাসাঈ হা/৫১৩৬।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أَنَّ أَوَّلَ مَا هَلَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّ امْرَأَةَ الْفَقِيْرِ كَانَتْ تُكَلِّفُهُ مِنَ الثِّيَابِ أَوِ الصبغ، أَوْ قَالَ: مِنَ الصِّيغَةِ مَا تُكَلِّفُ امْرَأَةُ الْغَنِيَّ، فَذَكَرَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، وَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ

مِنْ خَشَبٍ وَخَاتَمًا لَهُ غَلَقٌ وَطَبَقٌ، وَحَشَتْهُ مِسْكًا، وَخَرَجَتْ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ أَوْ حَسِيْمَتَيْنِ، فَبَعَثُوا إِنْسَانًا يَتَّبِعُهُمْ فَعَرَفَ الطَّوِيلَتَيْنِ، وَلَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَةَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ

'বানী ইসরাঈলের প্রথমে যে ধ্বংস হয় সে ছিল এক দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী। সে তাকে পোষাকে বা অলংকারে বাড়তি খরচ করাতো। অথবা তিনি বলেন, অলংকারে। যেরূপ ধনীর স্ত্রী বাড়াবাড়ি করে। অতঃপর তিনি উল্লেখ করেন যে, বানী ইসরাঈলের এক খাটো মহিলা কাঠের দু'টি পা তৈরী করে নিল এবং সোনা দিয়ে একটি বড় আংটি প্রস্তুত করে তাতে মিশক ভরে দিল। আর সে দীর্ঘকায় বা মোটা দুই মহিলার সাথে বের হ'ল। লোকেরা তাদের পিছু নেওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠাল। সে দীর্ঘদেহী মহিলাদ্বয়কে চিনতে পারল কিন্তু কাঠের পা ওয়ালী মহিলাকে চিনতে পারল না'।
(আহমাদ, ছহীহাহ হা/৫৯১।)

ঝ. নিয়া'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপন করা:

আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতের শুকরিয়া আদায় করা উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য। তদ্রূপ স্বামীর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে যে নে'মত দান করেছেন তারও সে শুকরিয়া আদায় করে। রাসূল (স:) বলেন,

لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاس

যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না'।

(আবুদাউদ হা/৪৮১১; তিরমিযী হা/১৯৫৪; মিশকাত হা/৩০২৫; ছহীহাহ হা/৪১৭।)

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَط

-

'আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখলাম), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী। (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারা কি আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় এবং তার অনুগ্রহকে

অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, আমি কখনও তোমার নিকট হ'তে ভালো ব্যবহার পাইনি'।
(বুখারী হা/২৯; মুসলিম হা/৯০।)

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মসজিদের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একদল মহিলা তথায় বসা ছিলেন। তিনি হাতের ইশারায় তাদেরকে সালাম দেয়ার পর বলেন,

إِيَّا كُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعِمِينَ. فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا كُفْرُ الْمُنَعِمِينَ؟ قَالَ لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ تَطُولُ أَيْمَتُهَا مِنْ أَبَوَيْهَا ثُمَّ يَرْزُقُهَا مِنْهُ وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ فَتَكْفُرُ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ.

'তোমরা নে'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা থেকে সাবধান হও। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নিয়া'মতপ্রাপ্তদের অকৃতজ্ঞতা কি? তিনি বললেন, হয়তো তোমাদের কোন নারী পিতা-মাতার নিকট দীর্ঘদিন থাকে। অর্থাৎ দেরীতে বিবাহ হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে স্বামী ও তার সন্তান দান করেন। অতঃপর সে অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং নে'মত অস্বীকার করে বলে, আমি কখনো তোমার থেকে কোন ভালো ব্যবহার পাইনি'।
(আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ হা/১০৪৮; ছহীহাহ হা/৮২৩।)

পরকালে এ ধরনের নারীর পরিণতি হবে ভয়াবহ।

রাসূল (স:) বলেন,

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى في امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْه-

আল্লহ তার দিকে তাকাবেন না যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না অথচ স্বামীকে ছাড়া তার চলে না'।
(হাকেম, ছহীহাহ হা/২৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৪৪।)

ঞ. স্বামীকে সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া:
স্বামীকে যথাযথ সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য।

রাসূল (স:) বলেন,

لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করতে আদেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য আদেশ করতাম'।
(আবুদাউদ হা/২১৪০; তিরমিযী হা/১১৫৯; মিশকাত হা/৩২৫৫, 'বিবাহ' অধ্যায়।)

কিন্তু অনেক মহিলা বিভিন্নভাবে স্বামীকে কষ্ট দেয়। যা উচিত নয়। এর জন্য জান্নাতের হুররা তার জন্য বদদো'আ করে।
রাসূল (স:) বলেন,

لا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكَ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

'যখন কোন নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী!) তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে আগন্তুক। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন'।
(তিরমিযী হা/১১৭৪; ইবনু মাজাহ হা/২০১৪: মিশকাত হা/৩২৫৮।)

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কাছে আল্লাহ্ হক হ'ল মানুষ কেবল তাঁর ইবাদত করবে ও তাঁর বিধান মেনে চলবে। নারীর জন্য বিশেষ নির্দেশ হ'ল সে আল্লাহ্ হকের পাশাপাশি স্বামীর হকও আদায় করবে। স্বামীর হক আদায় করলেই আল্লাহ্র হক আদায় হয়।
রাসূল (স:) বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ.

'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, স্ত্রী ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর হক্ব আদায় করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্বামীর হকু আদায় না করবে। স্ত্রী উটের গদির উপর থাকা অবস্থায়ও তার সাথে যদি স্বামী সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবুও স্ত্রী তাকে বাধা দিবে না'।
(ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; আদাবুয যিফাফ ২৮৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।)

ট. বাড়ীতে অবস্থান করা:
মহিলাদের কাজ হ'ল বাড়ীতে। তাই বাড়ীর অভ্যন্তরে থাকাই তার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى

'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করো না
' (সূরা আহযাব, ৩৩)।

আর বাড়ীর বাইরে গেলে শয়তান তাকে বেপর্দা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। রাসূল (স:) বলেছেন,ُالْمَرْأَةُ عَوْرَةُ فَإِذَا خَرَجَتْ إِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان

'নারী হচ্ছে গোপন বস্তু। যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (সৌন্দর্য প্রকাশে) উদ্বুদ্ধ করে'।
(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১০৯।)

তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে বাইরে যাওয়া যাবে। রাসূল (স:) বলেন, ، إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُن
'আল্লাহ প্রয়োজনে তোমাদেরকে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছেন'।
(বুখারী হা/৪৭৯৫; মুসলিম হা/২১৭০।)

ঠ. স্বামীর গোপনীয় বিষয় ও উভয়ের মধ্যবর্তী বিশেষ কাজ প্রকাশ না করা:

স্বামী-স্ত্রীরমাঝে সংঘটিত কার্যাবলী গোপনীয় বিষয়। তা প্রকাশ করা নির্লজ্জতা। আর একাজের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। রাসূল (স:) বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا-

'কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র নিকট মর্যাদায় সর্বনিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি, যে স্ত্রীর সাথে যৌন সম্ভোগ করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে'।

(মুসলিম হা/১৪৩৭; মিশকাত হা/৩১৯০।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

لَعَلَّ رَجُلاً يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا. فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِلى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ. قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُون.َ

'হয়তো পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে কৃত কর্মকাণ্ড প্রকাশ করে এবং স্ত্রীও স্বামীর সাথে সংঘটিত কর্ম প্রকাশ করে দেয়। লোকেরা নীরব-নিশ্চুপ থাকল। আমি

বললাম, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল, নিশ্চয়ই নারী-পুরুষরা এসব করে। তিনি বললেন, তোমরা এরূপ কর না। কেননা এরূপ কর্ম হচ্ছে শয়তানের কর্মকাণ্ডের ন্যায়। এটা এমন যেন এক শয়তান পুরুষ শয়তান নারীকে রাস্তার ওপর জড়িয়ে ধরে আর মানুষ তা দেখতে থাকে'।

(আহমাদ, ইরওয়া ৭/৭৪; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭১, সনদ হাসান)

ড. সন্তানের প্রতি স্নেহশীলা:

সন্তানের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহময়ী নারীকে মহানবী (ছাঃ) উত্তম নারী হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرٌ نِسَاء رَكِينَ الإبلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِه.ِ নারীরা উটে আরোহণকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম।

এরা শিশু সন্তানের উপর অধিক স্নেহশীলা হয়ে থাকে আর স্বামীর সম্পদের প্রতি খুব যত্নবান হয়ে থাকে'।
(বুখারী হা/৩৪৩৪, ৫০৮২, ৫৩৬৫; মুসলিম ৪৪/৪৯ হা/২৫২৭; মিশকাত হা/৩০৮৪।)

ঢ. লজ্জাশীলা:

লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।
(বুখারী হা/২৪, ৬১১৮; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৭০।)

সুতরাং উত্তম নারীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীলা হওয়া। পক্ষান্তরে যার লজ্জা নেই সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।
(বুখারী হা/৩৪৮৪, ৬১২০; মিশকাত হা/৫০৭২।)

এতদ্ব্যতীত মনে-প্রাণে স্বামীর উপদেশ শ্রবণ করা ও মান্য করা, স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করা ও উচ্চ শব্দে কথা না বলা, বরং কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা, বাকবিতণ্ডা না করা, স্বামীর পিতামাতা ও ভাই-বোনদের প্রতি ইহসান করা ইত্যাদি উত্তম ও গুণবতী নারীদের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত।

নিন্দিত নারী:

মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন।
(সূরা ইসরা, ৭০)।

কিন্তু তাদের বিভিন্ন স্বভাব-প্রকৃতির কারণে কেউ হয় নন্দিত, কেউ হয় নিন্দিত। আমাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যারাও তাদের কিছু অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের কারণে সমাজে নিগৃহীত ও নিন্দিত হয়। পরিবার ও সমাজে তাদের নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘটে যায় বহু বিপর্যয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা।

ঐসব নিন্দিত নারী থেকে রাসূল (স:) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এভাবে-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ، وَمِنْ زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيْبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ رِبًا، وَمِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ عَذَابًا، وَمِنْ خَلِيْلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ تَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا-

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে; এমন স্ত্রী থেকে যে বার্ধক্য আসার পূর্বেই আমাকে বৃদ্ধ করে দেয়; এমন পুত্র সন্তান থেকে যে আমার উপর মাতব্বরি করে; এমন সম্পদ থেকে যা আমার আযাবের কারণ হয় এবং এমন ধোঁকাবাজ বন্ধু থেকে যার চোখ আমাকে দেখে আর তার অন্তর আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি সে ভাল কিছু দেখে, তাহ'লে তা গোপন করে। আর মন্দ কিছু দেখলে তা প্রচার করে'।
(তাবারানী, ছহীহাহ হা/৩১৩৭।)

এখানে নিন্দনীয় নারীদের কিছু দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা হ'ল-

ক. স্বামীর অবাধ্যতা করা:
স্ত্রী স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন স্ত্রী স্বামীর কথা শুনতে চায় না। স্বামীকে বাধ্য করে তার কথা মত চলতে। কখনো নিজের একরোখা মেজায ও গোঁড়ামির কারণে, কখনও নিজের আর্থিক সচ্ছলতার কারণে, কখনও পিতামাতার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক সচ্ছল অবস্থার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। যে কারণেই হোক না কেন স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হ'লে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

রাসূল (স:) বলেন,
اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةً عصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ-
'দুই ব্যক্তির ছালাত তাদের মাথা অতিক্রম করে না। ১. মনিবের নিকট থেকে পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. ঐ মহিলা যে তার স্বামীর অবাধ্যতা করে, যতক্ষণ না সে তার আনুগত্যে ফিরে আসে'।
(তাবারাণী, ছাগীর; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৮, ১৯৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৮।)

তবে এ আনুগত্য হবে শারঈ সীমারেখার মধ্যে।
কেননা স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।
(ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০।)

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কথামত চলতে গিয়ে বিভিন্ন পাপে জড়িয়ে পড়ে। শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হয়। আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক বিভিন্ন কাজ করে বসে, যা আদৌ ঠিক নয়। এভাবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করার পরিণতি ভয়াবহ।

রাসূল (স:) বলেন,,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচাতে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন'।

(তিরমিযী হা/২৪১৪; ছহীহাহ হা/২৩১১; ছহীহুহল জামে' হা/৬০৯৭।)

খ. স্বামীকে রাগান্বিত করা:

অনেক মহিলা স্বামীর অপসন্দনীয় কাজগুলি বেশী বেশী করে স্বামীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা তাকে রাগান্বিত করার জন্য। স্বামী তার প্রয়োজনীয় সবকিছু যথাযথভাবে প্রদান করলেও সে যেন খুশি হ'তেই চায় না। কোন কিছুর বিনিময়েই ঐসব মহিলা তাদের বদঅভ্যাস ত্যাগ করে না। বরং স্বামীকে রাগানো ও তাকে কষ্ট দেওয়াই যেন তার মূল কাজ। তার মাথায় যেন এ চিন্তাই সদা ঘুরপাক খেতে থাকে যে, কোন কাজ করলে স্বামী রেগে যাবে ও কষ্ট পাবে, সেটাই সে করে থাকে।

এসব নারীদের সম্পর্কে রাসূল বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

তিন ব্যাক্তির ছালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। অর্থাৎ কবুল হবে না।

(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২৯০)।

১. পলায়নকারী গোলাম যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। ২. এমন মহিলা, যে রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপরে রাগান্বিত থাকে। ৩. ঐ ইমাম, জনগণ যাকে অপসন্দ করে'।

(তিরমিযী হা/৩৬০; মিশকাত হা/১১২২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৪৮৭, সনদ হাসান।)

গ. বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া:

কোন কোন মহিলা স্বামীর দুরবস্থার কারণে বা পরপুরুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ায় স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করতে চায় না। ফলে সে স্বামীর কাছে তালাক চায়। অথচ কেবল শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মহিলা স্বামীর কাছে তালাক চাইতে পারে না। এরপরেও কোন মহিলা বিনা কারণে তালাক চাইলে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে। এ ধরনের মহিলাদের সম্পর্কে রাসূল (স:) বলেন,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ ِ

যে মহিলা বিনা কারণে তার স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধিও হারাম'।

(আবুদাউদ হা/২২২৬; তিরমিযী হা/১১৮৭; ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫; মিশকাত হা/৩২৭৯, সনদ ছহীহ।)

ঘ. বেপর্দা চলাফেরা করা:

পর্দা ইসলামে ফরয। ছালাত-ছিয়াম পালন না করলে যেমন আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে, তেমনি পর্দা পালন না করলেও আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে। কিন্তু বহু মহিলা পর্দা না মেনে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে। ফলে তারা ধর্ষণ-অপহরণ ও উত্যক্তকরণের শিকার হয়। এরপরও তারা পর্দা করে না।

এদের সম্পর্কে রাসূল (স:) বলেন,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْمَةِ الْبَحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا.

'দুই শ্রেণীর লোক জাহান্নামী, যাদেরকে এখনও আমি দেখিনি। ১. এমন সম্প্রদায় যাদের হাতে গরুর লেজের ন্যায় দীর্ঘ লাঠি থাকবে, যা দ্বারা তারা মানুষকে প্রহার করবে। ২. নগ্ন পোষাক পরিধানকারী নারী, যারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথা বক্র উঁচু কাঁধ বিশিষ্ট উটের ন্যায় হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এত এত দূর হ'তে পাওয়া যায়"।

(মুসলিম হা/২১২৮; মিশকত হা/৩৫২৪।)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক মাসের পথের দূরত্ব হ'তে পাওয়া যায়'। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তারা হচ্ছে ঐসব মহিলা যারা পর্দা করে না। বরং নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করে।
তাদের পরিণতি সম্পর্কে অন্যত্র রাসূল (স:) বলেন,

وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيَّلاتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الْغُرَابِ الأَعْصَمِ

'তোমাদের নারীদের মধ্যে নিকৃষ্ট হ'ল যারা পর্দাহীনা অহংকারিণী। আর তারা হ'ল মুনাফিক নারী। তাদের মধ্য হ'তে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না কেবল সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায় ব্যতীত' (অর্থাৎ অল্প সংখ্যক)।
(বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা হ/১৩৮৬০; ছহীহাহ হা/১৮৪৯।)

অনেক মহিলা স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়।
তাদের সম্পর্কে রাসূল (স:) বলেন, ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ ... وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَه،

(ধ্বংসে নিপতিত) তিন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস কর না।...আর ঐ নারী যার স্বামী অনুপস্থিত। কিন্তু সে (স্বামী) তার দুনিয়াবী ভোগ্য সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে প্রদান করে। অথচ সে (স্ত্রী) তার স্বামীর পরে (অনুপস্থিতিতে) বেপর্দায় চলে'।
(আহমাদ হা/২৩৯৮৮; ছহীহাহ হা/৫৪২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫৮।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ মহিলা, যে তার স্বামীর সাথে খেয়ানত করে।
(ছহীহ আত-তারগীব হা/১৮৮৭; তা'লীকাতুল হাসান হা/৪৫৪১।)

বর্তমানে আমাদের দেশের লোকেরা অন্যের বাড়ীতে স্বাভাবিকভাবেই ঢুকে পড়ে। কোন অনুমতির তোয়াক্কা করে না। অথচ সে বাড়ীতে মহিলারা কোন কোন সময় অপ্রস্তুত থাকে। অনেকে আবার অন্যের বাড়ীতে ঢুকে সে বাড়ীর মহিলাদের সাথে নিঃসংকোচে কথাবার্তা বলেও খোশগল্প করতে থাকে। মহিলারাও তাদেরকে এসবের সুযোগ দেয়। ইসলামে এসব নিষেধ।

আল্লাহ বলেন,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ-

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না। যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। সম্ভবতঃ তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে (তা মেনে চলার মাধ্যমে)'
(সূরা নূর, ২৭)।

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَان .

'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একত্রিত হ'লে তৃতীয় জন হবে শয়তান'। ৫৭
(তিরমিযী হা/১১৭১, ২১৬৫, সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬৩; মিশকাত হা/১৩১৮।)

বেগানা মহিলাদের সাথে খোশগল্প করা নিষেধ। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لحَدِيث-

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া না হ'লে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ কর না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজনশেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না'
(সূরা আহযাব,৫৩)।
রাসূলের ব্যাপারে বলা হ'লেও সকল মুসলমানের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য।

আবার সমাজে দেবর-ভাবির হাসি-তামাশা, অবাধ চলাফেরা যেন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে।
অথচ রাসূল (স:) এসব থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন।
উকুবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (স:) বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ، .قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْت ُ

তোমরা নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে সাবধান থাক। একজন আনছার ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! দেবর সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য'।

(বুখারী হা/৫২৩২; মুসলিম হা/২১৭২; মিশকাত হা/৩১০২ 'বিবাহ' অধ্যায়।)

প্রকৃত পর্দা:

আমাদের দেশের মানুষ প্রকৃত পর্দা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। তারা মনে করে কেবল বোরকা পরে বাইরে গেলেই পর্দা রক্ষা হয়ে যায় এবং বাড়ীর অভ্যন্তরে এর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সেটা প্রকৃত পর্দা নয়। বরং পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا َأَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن

'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যেটুকু স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার কাপড় স্বীয় বক্ষদেশের উপর রাখে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজ পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, নিজেদের বিশ্বস্ত নারী, অধিকারভুক্ত দাসী, কামনামুক্ত পুরুষ এবং শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অবহিত নয়, তারা ব্যতীত। আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। আর হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে ফিরে যাও যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার"।

(সূরা নূর, ৩১)।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমানে মহিলারা দেবর-ভাসুর, চাচাতো, মামাতো, খালাতো, ফুফাতো ভাই, বেয়াই, বোনাই সবার সাথে খোশ-গল্প, হাসি-তামাশায় মত্ত থাকে। তারা এটাকে কিছু মনে করে না। অথচ এসব পর্দার পরিপন্থী।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না'
(সূরা আহযাব,৩৩)।
আল্লাহ এ আয়াতে মহিলাদের বাড়ীর মধ্যে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজনে বাইরে যেতে হ'লে যথাযথ পর্দা পালন করেই যেতে হবে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ - مَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দেও, তারা যেন নিজেদেরকে চাদর দিয়ে আবৃত করে'
(সূরা আহযাব, ৫৯)।

এ নির্দেশ রাসূল (স:)-এর মাধ্যমে সকল মুমিন নারীদেরকে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার পোশাক:
ইসলামী শরিয়তে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দার বিধান রয়েছে, তবে পোশাকের ক্ষেত্রে উভয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। কুরআন এবং হাদিসের আলোকে পর্দার পোশাকের মূল শর্ত ও বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

নারীর ক্ষেত্রে পর্দার বৈশিষ্ট্য :
কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে মুসলিম নারীর ঘরের বাইরে বা বেগানা (পর) পুরুষের সামনে যাওয়ার পোশাকের জন্য প্রধানত ৮টি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে:

১.পুরো শরীর আবৃত করা:পোশাকটি যেন মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কব্জি ব্যতীত কোনো কোনো আলেমের মতে মুখমণ্ডলসহ) পুরো শরীর ঢেকে রাখে।

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের একাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়..." (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫৯)

২.পোশাকটি নিজেই যেন আকর্ষণীয় (জিনাত) না হয়:এমন জমকালো বা অতিরিক্ত কারুকার্যখচিত পোশাক পরা যাবে না, যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
.তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."(সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩১)

৩. মোটা ও অপ্রকাশ্য হওয়া:পোশাকটি এমন পাতলা হওয়া যাবে না যার ভেতর থেকে ভেতরের চামড়া বা শরীর দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) চাদর পাতলা হওয়ার কারণে এক সাহাবিকে তা পরিবর্তন করতে বলেছিলেন।

৪. ঢিলেঢালা হওয়া:পোশাকটি যেন শরীরের সাথে লেপ্টে না থাকে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন (যেমন: বক্ষদেশ, কোমর) ফুটিয়ে না তোলে।

৫. সুগন্ধিমুক্ত হওয়া: বাইরে বের হওয়ার সময় পোশাকে কোনো ধরনের সুগন্ধি বা পারফিউম ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যেকোনো নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো জনসমক্ষে বের হয় যেন তারা তার সুঘ্রাণ পায়, সে ব্যভিচারিণী।"(সুনানে নাসায়ী, আবু দাউদ)

৬. পুরুষদের পোশাকের সদৃশ না হওয়া: নারীদের এমন পোশাক পরা উচিত নয় যা সাধারণত পুরুষরা পরিধান করে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) ওইসব নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং ওইসব পুরুষদের যারা নারীদের বেশ ধারণ করে। (সহীহ বুখারী)

৭. অমুসলিমদের ধর্মীয় পোশাকের সদৃশ না হওয়া:কাফির বা অন্য ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় ও সংস্কৃতির প্রতীক এমন পোশাক পরিহার করা।

৮. অহংকার বা প্রসিদ্ধির পোশাক না হওয়া: সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বা মানুষের মাঝে নিজেকে জাহির বা অহংকার করার উদ্দেশ্যে কোনো অদ্ভুত পোশাক পরা যাবে না।

পোশাকের ক্ষেত্রে কুরআনের একটি মূল নীতি এই যে পোশাক কেবল শরীর ঢাকার মাধ্যমই নয়, বরং তা মানুষের তাকওয়া বা আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:
“হে বনী-আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং যা শোভাবর্ধক। আর তাকওয়ার যে পোশাক, সেটাই সর্বোত্তম।”(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৬)

ইসলামে পর্দার জন্য নির্দিষ্ট কোনো একটি পোশাকের মডেল (যেমন কেবল বোরকা বা জুব্বা) বাধ্যতামূলক করা হয়নি; বরং স্থান ও সংস্কৃতিভেদে পোশাক ভিন্ন হতে পারে। তবে শর্ত হলো, পোশাকটি যেন উপরোক্ত কুরআন ও হাদিসের মূল নীতিমালা ও শর্তসমূহপুরোপুরি পূরণ করে।

সাজসজ্জা ও সুগন্ধি মেখে বাহিরে যাওয়া পর্দার পরিপন্থী:
ইসলামী শরীয়াহর বিধান অনুযায়ী, একজন নারীর জন্য সুগন্ধি ও আকর্ষণীয় সাজসজ্জা করে পরপুরুষের সামনে বা বাড়ির বাইরে যাওয়া পর্দার বিধানের পরিপন্থী।
পর্দার মূল উদ্দেশ্য হলো শালীনতা বজায় রাখা এবং যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত আকর্ষণ বা ফিতনা থেকে নিজেকে ও সমাজকে হিফাযত করা। এই বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা–
সূরা আন-নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা নারীদের সাজসজ্জা প্রকাশের ব্যাপারে বলেন:
"তারা যেন তাদের সাধারণ প্রকাশ্য সাজসজ্জা ছাড়া অন্য কোনো সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."

একই আয়াতে আরও বলা হয়েছে, নারীরা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য বা অলঙ্কারের আওয়াজ পরপুরুষের কান পর্যন্ত পৌঁছায়। সুতরাং, বাইরে যাওয়ার সময় এমন কোনো বাহ্যিক সাজসজ্জা করা যাবে না যা পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

হাদীস শরীফের নিষেধাজ্ঞা–
সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।
দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপারে:রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"যেকোনো নারী সুগন্ধি মেখে কোনো জনসমাবেশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে—যেন তারা তার সুঘ্রাণ পায়, তবে সে একজন ব্যভিচারিণী।" (সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৫১২৯; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১৭৩)

ইবাদত কবুলের শর্ত:অন্য একটি হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, কোনো নারী যদি মসজিদের যাওয়ার জন্যও সুগন্ধি ব্যবহার করে, তবে যতক্ষণ না সে বাড়ি ফিরে সাধারণ গোসল (পবিত্রতা অর্জন) করছে, ততক্ষণ তার সালাত কবুল হয় না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪০০২)

সংক্ষেপে পর্দার মূলনীতি:
বাড়ির ভেতরে:একজন নারী তার স্বামী এবং মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে হারাম, যেমন: বাবা, ভাই, ছেলে) পুরুষদের সামনে সাধ্যমতো সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারেন। এতে কোনো বাধা নেই, বরং এটি প্রশংসনীয়।

বাড়ির বাইরে: বাইরে বের হওয়ার সময় ঢিলেঢালা, সাধারণ এবং জাঁকজমকহীন পোশাক (যেমন: বোরকা বা আবায়া) পরিধান করা উচিত, যা শরীরের গঠন প্রকাশ করে না। একই সাথে এমন কোনো সুগন্ধি বা মেকআপ ব্যবহার করা যাবে না যার ঘ্রাণ বা উজ্জ্বলতা অন্যের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণ করে।

অতএব, দ্বীনদার ও জ্ঞানান্বেষী (তালিবে ইলম) হিসেবে পর্দার এই হুকুমটি সঠিকভাবে জানা এবং তা মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ. অন্যের গৃহে স্বীয় বস্ত্র উন্মোচনকারিনী:

ইসলামী শরীয়াহ ও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যে নারী নিজের ঘর বা স্বামী-গৃহ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নিজের পোশাক বা অবয়ব উন্মুক্ত করে, তার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হাদীস শরীফে এই বৈশিষ্ট্যটিকে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং পর্দার বিধানের চরম লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই বিষয়ে যে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন,

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:

"যে নারী নিজের স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোনো স্থানে নিজের বস্ত্র খোলে (উন্মোচন করে), সে মূলত আল্লাহ এবং তার নিজের মধ্যকার লজ্জাশীলতার পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০১০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৫০)

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, সিরিয়ার কিছু নারী যখন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন, তখন তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা কি সেই অঞ্চলের নারী, যারা সাধারণ গোসলখানায় (পাবলিক বাথ বা হাম্মামখানায়) গিয়ে শরীর অনাবৃত করো?" এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি স্মরণ করিয়ে দেন।

ইসলাম কেন এই বিষয়ে এত কঠোর, তার পেছনে গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সুরক্ষার হিকমত (রহস্য) রয়েছে:

- **লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মানের হিফাযত:** নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য ও মর্যদা তার লজ্জাশীলতার মাঝে। নিজের ঘরের নিরাপদ পরিবেশ ছাড়া অন্য যেকোনো স্থানে শরীর উন্মুক্ত করলে হঠাত করেই কোনো পরপুরুষের দৃষ্টি পড়ার বা ফেতনার আশঙ্কা থাকে।
- **গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও আধুনিক যুগের ঝুঁকি:** বর্তমান যুগে সিসিটিভি ক্যামেরা, গোপন ক্যামেরা বা স্মার্টফোনের অপব্যবহারের কারণে যেকোনো সাধারণ ও অনিরাপদ স্থানে (যেমন: শপিং মলের চেঞ্জিং রুম, পার্লার বা অন্যের বাড়ি) পোশাক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নারীদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হাদীসের

এই বাণী মূলত নারীকে যেকোনো ধরনের অপবাদ ও ব্ল্যাকমেইলিং থেকে আগাম সুরক্ষা দেয়।

- **পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা:** একজন নারীর শারীরিক সৌন্দর্য ও প্রকাশ শুধুমাত্র তার স্বামীর গৃহের অভ্যন্তরেই সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও মার্জিত। অন্য কোথাও তা উন্মোচন করা এই বিশেষত্ব ও আমানতদারীর খেয়ানত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য (ব্যতিক্রমী অবস্থা):চিকিৎসা বা একান্ত কোনো বাধ্যবাধকতার (যেমন: অসুস্থতা, ডাক্তার দেখানো, বা জীবনের নিরাপত্তা) কারণে যদি নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য স্থানে অন্য কারো ঘরে বা হাসপাতালে পোশাক পরিবর্তন বা শরীর উন্মুক্ত করতে হয়, তবে তা এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে না। কারণ শরীয়তের নিয়ম হলো— *"প্রয়োজনীয়তা নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে।"* তবে তা যেন অবশ্যই ফিতনামুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশে হয়।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীদের মর্যাদা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই বিধানটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।

চ.অন্যকে স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দানকারিনী:

ইসলামী পারিবারিক বিধানে স্বামীর ঘরের আমানতদারী রক্ষা করা স্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা তার অনুমতি ছাড়া ঘরের ভেতরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়।

হাদীস শরীফে সেই নারীকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে, যে তার স্বামীর অপছন্দনীয় বা অনুমতিহীন কোনো ব্যক্তিকে স্বামীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বামীদের উদ্দেশ্যে নারীদের অধিকারের কথা বলার পাশাপাশি স্ত্রীদের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে এরশাদ করেছিলেন:

"তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো— তারা যেন তোমাদের বিছানায় (ঘরে) এমন কোনো ব্যক্তিকে স্থান না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা এমনটি করে, তবে তোমরা তাদেরকে মৃদু প্রহার করতে পারো (শাসন করতে পারো)।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১৮)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) উত্তম নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, স্বামী ঘরে না থাকলে সে নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর সম্পদের হিফাযত করে। আর সম্পদের হিফাযতের অন্যতম অংশ হলো ঘরের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ঘরকে একটি সুরক্ষিত দুর্গ হিসেবে দেখা হয়। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়ার পেছনে বেশ কিছু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে:

- **স্বামীর অধিকার ও আত্মসম্মান:** ঘরটির মালিক বা প্রধান অভিভাবক হিসেবে কার সাথে সম্পর্ক রাখা হবে আর কাকে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তা নির্ধারণ করার প্রাথমিক অধিকার স্বামীর রয়েছে। স্বামী যাকে অপছন্দ করেন বা যার দ্বারা ঘরের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করেন, তাকে ঘরে আনা দাম্পত্য কলহের অন্যতম প্রধান কারণ।
- **ফিতনা ও অপবাদ থেকে বাঁচা:** স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো পরপুরুষ বা অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষকে ঘরে প্রবেশ করালে সামাজিক অপবাদ, সন্দেহ এবং ফিতনার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এটি স্ত্রীর নিজের চরিত্র ও পবিত্রতাকেও প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।
- **পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা:** অনেক সময় এমন লোক ঘরে প্রবেশ করে যারা ঘরের ভেতরের পরিবেশ, আর্থিক অবস্থা বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বাইরে ছড়াতে পারে। তাই ঘরকে বাহ্যিক কুদৃষ্টি ও পরনিন্দা থেকে রক্ষা করতে এই সতর্কতা জরুরি।

এই বিধানটি সঠিকভাবে বোঝার জন্য এর কিছু প্রায়োগিক দিক জানা থাকা দরকার:

১. **স্পষ্ট অনুমতি (Explicit Permission):** স্বামী যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি বা আত্মীয়ের ব্যাপারে বলে যান যে, "অমুক আমার অনুপস্থিতিতে ঘরে আসতে পারবে না," তবে তাকে কোনোভাবেই অনুমতি দেওয়া যাবে না।

২. **ইঙ্গিত বা প্রচলিত নিয়ম (Customary Permission):** যেসব সাধারণ আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশীদের ব্যাপারে স্ত্রী নিশ্চিতভাবে জানেন যে তাদের আগমনে স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন না (যেমন: নিজের বাবা, ভাই বা বিশ্বস্ত নারী প্রতিবেশী), তাদের ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক মৌখিক অনুমতির প্রয়োজন নেই।

৩. **জরুরী অবস্থা (Emergency):** যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আগুন লাগা, চিকিৎসা বা আইনি কোনো জরুরী পরিস্থিতির তৈরি হয়, তবে জীবন ও সম্পদ রক্ষার খাতিরে যেকোনো কাউকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী আপদকালীন সময়ে এই নিষেধাজ্ঞা শিথিল থাকে।

পারিবারিক সুখ, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং দাম্পত্য জীবনের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য স্বামীর এই অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য।

ছ.ব্যাভিচারিণী:

ইসলামী শরীয়াহ, কুরআন এবং হাদীসের পরিভাষায় 'ব্যভিচারিণী' (আরবীতে: زَانِيَة - জানিয়াহ) বলতে এমন নারীকে বোঝানো হয়, যিনি শরীয়তসম্মত বৈধ বিয়ের বন্ধন ছাড়া কোনো পুরুষদের সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। ইসলামে ব্যভিচারকে (জিনা) অন্যতম কবিরা গুনাহ (মহাপাপ) এবং সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয় সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তবে আপনার পূর্বের প্রশ্নগুলোর ধারাবাহিকতায় এই শব্দটির একটি রূপক বা সতর্কতামূলক ব্যবহার হাদীসে এসেছে, যা জানা অত্যন্ত জরুরি।

১. প্রকৃত বা হাকীকী ব্যভিচার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারের কাছে যেতেও নিষেধ করেছেন, কারণ এটি কেবল একটি পাপই নয়, বরং এটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট পথ।

"তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।" *(সূরা আল-ইসরা: ৩২)*

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, চারজন ন্যায়পরায়ণ ও চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণ অথবা নিজের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে যদি ইসলামি আদালতে কারো ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তার জন্য দুনিয়াতে নির্দিষ্ট দণ্ডবিধির (হদ) বিধান রয়েছে।

২. হাদীসে 'রূপক' ব্যভিচারিণী (সতর্কবার্তা)

ইসলামে শুধু মূল অপরাধকেই হারাম করা হয়নি, বরং যে মাধ্যমগুলো মানুষকে সেই অপরাধের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কিছু আচরণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে 'ব্যভিচার' বা 'ব্যভিচারিণী' শব্দ দিয়ে সম্বোধন করেছেন, যাতে মানুষ এর ভয়াবহতা বুঝতে পারে।

- **সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া:** পূর্বের আলোচনায় উল্লিখিত হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কোনো নারী যদি সুগন্ধি মেখে পরপুরুষের দৃষ্টি বা মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বাইরে যায়, তবে সে (মানসিকভাবে বা রূপক অর্থে) একজন ব্যভিচারিণী। *(সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫১২৯)*

- **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জিনা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মানুষের চোখ, কান, হাত এবং পায়ের নিজস্ব 'জিনা' বা ব্যভিচার রয়েছে। "চোখের ব্যভিচার হলো (পরপুরুষ বা পরনারীর দিকে কুদৃষ্টিতে) তাকানো, কানের ব্যভিচার হলো (কামুক বা অশ্লীল) কথা শোনা, মুখের ব্যভিচার হলো (অন্যায়) কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো (অন্যায় উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা এবং পায়ের ব্যভিচার হলো (পাপের দিকে) হেঁটে যাওয়া..." *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭)*

"চোখের ব্যভিচার হলো (পরপুরুষ বা পরনারীর দিকে কুদৃষ্টিতে) তাকানো, কানের ব্যভিচার হলো (কামুক বা অশ্লীল) কথা শোনা, মুখের ব্যভিচার হলো (অন্যায়) কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো (অন্যায় উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা এবং পায়ের ব্যভিচার হলো (পাপের দিকে) হেঁটে যাওয়া..." *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৫৭)*

কোনো নারী সুগন্ধি মেখে বাইরে গেলেই তিনি আইনিভাবে বা বাস্তবে ব্যভিচার করে ফেলেছেন—এমনটি নয়। কিন্তু এই কঠোর শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো গুনাহের ভয়াবহতা বোঝানো এবং মানুষকে সতর্ক করা। কারণ, একজন নারীর সুগন্ধি বা আকর্ষণীয় সাজসজ্জা কোনো পরপুরুষের মনে কুচিন্তা বা লালসার জন্ম দিতে পারে, যা প্রকারান্তরে ব্যভিচারের প্রথম ধাপ হিসেবে কাজ করে। ইসলাম ফিতনার এই উৎসটিকে শুরুতেই বন্ধ করতে চায়।

ইসলাম মানুষকে কেবল পাপের ভয় দেখায় না, বরং সংশোধনের পথও দেখায়। কোনো মানুষ যদি অতীতে জেনে বা না জেনে এই ধরনের কোনো পাপে জড়িয়ে পড়েন, তবে খাঁটি মনে তাওবা (অনুতপ্ত হয়ে পাপ ছেড়ে দেওয়া এবং পুনরায় না করার প্রতিজ্ঞা) করলে মহান আল্লাহ তাআলা যেকোনো বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, *"নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরা বাকারা: ২২২)*

জ.পুরুষের বেশ ধারণকারিণী:

ইসলামী শরীয়াহ ও হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় যে নারী পুরুষদের পোশাক, চালচলন, বাচনভঙ্গি বা বাহ্যিক অবয়ব নকল করে, তাকে **'পুরুষের বেশ ধারণকারিণী'** (আরবীতে: **المُتَرَجِّلَات** - আল-মুতারা whirlwind বা পুরুষালী নারী) বলা হয়।

সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা পোশাক ও শালীনতার নীতি নির্ধারণ করেছেন। এই স্বাভাবিক প্রকৃতি (ফিতরাত) পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গের রূপ ধারণ করাকে ইসলামে চরম অন্যায় ও অভিশপ্ত কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বিপরীত লিঙ্গের বেশ ধারণকারীদের ওপর আল্লাহর লানত বা অভিশাপের কথা উল্লেখ করেছেন, যা এই গুনাহের ভয়াবহতা প্রমাণ করে।
সাধারণ বেশভূষার ক্ষেত্রে: আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) সেসব পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীর বেশ ধারণ করে এবং সেসব নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৮৫)*
পোশাকের ক্ষেত্রে: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ দিয়েছেন যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৯৮)*

নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষের বেশ ধারণ করার বিষয়টি কয়েকটি মাধ্যমে হতে পারে:

- **পোশাক ও অলঙ্কার:** পুরুষদের জন্য নির্ধারিত বা বিশেষভাবে পরিচিত পোশাক (যেমন: শার্ট, প্যান্ট বা এমন পোশাক যা পুরুষদের সংস্কৃতির অংশ) পরিধান করা।
- **চুল ও বাহ্যিক অবয়ব:** কোনো শরীয়তসম্মত কারণ বা রোগ ছাড়াই পুরুষদের মতো করে চুল ছোট করে ছাঁটা বা এমন অবয়ব তৈরি করা যা দূর থেকে পুরুষ বলে ভ্রম হয়।
- **আচরণ ও বাচনভঙ্গি:** কণ্ঠস্বর ইচ্ছাকৃতভাবে ভারী বা কর্কশ করা, পুরুষালী ভঙ্গিতে হাঁটাচলা করা বা সমাজে পুরুষদের মতো কর্তৃত্বপরায়ণ আচরণ প্রকাশ করা।

এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্নিহিত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক হিকমত

- **সৃষ্টির স্বাভাবিকতা (ফিতরাত) রক্ষা:** আল্লাহ তাআলা পুরুষকে দিয়েছেন সহজাত শক্তি ও নেতৃত্বসুলভ গুণ, আর নারীকে দিয়েছেন কোমলতা, মাতৃত্ব ও লাবণ্য। নারী যদি পুরুষের বেশ ধারণ করে, তবে সে তার নিজের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

- **সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষা:** পোশাক ও রূপের এই মিশ্রণ সমাজে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি তৈরি করে। এটি লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক দায়িত্ব ও পারিবারিক কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **লজ্জাশীলতার সুরক্ষা:** নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য তার শালীনতা ও নারীসুলভ আচরণের মাঝে। পুরুষের বেশ ধারণ করার মাধ্যমে পর্দার ও হিজাবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

বর্তমান সময়ে ফ্যাশন, করপোরেট সংস্কৃতি বা পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে অনেক সময় নারী ও পুরুষের পোশাকের মধ্যকার পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে (Unisex Clothing)। একজন মুসলিম নারী হিসেবে নিজের ধর্মীয় ও স্বাতন্ত্র্য পরিচয় বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

তবে ঘরোয়া পরিবেশে, যেখানে পর্দা লঙ্ঘনের ভয় নেই এবং পোশাকটি সম্পূর্ণ ঢিলেঢালা ও শালীন, সেখানে আরামদায়ক কোনো সাধারণ পোশাক পরা আর পুরুষদের অনুকরণ করার উদ্দেশ্যে তাদের মতো পোশাক পরার নিয়তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম মূলত **সাদৃশ্য গ্রহণ করার মানসিকতা ও প্রকৃতি পরিবর্তনকে** নিষিদ্ধ করেছে।

ঝ.পরচুলা ব্যাবহারকারিণী ও উল্কি কারিণী:

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী, সৌন্দর্যের নামে আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি আনা বা কৃত্রিম উপায়ে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে **পরচুলা ব্যবহারকারী** (চুলে কৃত্রিম চুল যোগ করা) এবং **উল্কি বা ট্যাটু অঙ্কনকারী** নারী ও পুরুষ উভয়ের ব্যাপারে হাদীস শরীফে সরাসরি লানত বা অভিশাপ এসেছে।

১. পরচুলা বা কৃত্রিম চুল ব্যবহারকারিণী (الوَاصِلَة - আল-ওয়াসিলাহ):

যে নারী নিজের চুলের সাথে অন্য কোনো মানুষের বা কৃত্রিম চুল যোগ করে অবয়ব বড় বা সুন্দর দেখাতে চায়, তাকে পরচুলা ব্যবহারকারিণী বলা হয়।

- **হাদীসের নিষেধাজ্ঞা:** উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "আল্লাহ তাআলা অভিশাপ দিয়েছেন সেই নারীর ওপর যে নিজের চুলের সাথে অন্য চুল জোড়া দেয় (পরচুলা লাগায়) এবং যে নারী অন্যকে জোড়া দিতে বলে।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৩৩; সহীহ মুসলিম)*

- **নিষেধাজ্ঞার কারণ (হিকমত):**
    - **প্রতারণা বা ধোঁকা:** চুলে কৃত্রিম চুল যোগ করার মাধ্যমে নিজের আসল রূপ আড়াল করে অন্যকে ধোঁকা দেওয়া হয় (বিশেষ করে বিয়ের ক্ষেত্রে)। হাদীসে এসেছে, এক আনসারী নারী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বললেন যে, তাঁর মেয়ের অসুখের কারণে মাথার চুল পড়ে গেছে, এখন তার বিয়ে উপলক্ষে চুলে অন্য চুল জোড়া দেওয়া যাবে কি না? রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে স্পষ্ট নিষেধ করেন এবং লানতের হাদীসটি শোনান।
    - **অহংকার:** এটি এক ধরণের কৃত্রিম আভিজাত্য বা অহংকার প্রকাশ করে।

ব্যতিক্রম: যদি কোনো রোগ, অগ্নিকাণ্ড বা দুর্ঘটনার কারণে মাথার চুল সম্পূর্ণ পড়ে যায়, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে বা ত্রুটি দূর করার জন্য (যেমন: হেয়ার ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা সম্পূর্ণ কৃত্রিম ক্যাপ) উলামায়ে কেরাম বিশেষ শর্তে অনুমতি দিয়েছেন। তবে সৌন্দর্যের আতিশয্য বা ফ্যাশনের জন্য মানুষের চুল জোড়া দেওয়া সম্পূর্ণ হারাম।

২. উল্কি বা ট্যাটু ধারণকারিণী (الوَاشِمَة - আল-ওয়াশিমাহ)

সুই বা কোনো তীক্ষ্ণ সূঁচ দিয়ে চামড়া খোদাই করে রক্ত বের করা এবং সেখানে নীল, কালো বা যেকোনো রঙ ঢুকিয়ে স্থায়ী নকশা তৈরি করাকে উল্কি বা ট্যাটু বলা হয়।

- **হাদীসের নিষেধাজ্ঞা:** আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক উল্কি বা ট্যাটু অংকনকারী নারীদের ওপর এবং যারা নিজেদের শরীরে উল্কি আঁকায়..." *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮৮৬)*
- **নিষেধাজ্ঞার কারণ (হিকমত):**
    - **আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি:** আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বাভাবিক ও সুন্দর অবয়ব দিয়ে তৈরি করেছেন, ট্যাটু করার মাধ্যমে তার স্থায়ী পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটানো হয়, যা শয়তানের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ ছিল (সূরা নিসা: ১১৯)।
    - **শারীরিক কষ্ট ও অপবিত্রতা:** এটি চামড়ার স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, তীব্র যন্ত্রণাদায়ক এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এর কারণে চর্মরোগ ও সংক্রমণের ঝুঁকি প্রমাণিত।

ইবাদতের ওপর প্রভাব: স্থায়ী ট্যাটু বা উল্কি আঁকলে ত্বকের ওপর একটি স্থায়ী স্তর বা কালির দাগ পড়ে যায়, যা চামড়ার ভেতরে প্রবেশ করে। তবে সাধারণ মেহেদি বা আলতা, যা সাময়িক এবং চামড়ার ওপর কোনো কৃত্রিম আবরণ তৈরি করে না, তা নারীদের জন্য সম্পূর্ণ বৈধ এবং প্রশংসনীয় সাজসজ্জা।

ইসলাম নারীদেরকে তাদের স্বামী ও মাহরামদের সামনে সাজসজ্জা করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও উৎসাহ দিয়েছে। কিন্তু সেই সাজসজ্জা যেন **আল্লাহর সৃষ্টিতে স্থায়ী বিকৃতি** না ঘটায় এবং তার মধ্যে কোনো **প্রতারণা বা ধোঁকা** না থাকে। এই দুটি বিষয়ই মূলত কৃত্রিমতা ও অবাধ্যতার শামিল, যা একজন মুমিনের তাকওয়ার পরিপন্থী।

ঞ.গানবাজনায় অভ্যস্ত নারী:

ইসলামী শরীয়াহ, আখলাক (চরিত্র) এবং পারিবারিক কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে গানবাজনা, বাদ্যযন্ত্র এবং অবিনোদনমূলক সঙ্গীতচর্চায় আসক্ত বা অভ্যস্ত নারীকে অত্যন্ত নিন্দনীয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইসলামে গানবাজনার অনৈতিক চর্চাকে আত্মিক ব্যাধি এবং ঈমানের পরিপন্থী একটি কাজ হিসেবে দেখা হয়।

কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাসের আলোকে গানবাজনায় অভ্যস্ত নারীদের ব্যাপারে যে সামাজিক ও ধর্মীয় নির্দেশনা এসেছে, তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. পবিত্র কুরআনের পরোক্ষ ইশারা

সূরা লুকমানের ৬ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য 'লাহওয়াল হাদীস' (অসার কথাবার্তা/বিনোদন) ক্রয় করে..."

অধিকাংশ মুফাসসিরীন (যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রা.) কসম খেয়ে বলেছেন যে, এখানে 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে গানবাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

২. হাদীস শরীফের কড়া হুঁশিয়ারি

রাসূলুল্লাহ (সা.) কেয়ামতের কিছু আলামত বা লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে গানবাজনা এবং গায়িকা নারীদের প্রাচুর্যকে ফিতনা ও আযাবের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের বিস্তার: রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল আসবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে..." *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০)*

"অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু দল আসবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে..." *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৯০)*

কেয়ামতের আলামত হিসেবে গায়িকা নারী: অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: "যখন গায়িকা নারী (নর্তকী) এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে এবং মদপান করা হবে, তখন তোমরা রক্তিম বাতাস, ভূমিকম্প এবং মানুষের রূপ বিকৃতির (ভূমিধস) অপেক্ষা করো।" *(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২১১)*
"যখন গায়িকা নারী (নর্তকী) এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ব্যাপকভাবে বেড়ে যাবে এবং মদপান করা হবে, তখন তোমরা রক্তিম বাতাস, ভূমিকম্প এবং মানুষের রূপ বিকৃতির (ভূমিধস) অপেক্ষা করো।" *(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২২১১)*

৩. প্রাচীন আরবে 'গায়িকা নারী' বা কাইনা (القَيْنَة)-র ধারণা

ইসলামের আগমনী যুগে এবং জাহেলী সমাজে 'কাইনা' বা দাসী গায়িকাদের একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল। এদের কাজ ছিল ধনীদের মদ ও জুয়ার আসরে গান গেয়ে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে পুরুষদের আমোদপ্রমোদ জোগানো। ইসলাম এই সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে। কারণ এই পেশা ও অভ্যাস:

- নারীর আত্মসম্মান ও লজ্জাশীলতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।
- সমাজ ও যুবসমাজকে চারিত্রিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত করে।
- পারিবারিক শান্তি ও বিশ্বস্ততা নষ্ট করে।

৪. মনস্তাত্ত্বিক ও আত্মিক ক্ষতি

ইসলামী পণ্ডিত ও ইমামদের মতে, গানবাজনায় অভ্যস্ত হওয়া মানুষের মনে কিছু নেতিবাচক প্রভাব ফেলে:

- **অন্তরে মুনাফেকী সৃষ্টি:** ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেছেন, "গান অন্তরে মুনাফেকী (কপটতা) এমনভাবে উৎপন্ন করে, যেভাবে পানি ঘাস বা শস্য উৎপাদন করে।"
- **পর্দার বিধান লঙ্ঘন:** গান গাওয়ার সময় কণ্ঠস্বরকে সুর ও তালের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করা হয়, যা পরপুরুষের মনে কুচিন্তার জন্ম দেয়। এটি পর্দার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে।

ব্যতিক্রম ও ইসলামে বৈধ বিনোদন:

ইসলাম মানুষের সহজাত আনন্দ-বিনোদনকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে না। তবে তার জন্য নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে:

- **দফ (একমুখী ঢোল) ও সাধারণ গান:** বিয়ের উৎসব বা ঈদের দিনে নারীরা নিজেদের ও শিশুদের মাঝে কোনো ধরনের অশ্লীলতা বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া, সাধারণ আনন্দসূচক কবিতা বা গান (যার কথা ভালো এবং আল্লাহর অবাধ্যতামূলক নয়) গাইতে পারেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর উপস্থিতিতে ঈদের দিন ছোট মেয়েদের দফ বাজিয়ে বীরত্বগাথা গাওয়ার অনুমতি রাসূলুল্লাহ (সা.) দিয়েছিলেন, তবে তা ছিল সম্পূর্ণ ফিতনামুক্ত এবং ঘরোয়া পরিবেশে।

অতএব, একজন আদর্শ মুসলিম নারী যিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণকে জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছেন, তার জন্য গানবাজনার মতো অসার অভ্যাস পরিহার করে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির এবং শিক্ষণীয় বিষয়ে সময় ব্যয় করা উত্তম।

২.বিয়ের পূর্বে ইস্তিখারা করা:

বিয়ের মতো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য কল্যাণ ও গাইডেন্স বা দিকনির্দেশনা প্রার্থনা করাকে ইস্তিখারা (ইস্তিখারা সালাত ও দোয়া) বলা হয়।

ইস্তিখারা শব্দের অর্থই হলো "কল্যাণ ও উত্তম জিনিসটি বেছে নেওয়ার তাওফীক চাওয়া"। বিয়ের পূর্বে এটি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত এবং দাম্পত্য জীবনের বরকতের এক অনন্য মাধ্যম।

যখন কারো সামনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে উপস্থিত হবে।এবং সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না যে, সে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিবে।তাহলে এমন পরিস্থিতে তার জন্য উচিৎ ইস্তেখারা করা তথা ভালো দিক কে অন্বেষণ করা।অবশ্যই ইস্তেখারা, নামাযের মাধ্যমেই করবে।

ইস্তেখারার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাঃ এক হাদীসে বলেন, দুই রা'কাত নামায পড়ে বিশেষ মনোযোগের সাথে (নিম্নে উল্লেখিত) দু'আ পড়বে।

তাহলে হয়তো তার মন কোনো এক দিকে ধাবিত হবে,বা সে স্বপ্নযোগে কোনো এক ইশারা পাবে।

যেমন হযরত জাবির রাযি থেকে বর্ণিত রয়েছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُل :ْ

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ্* শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরাহ্ আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরজ নয় এমন দু'রাক'আত সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়েঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي " قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَه«ُ

ভাবার্থঃ

''প্রভু হে! আমি তোমার জ্ঞানের ওয়াসিলাহেত তোমার অনুমতি কামনা করছি; তোমার কুদরতের ওয়াসিলায় শক্তি চাচ্ছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমিই জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! তুমি যদি মনে কর যে, এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দাও এবং তার প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও। অতঃপর তুমি তাতে বারাকাত দাও। আর যদি তুমি মনে কর এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে শীঘ্র কিংবা বিলম্বে তাহলে তুমি তাকে আমা হতে দূর করে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে রাখো; অতঃপর তুমি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক তা ব্যবস্থা কর- সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করে তোল।''

তিনি ইরশাদ করেন ٱلْأَمْرَ هَٰذَا তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। --সহীহ বুখারী-(শামেলা);২/৫৭(হাদীস নং১১৬২)(কিতাবুন-নাওয়াযিল-৪/৬২৯)

বিয়ের মতো একটি দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের শুরুতে নিজের বুদ্ধি ও আবেগের ওপর শতভাগ ভরসা না করে, মহাজ্ঞানী আল্লাহর ওপর ভরসা করাই একজন মুমিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইস্তিখারা করার পর সেই বিয়ে যদি কোনো কারণে ভেঙেও যায় বা না-ও হয়, তবে বিশ্বাস রাখতে হবে যে এর মধ্যেই আল্লাহর কোনো গোপন কল্যাণ নিহিত ছিল।

৩. আর্থিক প্রস্তুতি নেওয়া এবং উপার্জন হালাল হওয়া:

ইসলামী জীবনদর্শনে বিয়ে কেবল একটি সামাজিক চুক্তি বা জৈবিক চাহিদার পূরণ নয়, বরং এটি একটি ইবাদত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন। এই বন্ধনটি যেন শুরু থেকেই বরকতময় ও মজবুত হয়, সেজন্য বিয়ের আগে থেকেই আর্থিক প্রস্তুতি নেওয়া এবং উপার্জনের উৎসকে সম্পূর্ণ হালাল রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এই দুটি বিষয়ে কিছু জরুরি এবং বাস্তবমুখী দিক নিচে আলোচনা করা হলো:

১. উপার্জনের হালাল উৎস (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি)

একটি সুখী এবং বরকতময় দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি হলো হালাল রিযিক। বিয়ের আগে নিজের উপার্জনের উৎসকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও হালাল করা প্রতিটি পুরুষের জন্য আবশ্যক দায়িত্ব।

- **দোয়ার কবুলিয়াত ও বরকত:** হাদিস অনুযায়ী, হারাম খাদ্য খেয়ে যে শরীর গড়ে ওঠে, সেই শরীর নিয়ে কোনো দোয়া কবুল হয় না। বিয়ের মতো একটি নতুন ও দীর্ঘ যাত্রায় আল্লাহর রহমত ও বরকত পেতে হলে উপার্জনের উৎস শতভাগ হালাল হতে হবে।
- **পরিবারের ওপর প্রভাব:** স্বামী যে রিযিক ঘরে নিয়ে আসেন, স্ত্রী এবং ভবিষ্যতের সন্তানরা সেটাই গ্রহণ করে। হারাম উপার্জনের অন্ন পরিবারের সদস্যদের মেজাজ খিটখিটে করে তোলে, নেক আমলের প্রতি অনীহা তৈরি করে এবং ঘরে অশান্তি ডেকে আনে।
- **সততা ও স্বচ্ছতা:** উপার্জনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ফাঁকিবাজি, সুদ, ঘুষ, ধোঁকাবাজি বা হারাম পণ্যের সংশ্লিষ্টতা এড়িয়ে চলতে হবে। উপার্জন কম হলেও

যদি তাতে সততা ও হালাল নিশ্চিত থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাতেই অল্পতে অনেক বরকত (স্বাচ্ছন্দ্য) দান করবেন।

২. বিয়ের জন্য বাস্তবসম্মত আর্থিক প্রস্তুতি

বিয়ে মানেই বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করা নয়। ইসলামে বিয়েকে সহজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে একটি নতুন সংসার শুরু করার জন্য কিছু ন্যূনতম আর্থিক প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়:

মহর নির্ধারণ ও পরিশোধের প্রস্তুতি

মহর কোনো উপহার বা আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি স্ত্রীর প্রাপ্য একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক অধিকার। আপনার বর্তমান আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে বাস্তবসম্মত মহর নির্ধারণ করুন, যা বিয়ের সময়ই বা দ্রুততম সময়ে পূর্ণ পরিশোধ করে দেওয়া সম্ভব। ধার্য করার সময় এমন কোনো কাল্পনিক বা অতিরিক্ত অঙ্ক নির্ধারণ করবেন না যা পরিশোধ করা আপনার সাধ্যের বাইরে।

মোহরানার বাইরে প্রাথমিক খরচের একটি বাজেট

বিয়ে ও নতুন সংসার শুরু করতে গেলে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে প্রধান খরচগুলো হয়। এগুলো মাথায় রেখে একটি বাজেট গুছিয়ে নেওয়া ভালো:

- **ওলিমা (বিয়ে পরবর্তী ভোজ):** নিজের সাধ্য অনুযায়ী ওলিমার আয়োজন করা সুন্নাত। লোকদেখানো বা সামাজিক সম্মানের দোহাই দিয়ে ঋণ করে বড় আয়োজন করার কোনো প্রয়োজন নেই।
- **নতুন ঘর বা বাসস্থান:** বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে কোথায় থাকবেন (যৌথ পরিবারে আলাদা ঘর নাকি নতুন ভাড়া বাসা) তার একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তার প্রাথমিক খরচ (অগ্রিম বা অ্যাডভান্স, আসবাবপত্র) গুছিয়ে রাখা।
- **দৈনিক সংসার খরচ:** নতুন একজন সদস্য আসার পর সংসারের নিয়মিত খরচ কিছুটা বাড়বে। অন্তত ৩ থেকে ৬ মাসের সংসার খরচ ব্যাকআপ হিসেবে জমিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যেন শুরুতেই কোনো আর্থিক টানাপোড়েনে পড়তে না হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে নেয়..." (সহীহ বুখারী)

এখানে সামর্থ্য বলতে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি দাম্পত্য জীবনের ন্যূনতম আর্থিক দায়িত্ব (বাসস্থান, অন্ন, বস্ত্র ও মহর) বহনের সক্ষমতাকেও বোঝানো হয়েছে।

অনেকেই ভাবেন, সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিয়ে করবেন না। কিন্তু ইসলাম বলে, নিয়ত যদি খাঁটি হয় এবং উপার্জনের চেষ্টা সচল থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা বিয়ের মাধ্যমে মানুষের অভাব দূর করে দেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩২)
সুতরাং, আমাদের উচিত উপার্জনের উৎসকে হালাল রাখা, সাধ্যমতো একটি পরিমিত আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে কদম বাড়ানো। আল্লাহ আমাদের সবার রিযিকে এবং নতুন জীবনে বরকত দান করুন। আমিন।

৪.গুনাহ থেকে বিরত থাকা:

একজন মুসলিমের ইচ্ছাকৃত গুনাহ করা কখনোই উচিত নয়। আমরা বুঝে না বুঝে অনেক গুনাহ করে ফেলি নফসের ও শয়তানের ধোকায় পরে। বিয়ের আগে তেমনি মারাত্নক গুনাহ হলো হারাম রিলেশনশীপ।এরজন্য আমাদের পরিবার দায়ী,সমাজ দায়ী,রাষ্ট্র দায়ী। আমরা ইসলামের মূলনীতি ভুলে গেছি। শরয়ী সীমারেখা ভুলে গেছি।মুসলিম পরিবারের সন্তানরা অবাধে মেলামেশা করতেছে।আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় ফ্রি মিক্সিং এর ছড়াছড়ি। যার ফলস্বরুপ চারদিকে হারাম রিলেশনশীপ এক কথায় ব্যভিচার চারদিকে মহামারী আকারে ছড়িয়ে যাচ্ছে।স্কুল কলেজ এমনকি মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরাও এই ব্যভিচারে জড়িয়ে পরতেছে।।আল্লাহর ভয় মনে ঢুকাতে হবে,সবর করতে হবে। এ ধরণের গুনাহ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যাবতীয় সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং শয়তানের প্ররোচনায় পরে গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ওয়াদা করতে হবে যেনো এই ভুল আর না হয়। ছোট থেকে আল্লাহর হুকুম আহকাম সম্পর্কে জানতে হবে এবং মানতে হবে। তবেই আমরা গুণাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

৫.অভিভাবকের অনুমতি:

কোনো মুসলমান যুবক-যুবতীর জন্য উচিৎ হবে না মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে কোনো কাজ করা বা নিজ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া। মা-বাবাকে যে কোনো মূল্যে রাজি করিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে,নতুবা তাদের সিদ্ধান্তকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে।তাদের অসন্তুষ্টিতে কোনো কিছু করা কখনো মঙ্গলজনক হবেনা।এবং না হওয়াই যুক্তিসংগত।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ-

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব-ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা।(সূরা:১৭/২৩)

অমুক ব্যতীত জীবন অচল এমন মনোভাব পরিহার করুন।বরং সর্বদা আল্লাহর হুকুম ও নবীজ সা: এর ত্বরিকায় জীবন পরিচালনা ও ক্ষণস্থায়ী লোভ-লালসা পরিহারের মনোভাব তৈরী করাই সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

মাতাপিতাকে না জানিয়ে বালিগ ছেলে মেয়ের বিবাহ নিয়ে উলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।অনেক উলামায়ে কেরাম অভিভাবকহীন বিয়েকে বাতিল বলে মনে করেন।হানাফি মাযহাব মতে কু'ফু হিসেবে ছেলেটি মেয়ের সমকক্ষ বা বেশী মর্যাদার অধীকারী হলেই কেবল বিয়ে শুদ্ধ হয়ে যাবে।নতুবা মেয়ের অভিভাবকের অনুমতির উপর বিয়ে মওকুফ থাকবে।

তবে ছেলে গায়রে কু'ফু হলে মহিলার অভিবাবকের অনুমতি অত্যাবশ্যকীয়।তথাপিও মা-বাবার সন্তুষ্টি সন্তানের জন্য মঙ্গলজনক।

৬.পাত্র-পাত্রীর সম্মতি:

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র- পাত্রী বা বর-কনে হল মূল। যারা সারা জীবন একসাথে ঘর সংসার করবে।সে কারণে বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে মেয়ের অসম্মতিতে তাদেরকে বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়।আল্লাহ বলেন,يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا,হে ঈমানদারগণ!তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে,তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারীনহবে'।(সুরা নিসা:আয়াত ১৯)

নবী করীম (সা.)বলেছেন,বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন,তার অনুমতি কিভাবে হয়? তিনি উত্তরে বললেন, 'চুপ' থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি। (বুখারি হা/৫১৩৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যুবতী-কুমারী মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পিতাকে তার অনুমতি নিতে হবে। আর তার অনুমতি হচ্ছে চুপ থাকা। (মুসলিম হা/১৪২১)

বিবাহের প্রস্তাব শোনার পর কুমারী মেয়ে চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অকুমারী মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে অলির থেকে অধিক হকদার। (মুসলিম হা/১৪২১)

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহূ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জনৈকা মহিলার সম্মতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন। (বুখারী হা/৫১৩৮)

এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে। (বুখারী হা/৬৯৪৫)

৭.পাত্র-পাত্রীর কুফুর দিকে লক্ষ্য রাখা:

বিয়ের আগে পাত্রপাত্রীর যে বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে তার মধ্যে ‘কুফু’ অন্যতম।

আরবি ‘কুফু’ শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য, সমকক্ষ, সমতুল্য ইত্যাদি।

বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের দ্বীনদারি, সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্যতা সব কিছু সমান সমান বা কাছাকাছি হওয়াকে ইসলামী পরিভাষায় কুফু বলে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের রুচি, চাহিদা, অর্থনৈতিক অবস্থান খুব বেশি ভিন্ন হলে সেখানে সুখী দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। একজন উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়ের চাহিদা-রুচির সাথে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ের রুচিবোধের মিল না থাকাটাই স্বাভাবিক।

আবার একজন দ্বীনদার পাত্রপাত্রীর সাথে একজন ধর্মবিষয়ে উদাসীন পাত্রপাত্রীর জীবনাচার নাও মিলতে পারে। দ্বীনদার চাইবে সব কিছুতে ধর্মের ছাপ থাকুক। আর দীনহীন চাইবে সব কিছু ধর্মের আবরণমুক্ত থাকুক। সুতরাং এ দুইয়ের একত্রে বসবাস কখনো শান্তি-সুখের ঠিকানা হতে পারে না। তাই পবিত্র কুরআনও বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতে সমতা রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছে।

আল্লাহ বলেন, ‘দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য উপযুক্ত।’ (সূরা নূর : ২৬)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘ব্যভিচারী পুরুষ যেন ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে। আবার ব্যভিচারিণী নারী যেন ব্যভিচারী পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে। মুমিনদের জন্য এ ধরনের চরিত্রের নারী-পুরুষকে হারাম করা হয়েছে।”

’ (সূরা নূর : ৩)।

কুরআনের পাশাপাশি রাসূল সা:-এর পবিত্র হাদিস শরিফেও ‘কুফু’ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাসূল সা: ‘কুফু’র বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের নিকট এমন কোন ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।

(ইবনে মাজাহ ১৯৬৭,তিরমিযী ১০৮৪, ইরওয়াহ ১৮৬৮, সহীহাহ ১০২২।)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবচেনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো।

(ইবনে মাজাহ ১৯৬৮)

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (মূলত) চারটি গুণের কারণে নারীকে বিবাহ করা হয়- নারীর ধন-সম্পদ, অথবা বংশ-মর্যাদা, অথবা রূপ-সৌন্দর্য, অথবা তার ধর্মভীরুর কারণে। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন) সুতরাং ধর্মভীরুকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করে সফল হও। আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমার দু' হাত ধূলায় ধূসরিত হোক (ধর্মভীরু মহিলাকে প্রাধান্য না দিলে ধ্বংস অবধারিত)!
সহীহ : বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬, নাসায়ী ৩২৩০, আবূ দাঊদ ২০৪৭, ইবনু মাজাহ ১৮৫৮, আহমাদ ৯৫২১, ইরওয়া ১৭৮৩, সহীহ আল জামি' ৩০০৩।)

এ রকম আরো কিছু হাদিস উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানি রা: মন্তব্য করেছেন, 'এসব হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, দ্বীনদারী ও চরিত্রের দিক দিয়াই 'কুফু'র বিবেচনা করতে হবে।
এক্ষেত্রে ইমাম মালেক দৃঢ়তার সাথে বলেছেন 'কুফু'র ব্যাপারটি কেবলমাত্র দ্বীনদারীর ক্ষেত্রেই বিবেচ্য। (নায়লুল আওতার)।
বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালোবাসা ও দাম্পত্য জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করাই 'কুফু'র মুখ্য উদ্দেশ্য। কনে যদি দ্বীনদার ও পবিত্র চরিত্রের হয় আর বর যদি বেদ্বীন-চরিত্রহীন হয় কিংবা এর বিপরীত হয়, তাহলে অন্য সব দিক দিয়ে সমতা হলেও সে মিল শরিয়তের দৃষ্টিতে কাম্য নয়।
তেমনি এ ধরনের বিয়ে স্থিতিশীল নাও হতে পারে। হলেও সে দাম্পত্য জীবন হতে পারে তিক্ত ও বিষাক্ত।
ইমাম মালিক বিবাহের উপযুক্ততার (কুফু) জন্য একমাত্র দ্বীনদারী ছাড়া অন্য কোন ভিত্তি স্বীকার করেন নাই। আর জমহুর ফিকাহবিগণ এই পর্যায়ে চারটি জিনিসের উল্লেখ করিয়াছেন।
তাহা হইল, দ্বীনদারী, স্বাধীন-মুক্ত হওয়া-ক্রীতদাস না হওয়া (বর্তমানে ইহা অবান্তর), বংশ ও পেশা।
★ফলে মুসলিম মেয়ে অমুসলিম পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলবে না।
★ চরিত্রবতী দ্বীন পালনকারী মেয়ে ফাসিক, নীতি-আদর্শহীন, পাপীষ্ঠ ও চরিত্রহীন পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলবে না।
★স্বাধীন মুক্ত মেয়ে ক্রীতদাসের নিকট বিবাহ দেওয়া চলবে না।

★ অত্যন্ত হীন-নীচ বংশের পুরুষের নিকট বিবাহ দেওয়া চলবে না উচ্চ ভদ্র-অভিজাত বংশীয় মেয়ে। ব্যবসায়ীর মেয়ে কৃষিজীবী ছেলেকে বিবাহ করলে রুচি ও আচার-আচরণ এবং সাংসারিক কাজ-কামের পার্থক্য, পারিবারিক নিয়ম-নীতি ও ধরণ-ধারণের পার্থক্যের কারণে বিশেষ অসুবিধা অমিল ও মানসিক অশান্তির সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এই কারণেই তা পছন্দ করা হয় নাই। কুফু মেনে বিবাহ করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি এই রূপ (কুফু না মেনেই) বিবাহ হয়, তবে বিবাহ যে ছহীহ হবে তা নিঃসন্দেহ।

৮.বিবাহের প্রস্তাব:

বর অথবা কনে যে কোন এক পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, ওমর (রাঃ)-এর কন্যা হাফছা (রাঃ) খুনায়স ইবনু হুযাইফা সাহমীর মৃত্যুতে বিধবা হ'লে, (যিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন এবং মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন)। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর কাছে গেলাম এবং হাফছাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমি এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। তারপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আমার কাছে এটা প্রকাশ পেয়েছে যে, এখন আমি যেন তাকে বিবাহ না করি। ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আবুবকর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, যদি আপনি চান তাহ'লে আপনার সঙ্গে ওমরের কন্যা হাফছাকে বিবাহ দেই। আবুবকর (রাঃ) নীরব থাকলেন, প্রত্যুত্তরে আমাকে কিছুই বললেন না। এতে আমি ওছমান (রাঃ)-এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হ'লাম। এরপর আমি কয়েক রাত অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) হাফছাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে হাফছাকে বিবাহ দিলাম'।

(. বুখারী হা/৫১২২।)

অন্য এক হাদীছে এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকে কি আপনার প্রয়োজন আছে'?

(বুখারী হা/৫১২০।)

বিবাহের প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই মহিলাকে অন্য কেউ বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে কি-না? কেউ প্রস্তাব দিয়ে থাকলে নতুন করে প্রস্তাব দেয়া যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) (ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে) একজনে দর-দাম করলে অন্যকে দরদাম করতে নিষেধ করেছেন এবং এক মুসলিম ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর অন্য ভাইকে প্রস্তাব দিতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না প্রথম প্রস্তাবক তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয় বা তাকে অনুমতি দেয়'।
(বুখারী হা/৫১৪২: মুসলিম হা/১৪১২: বুলুগুল মারাম হা/৯৭৮।)

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خطبة أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُك. 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়, যতক্ষণ না সে বিবাহ করে অথবা ছেড়ে দেয়'।
(বুখারী হা/২১৪০, ৫১৪৪; মুসলিম হা/১৪০৮; মিশকাত হা/৩১৪৪।)

৯.পাত্র-পাত্রী দেখা:

বিবাহের পূর্বে পাত্র পাত্রী একে অপরের সাথে মাহরামের উপস্থিতিতে দেখা করতে পারবে।এবং দেখা করা উচিত।যাতে পরস্পরের মাঝে মহব্বত সৃষ্টি হয়।মুগীরা বিন শু'বা রাযিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সৃষ্টি হবে। (তিরমিযী,নাসাঈ,ইবনু মাজাহ,মিশকাত হা/৩১০৭)
হযরত আবু হুরায়রা রাযি থেকে বর্ণিত,
عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنظرت إليها؟»، قال: لا، قال: «فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصارشيئا«
তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর পাশে বসা ছিলাম।একব্যক্তি এসে বলল, আমি আনসারি এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাই।রাসূলুল্লাহ বললেন,তুমি কি পাত্রী দেখেছো?তিনি বললেন,না।রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন,যাও গিয়ে পাত্রী দেখে আসো।কেননা আনসারীদের চোখে নীল বা এ জাতীয় কিছু থাকে।
(সহীহ মুসলিম-১৪২৪)

বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের পূর্বে বায়োডাটা প্রেরণ করা হবে।তবে ছবি প্রেরণ করা যাবে না।বরং পাত্র পক্ষের কোনো এক মহিলা সরাসরি পাত্রীকে দেখে আসবে।

আর প্রস্তাব দেয়ার পর যথাসম্ভব সরাসরি দেখার চেষ্টা করা হবে।কেননা যে হেকমতে পাত্রী দেখার কথা বলা হচ্ছে,সেটা একমাত্র সরাসরি দেখার মাধ্যমেই সম্ভব হবে।হ্যা কোনো কারণে(যেমন পাত্র থেকে পাত্রী অনেক দূরে অবস্থানরত)যদি পাত্র-পাত্রীকে সরাসরি দেখা সম্ভব না হয়,তাহলে ভিডিওকলের মাধ্যমে কিছু শর্তসাপেক্ষে দেখা যেতে পারে।কেননা ছবির তুলনায় ভিডিওর হুকুমে কিছুটা শীতিলতা রয়েছে।

তবে আমাদের সমাজে পাত্রী দেখার জন্য পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ছোটখাটো একটা দল পাত্রীর বাড়িতে যায়।এখানে গায়রে মাহরাম মেইনটেইন করা হয়না।পাত্রের বাবা,চাচা,দুলাভাই,নানা,দাদা সবার সামনে মেয়েকে মুখ দেখাতে হয়।সবার সামনেই মাথার কাপড় সরিয়ে চুল দেখে,হেঁটে দেখে ইত্যাদি কাজ করে। সকলে মিলে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে। মনে হয় যেনো পাত্রীর ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে।এগুলো শরীয়া সম্মত নয়। এভাবে বিয়ের আগে পাত্র ব্যতিত পাত্র পক্ষের কোনো পুরুষ লোক মেয়েকে দেখতে পারবেনা। যদি এভাবে দেখা করা হয় তা অন্যদের জন্য যেনার শামিল। আবার বিয়ের সময় মেয়ের রূপ লাবণ্যকে প্রাধান্য দেয়া হয় দ্বীনদারীর পরিরবর্তে। অথচ হাদিসে দ্বীনদারীতাকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে ছেলে-মেয়ে ঘুরতে যাওয়া,একান্তে সময় কাটানো,মেসেজ বা কলে কথা বার্তা বলা সবকিছুই শরীয়া বহির্ভুত কাজ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর মহিলার সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রী লোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে। (বুখারী হা/৩০০৬)

কেননা অন্য হাদিসে এসেছে, কোনো পুরুষ-মহিলা নির্জনে যদি একত্রিত হয় তখন তৃতীয়জন হিসেবে সেখানে শয়তান উপস্থিত হয়। (তিরমিযী হা/১১৭১)

১০. সুন্নতি পদ্ধতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা:

ইসলাম কেবল কতগুলো আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদানকারী একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত এই জীবনবিধান মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির নিশ্চয়তা দেয়। আমাদের সকলের জীবনের অন্যতম জীবনঘনিষ্ঠ একটি অংশ হলো বিবাহ। আমাদের প্রত্যেক কাজেই যেহুতু রাসুল(সা.) এর অনুসরণ করা উচিত তাই বিবাহের ক্ষেত্রেও একই মত।কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে গান -বাজনা, বেপর্দা, অশ্লীলতা, অপচয়, যৌতুক ইত্যাদি শরীয়ত বিগর্হিত কাজ দেখা যায়। এতে বিবাহ নামক ইবাদতের সওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয় বর কনে ও সংশ্লিষ্ট সকলে। অথচ বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। আর বাকি অর্ধেকে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে। (মিশকাত হা/৩০৩৬)

বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল আযাদ প্রাপ্ত বয়স্ক বিবেকবান দু'জন মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বাক্ষীর সামনে পাত্র/পাত্রি প্রস্তাব দিবে আর অপরপক্ষ পাত্র/পাত্রি তা কবুল করবে। আর সাক্ষিগণ উভয়ের কথা সুস্পষ্টভাবে শুনবে। সুতরাং বিয়ের মজলিসে সাক্ষীর উপস্থিত ছাড়া বিয়ে সহীহ হবে না।

হাদিস শরিফে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، فَهُوَ بَاطِلٌ

আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, অভিবাক ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিত বিয়ে শুদ্ধ হয় না। যে বিবাহ অভিবাক ও সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিত হবে তা বাতিল। (সহিহ ইবন হিব্বান ৪০৭৫)

ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে রয়েছে-

فى الدر المختار- (و) شرط (حضور) شاهدين (حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا) (الدر المختار ، كتاب النكاح(3/9-،

অনুবাদ-বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্ত হল শরীয়তের মুকাল্লাফ [যাদের উপর শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়] এমন দুইজন আযাদ পুরুষ সাক্ষি বা একজন আযাদ পুরুষ ও

দুইজন মহিলা সাক্ষি হতে হবে, যারা প্রস্তাবনা ও কবুল বলার উভয় বক্তব্য স্বকর্ণে উপস্থিত থেকে শুনতে পায়। {আদ দুররুল মুখতার-৩/৯, ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/২৬৮} বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল মৌলিকভাবে দু'টি। যথা-

১-ইজাব কবুল হওয়া।

২-দুইজন মুসলিম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও দুইজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা উক্ত ইজাব কবুল স্বকর্ণে শুনা।

ব্যস উক্ত দু'টি শর্ত পাওয়া গেলেই বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

যার পুরোপুরি ব্যাখ্যা হলোঃ-

স্বামী স্ত্রীকে ইজাব তথা প্রস্তাব দিবে বা কোন ব্যক্তিকে উকিল বানিয়ে স্বামীর পরিচয় ও দেনমোহর উল্লেখ করে প্রস্তাব দিবে, আর স্ত্রী সেই প্রস্তাবকে কবুল করবে। কিংবা স্ত্রী নিজে স্বামীকে প্রস্তাব দিবে আর স্বামী তা কবুল করবে, কিংবা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে তার উকীল গিয়ে স্বামীকে প্রস্তাব দিবে আর স্বামী তা কবুল করবে। আর উক্ত প্রস্তাব এবং কবুল বলার বিষয়টি উপস্থিত থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক দুইজন মুসলিম পুরুষ বা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও দুইজন মহিলা স্বকর্ণে শুনবে। তাহলেই শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

১১. মোহর প্রদান করা:

সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর উপর ফরজ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা তা সানন্দে তৃপ্তিসহকারে খাও। (সুরা নিসা:আয়াত ৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [٤:٢٤]

অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা গ্রহণ করবে,তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। [সূরা নিসা-২৪]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্ট হয় যে যদি মোহরানা নির্ধারন হওয়ার পর স্ত্রী যদি (মোহরানা মাফ করে দেওয়া বা কম করে দেওয়া বা বাকি রেখে অন্য সময়ে দেওয়া) কোনো বিষয়ের উপর স্বামীর সাথে একমত হয়, তাহলে কোনো সমস্যা নেই।
সুতরাং স্ত্রীর সম্মতিতে মোহরানা বাকি রাখা জায়েজ আছে।
তবে কেউ যদি বিবাহ করে এই নিয়তে যে মোহরানা সে পরিশোধ করবেনা তাহলে মারাত্নক গুনাহ হবে।হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করল এই নিয়তে যে সে মোহর পরিশোধ করবে না তাহলে সে ব্যভিচারী'।(বাযযার,সহীহ আত-তারগীব হা/১৮০৬)
আবার অনেকের মনে প্রশ্ন আসে যে,মোহর কি সব একবারেই পরিশোধ করতে হবে? শরীয়তের বিধান হলোঃ দেনমোহর বিয়ের আকদের পর প্রদান করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে সহবাসের পূর্বে প্রদান করাই উত্তম। তবে যদি স্ত্রী দেনমোহর প্রদান করা ছাড়াই সহবাসের অনুমতি প্রদান করে তাহলে কোন সমস্যা নেই। বাকি স্ত্রী দেনমোহর প্রদান করা ছাড়া প্রথম সহবাসের পূর্বে বাঁধা প্রদান করতে পারবে। কিন্তু একবার সহবাস হয়ে গেলে আর বাঁধা দিতে পারবে না। কিন্তু স্বামীর জিম্মায় দেনমোহর আদায় না করলে তা ঋণ হিসেবে বাকি থেকে যাবে।স্ত্রী যদি উক্ত দেনমোহর মাফ না করে, আর স্বামীও তা পরিশোধ না করে, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে স্বামীর অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাই দেনমোহরের টাকা পরিশোধ করে দেয়া জরুরী।
আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেনঃ
واحل لكما ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما
উল্লিখিত নারীরা ছাড়া অন্যদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে, যে স্বীয় সম্পদ দ্বারা প্রয়াসী হবে তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে, ব্যভিচারে নয়। অতএব তাদের নিকট থেকে তোমরা যে আনন্দ উপভোগ করেছ (সে কারণে) তাদের ধার্যকৃত মোহর তাদেরকে প্রদান করবে। আর মোহর নির্ধারিত থাকার পরও কোনো বিষয়ে পরস্পর সম্মত হলে তাতে তোমাদের কোনো অপরাধ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।-সূরা নিসা : ২৪
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن[٥:٥] ّ َ

তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। [সূরা মায়িদা-৫]

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن[٦٠:١٠] ۖ

তোমরা, এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তোমাদের অপরাধ হবে না। [সূরা মুমতাহিনা-১০]

আবার অনেকের মনে প্রশ্ন আসে,কতটুকু দেনমোহর করা উত্তম?

সকলের ঐক্যমত অনুযায়ী মোহরের কোন নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বসীমা নেই। কেননা কুরআন-হাদীসের এমন কোন প্রমাণ নেই যা এ ব্যাপারে নির্দেশ করে। ইমাম শাওকানী বলেন, ‘‘মোহরের আধিক্যের সীমা না থাকার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে।’’

ইরশাদ হয়েছে, وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا ‘‘তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না।’’ (সূরা আন নিসা, আয়াত ২০)। এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মোহরের সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই।

একদা উমার (রা) খুতবায় ৪০০ দিরহামের বেশি মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করে বলেন, তোমরা মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না। কেননা যদি তা পার্থিব জীবনে সম্মানের বস্তু হত অথবা আল্লাহর নিকট তাকওয়ার বস্তু হত, তবে তা পাওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হতেন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি তাঁর কোন স্ত্রীর এবং তাঁর কোন কন্যার জন্য বার উকিয়ার বেশী মোহর ধার্য করেননি। মিম্বর থেকে নামার পর জনৈক কুরাইশী মহিলা তাঁকে বলল, হে উমার! এটা আপনার এখতিয়ারভুক্ত কোন বিষয় নয়। উমার (রা) বললেন, কেন? মহিলাটি বলল, কারণ আল্লাহ বলেছেন, ‘‘যদি তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করবে না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে।’’ (সূরা আন নিসা, আয়াত ২০) এ কথা শুনে উমার (রা) বলেন, একজন মহিলা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং একজন পুরুষ ভুল করেছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। সবাই উমারের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। অতঃপর তিনি পুনরায় মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে স্ত্রীদের মোহর

৪০০ দিরহামের বেশী ধার্য করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু যে ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে যত খুশী স্ত্রীকে প্রদান করতে চায় (সে যেন তা প্রদান করে)।

তবে মোহর বেশী নির্ধারণ না করাই উত্তম। ইমাম শাওকানী বলেন, "কারণ মোহরের পরিমাণ কম হলে বিয়ে করা কঠিন হবে না। ফলে এতে কাঙ্খিত বিয়ের সংখ্যা বাড়বে, গরীবরাও বিয়ে করতে সমর্থ হবে এবং বংশ বিস্তার লাভ করবে, যা বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে মোহর যদি বেশী হয় তাহলে বড় লোকেরা ছাড়া অন্যরা বিয়ে করতে সমর্থ হবে না। ফলে সংখ্যাধিক্য গরীবরা অবিবাহিত থেকে যাবে। এতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাধিক্যতা অর্জিত হবে না, যে ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দিকনির্দেশা প্রদান করেছেন।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে লোহার আংটি ও কুরআনের আয়াত শিক্ষা দানকে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল। আলী (রা) ফাতিমা (রা)-কে একটি বর্ম মোহর হিসেবে প্রদান করে বিয়ে করেন।

বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এক ইলমের মজলিসে তার ছাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, আমার নিকট মাত্র ১ দিরহাম আছে। সাঈদ বললেন, আমি এক দিরহামের বিনিময়ে আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিলাম।

মোহরের নিম্নসীমা নিয়ে ইমামদের মতামত:

১। হানাফীদের মতে, মোহরের সর্বনিম্ন সীমা ১০ দিরহাম। এর প্রমাণ এ হাদীসটি- "১০ দিরহামের কমে মোহর নেই।" ইমাম শাওকানী বলেন, "যদি এই হাদীসটি সহীহ হত তাহলে তা পূর্বোল্লেখিত যেসব হাদীসে মোহরের পরিমাণ এর চেয়ে কম হতে পারে বলে নির্দেশ করা হয়েছে, সেগুলোর বিরোধী হত। কিন্তু এই হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। এ হাদীসে মুবাশশির বিন আবীদ ও হাজ্জাজ বিন আরতাআহ নামে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে। হাজ্জাল মুদাললিস এবং মুবাশশির পরিত্যক্ত বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।"

২। মালেকীদের মতে, মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে ১/৪ দীনার অথবা তিন দিরহাম অথবা সমমূল্যের ব্যবসায়ী পণ্য।

৩। শাফেঈ ও হাম্বলীদের মতে, মোহরের কোন সর্বনিম্ন সীমা নেই। তাদের মতে, যে জিনিসের মূল্য রয়েছে তা মোহর হিসেবে গণ্য হতে পারে। আর যে জিনিস মূল্যহীন তা মোহর হতে পারে না। ইমাম শাওকানী এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়,মোহরের সুনির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই। তা কমও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে। পারস্পরিক সমঝোতা এবং সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে মোহর কম-বেশী হতে পারে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী বলেন, ‘‘নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোহরের এমন নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেননি যার কম বা বেশি মোহর নির্ধারণ করা চলবে না। কারণ এ ব্যাপারে লোকদের আগ্রহ প্রকাশ করার রেওয়াজ ও অভিরুচি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাছাড়া চাহিদার ক্ষেত্রেও লোকদের স্তর রয়েছে। এজন্য তাদের জন্য মোহরের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। যেমন কাঙ্খিত পণ্যের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা অসম্ভব। মোহরের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যা আদায় করার জন্য প্রয়াস চালাতে হয় এবং তার একটা মূল্য থাকে। আর এমন পরিমাণ হওয়া উচিত নয় যা সাধারণত লোকদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী আদায় করা কষ্টসাধ্য হবে। এটাই মোহরের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যে রীতি রয়েছে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।’’

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল আজকাল অনেকে বিবাহের মোহরানার মত ফরজ কাজকে মর্যাদার বিষয় বা তালাক থেকে রক্ষার জন্য নারীর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। এ যেন ছেলের সামর্থ্যের দিকে খেয়াল না করে মেয়ে পক্ষ তাদের বংশ মর্যাদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেন। আবার অনেকের ধারণা যে, বিবাহে মোহর বেশি ধার্য করা থাকলে ছেলে পক্ষ মেয়েকে তালাক দিতে পারবে না কিংবা তালাক দিতে চাইলে প্রচুর টাকা দিতে হবে। এ উভয় ধারণা ইসলাম বিরোধী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে লোকের এক মুষ্টি খাদ্যের বিনিময়েও বিবাহ করতেন। এছাড়া কিছু না থাকায় কেবল কুরআন শিক্ষাদানের বিনিময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক সাহাবীকে বিবাহ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কারণবশত মোহর বাকি রাখা যায়।তবে সেটা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই যত দ্রুত সম্ভব তা পরিশোধ করা কর্তব্য। মোহর বাকি থাকলে সন্তান অবৈধ হবে এ কথা ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তিকে বললেন, অমুক মহিলার সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাজি? সে বললো,হ্যাঁ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বললেন,অমুক ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিবাহ দিব তুমি কি রাজি? মহিলা বলল, হ্যাঁ। তিনি তাদের বিবাহ দিলেন। কিন্তু কোন মোহর ধারণ করলে না এবং মহিলাকে কিছু দিলেন না। ওই ব্যক্তি হুদাইবিয়াবিয়ার অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। এ সময় তার মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বললেন, স্ত্রীর জন্য আমার কোন মোহর নির্ধারিত ছিল না। এক্ষণে আমি

আমার খায়বরের প্রাপ্ত অংশ তাকে মোহর হিসেবে দান করলাম । যার মূল্য ছিল ১ লক্ষ দিরহাম. (আবু দাঊদ হা/২১১৭) নবী করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম একদা মোহর বাকি রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং কুরআন শিক্ষাদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তারা আদায় করতে বলেন। তবে মোহরানা পরিশোধ না করে মৃত্যুর সময় স্ত্রীর নিকট থেকে তা মাফ করিয়ে নেওয়ার যে রীতি সমাজে চালু আছে তা চরম অন্যায় ও প্রতারণাপূর্ণ। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং হাতে অর্থ এলেই সর্বাগ্রে স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে।

১২.আড়ম্বর এবং কুসংস্কার পরিত্যাগ করা:

বিয়ে বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে আড়ম্বর (অতিরিক্ত জাঁকজমক বা লোকদেখানো অপচয়) এবং কুসংস্কার পরিত্যাগ করা একটি সুস্থ, সুন্দর ও বরকতময় সমাজ গঠনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সমাজে অনেক সময় বিয়ের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে গিয়ে তা কেবলই বাহ্যিক প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

এই দুটি বিষয় বর্জন করার কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং উপায় নিচে আলোচনা করা হলো:

১. আড়ম্বর ও অপচয় পরিত্যাগ করা

সামাজিক মর্যাদা দেখানোর প্রতিযোগিতায় অতিরিক্ত খরচ করা অনেক সময় পরিবারের জন্য বড় মানসিক ও আর্থিক বোঝার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- **সহজ ও সাদামাটা আয়োজন:** বিয়ে বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যত সহজ ও সাধ্যের মধ্যে রাখা যায়, ততই তাতে শান্তি ও বরকত থাকে।
- **লোকদেখানো মানসিকতা বর্জন:** "মানুষ কী বলবে" এই চিন্তা থেকে বের হয়ে এসে নিজের সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠানের বাজেট করা উচিত।
- **সম্পদের সঠিক ব্যবহার:** বিয়ের অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা, অতি-উচ্চমূল্যের পোশাক বা বিশাল ডেকোরেশনের পেছনে লাখ লাখ টাকা খরচ না করে, সেই অর্থ নবদম্পতির ভবিষ্যৎ জীবনের সঞ্চয় কিংবা কোনো কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

- **অতিথি তালিকায় সংযম:** সবাইকে দেখানোর জন্য হাজারো মানুষের বিশাল আয়োজন না করে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে আন্তরিক পরিবেশে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

২.কুসংস্কার বর্জন করা:

আমাদের সমাজে বিয়ের সাথে এমন কিছু নিয়ম বা প্রথা জড়িয়ে গেছে, যেগুলোর কোনো ধর্মীয়, যৌক্তিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো কেবলই অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার।

- **যৌতুক ও অন্যায় দাবি দূর করা:** উপহারের নামে বা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে পাত্রপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আর্থিক বা বস্তুগত সুবিধা দাবি করা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি পুরোপুরি বর্জন করা উচিত।
- **দিন-ক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ মানা:** অমুক মাসে বিয়ে করা যাবে না, অমুক দিনে যাত্রা অশুভ, কিংবা নির্দিষ্ট কিছু আচার না করলে দাম্পত্য জীবনে অমঙ্গল হবে—এ জাতীয় সমস্ত অন্ধবিশ্বাস মন থেকে ঝেড়ে ফেলা জরুরি। ভাগ্য এবং জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পূর্ণ সৃষ্টিকর্তার হাতে।
- **অপসংস্কৃতির প্রভাব মুক্ত রাখা:** গায়ে হলুদ বা অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতায় এমন কিছু সংস্কৃতি বা আচারের অনুপ্রবেশ ঘটে, যা আমাদের নিজস্ব ধর্মীয় বা সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলো পরিহার করে শালীন ও মার্জিত আচার-অনুষ্ঠান করা উচিত।

একটি সফল ও সুখী পরিবারের মূল ভিত্তি হলো—**পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ এবং সততা**; কোনো ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিয়ম নয়। বিয়েতে যখন আড়ম্বর ও কুসংস্কার কমে যায়, তখন সম্পর্কের গভীরতা এবং পবিত্রতা অনেক বেড়ে যায়।

১৩.দোয়া করা এবং আল্লহর উপর ভরসা রাখা:

দুয়ার বিকল্প কিছু নেই। দুয়া স্বয়ং একটি ইবাদাত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সুরা মু'মিন:আয়াত ৬০)। তাই সকল কাজের পূর্বেই আমাদের প্রচুর দুয়া করতে হবে।আমাদের প্রস্তুতির পাশাপাশি অনবরত দুয়া করতে হবে। নিজের চোখের প্রশান্তির জন্য,পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ও একসাথে সারাজিবন কাটানোর

জন্য একজন উত্তম নেককার স্ত্রী এবং অনাগত সন্তানদের উত্তম মা উপহার দেয়ার জন্য আমাদের দুয়া করতে হবে। তাই মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা জরুরী। হাদিসে এসেছে,রাসুল(সা) বলেন,তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর।

দুয়ার পাশাপাশি আল্লাহর উপর ভরসা অর্থাৎ তাওয়াক্কুল রাখতে হবে।

কারণ আল্লহ বলেন, "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।" *(সূরা আত-তালাক: ৩)*

সুতরাং দুয়া এবং তাওয়াক্কুল একসাথে জারি রাখতে হবে।

■ বিবাহ পরবর্তী স্বামীর করনীয় ও দায়িত্ব:

বিবাহ পরবর্তী কর্তব্য:

ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী বিবাহ কেবল একটি শারীরিক বা সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র আত্মিক বন্ধন। দাম্পত্য জীবনকে সুখময়, শান্তিপূর্ণ ও বরকতময় করে তুলতে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে স্বামীর দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর কিছু করণীয় রয়েছে। যার কিছু অন্য মানুষের জন্য এবং কিছু স্বামী-স্ত্রীর জন্য।

এগুলি নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

ক. বিবাহ শেষে দো'আ পাঠ : বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়ার পর উপস্থিত সকলে বর-কনের কল্যাণের জন্য এই দো'আ পাঠ করবেন।

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ،

আল্লহ তোমাদের প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং তোমাদের উভয়কে কল্যাণে মিলিত করুন'।

(আবুদাউদ হা/২১৩০; তিরমিযী হা/১০৯১; ইবনু মাজাহ হা/১৯০৫, মিশকাত হা/২৩৩২।)

অর্থাৎ আল্লাহ যেন তাকে আন্তরিক সুখ ও মানসিক প্রশান্তি দান করেন। আর এ বিবাহের মাধ্যমে সে প্রশান্তি অর্জিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি এই অনুগ্রহ করেছেন, যাতে স্বামীরা স্বীয় স্ত্রীর নিকটে প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

(আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, শরহ সুনানে আবী দাউদ, ১২/৯৫।)

খ. বাসর ঘর ও কনে সাজানো : বিয়ের পর বর-কনেকে একত্রে থাকার জন্য বাসর ঘরের ব্যবস্থা করা ও কনেকে সাজিয়ে সুন্দর করে বরের সামনে উপস্থিত করা সুন্নাত। (বুখারী হা/৩৮৯৪; ইবনু মাজাহ হা/১৮৭৬; ইরওয়া হা/১৮৩১।)

উম্মু সুলাইম (রাঃ) ছাফিয়া (রাঃ)-কে রাসূলের জন্য সাজিয়ে দেন।

(বুখারী হা/৩৭১: মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন," নবী করীম (স:) যখন আমাকে বিবাহ করেন, তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। তারপর আমরা মদীনায় এলাম এবং বনু হারিছ গোত্রে অবস্থান করলাম। সেখানে আমি জ্বরে আক্রান্ত হ'লাম। এতে আমার চুল পড়ে গেল। পরে যখন আমার মাথার সামনের চুল জমে উঠল, সে সময় আমি একদিন আমার বান্ধবীদের সাথে দোলনায় খেলা করছিলাম। তখন আমার মাতা উম্মে রূমান আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে এলাম। আমি তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। তিনি আমার হাত ধরে ঘরের দরজায় এসে আমাকে দাঁড় করালেন। তখন আমি হাঁপাচ্ছিলাম। শেষে আমার শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হ'ল। এরপর তিনি কিছু পানি নিলেন এবং তা দিয়ে আমার মুখমণ্ডল ও মাথা মাসেহ করে দিলেন। তারপর আমাকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করালেন। সেখানে কয়েকজন আনছার মহিলা ছিলেন। তাঁরা বললেন, কল্যাণময়, বরকতময় এবং সৌভাগ্যমণ্ডিত হোক। আমাকে তাদের কাছে দিয়ে দিলেন। তাঁরা আমার অবস্থান ঠিক করে দিলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (স:)-কে দেখে আমি হকচকিয়ে গেলাম। তাঁরা আমাকে তাঁর কাছে তুলে দিলেন। সে সময় আমি ছিলাম নয় বছরের বালিকা"।

(বুখারী হা/৩৮৯৪, ৩৮৯৬; মুসলিম হা/১৪২২; নাসাঈ হা/৩২৫৫-৫৮; আবুদাউদ হা/২১২১, ৪৯৩৩, ৪৯৩৫; ইরওয়া হা/১৮৩১।)

গ. বিবাহের ঘোষণা দেওয়া : বিবাহ হচ্ছে একটি প্রকাশ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। তাই বিয়ের অনুষ্ঠান সকলকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। রাসূল (স:) বলেছেন,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ 'তোমরা বিবাহের ব্যাপক প্রচার কর'।

(আহমাদ হা/১৬১৭৫; ইবনু হিব্বান হা/৪০৬৬; ইরওয়া হা/১৯৯৩।)

এজন্য বিবাহের সময় ইসলামে দফ বা একমুখা ঢোল বাজানোকে জায়েয বলা হয়েছে। রুবাই বিনত মুআব্বিয ইবনু আফরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বাসর রাতের পরের দিন নবী করীম (স:) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন, যেমন বর্তমানে তুমি আমার বিছানার ওপর বসে আছ। সে সময় আমাদের ছোট মেয়েরা দফ

বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত আমাদের বাপ-চাচাদের শোকগাঁথা গাচ্ছিল'।

(বুখারী হা/৫১৪৭ 'বিবাহ ও ওয়ালীমায় দফ বাজানো' অনুচ্ছেদ।)

ঘ. বাসর রাতে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা : বাসর রাতে নববধূর নিকটে প্রবেশ করে তার সাথে সদয় ও সম্প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে, বিশেষত কমবয়সী স্ত্রীদের সাথে। আসমা বিনতু ইয়াযীদ বিন সাকান বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স:)-এর জন্য আয়েশাকে তেল মাখিয়ে দিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স:)-এর নিকটে আসলাম। তারপর তাকে খোলা অবস্থায় দেখার জন্য আহ্বান করলাম। তিনি এসে আয়েশার পাশে বসলেন। তারপর দুধের একটি বাটি নিয়ে আসা হ'ল। তিনি পান করে আয়েশার দিকে দিলেন। কিন্তু আয়েশা লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করলেন। আসমা বলেন, আমি তাকে ধমকের সুরে বললাম, তুমি নবী করীম (স:)-এর হাত থেকে গ্রহণ কর। আসমা বললেন, সে নিয়ে কিছুটা পান করল। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি কি তোমার বান্ধবীকে দিব? আসমা বললেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স:)! বরং তা আপনি নিন

এবং পান করে আপনার হাত থেকে আমাকে দিন। তিনি নিয়ে পান করে আমাকে দিলেন। তিনি বলেন, আমি বসে পাত্রটি আমার জানুর উপরে রাখলাম। এরপর আমি পাত্রটি ঘুরাতে লাগলাম ও ঠোট দ্বারা স্পর্শ করতে লাগলাম যেন নবী করীম (স:)-এর পান করার স্পর্শ পাই। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমার সাথে উপস্থিত মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তাদেরকে দাও। তারা বললেন, আমরা তা (পান করার) ইচ্ছা করি না। তখন নবী করীম (স:) বললেন,

لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكَذِبًا 'তারা ক্ষুধা ও মিথ্যা জমা করে না'।

(মুসনাদ আহমাদ হা/২৭৬৩২; ইবনু মাজাহ হা/৩২৯৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ১৯।)

ঙ. স্ত্রীর মাথার অগ্রভাগে হাত রেখে দো'আ করা : বাসর রাতে বা তার পূর্বে স্বামী স্ত্রীর মাথার সম্মুখভাগে হাত রেখে বরকতের দো'আ করবে। নবী করীম (স:) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন মহিলাকে বিবাহ করবে অথবা চাকর ক্রয় করবে, সে যেন তার কপালে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে অতঃপর বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْه،

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।

(আবুদাউদ হা/২১৬০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫২; মিশকাত হা/২৪৪৬, সনদ হাসান।)

চ. স্বামী-স্ত্রী একত্রে সালাত আদায় করা : বাসর রাতে স্বামী স্বীয় নববধূকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে। এটা মুস্তাহাব। শাকীক (রাঃ) বলেন, আবু হারীয নামক এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি একজন যুবতী কুমারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। আর আমি ভয় করছি যে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে। তারপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন,

إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهُ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ

'নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব-ভালবাসা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে এবং রাগ-অসন্তুষ্টি শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান ইচ্ছা করছে যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বৈধ করেছেন তাতে সে তোমাদের নিকট ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সুতরাং সে (তোমার স্ত্রী) যখন তোমার কাছে আসবে তখন তাকে (জামা'আত সহকারে) তোমার পিছনে দু'রাক'আত সালাত পড়তে নির্দেশ দিবে'।

(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ; আলবানী, আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ৩।)

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীর কাছে গেলে স্বামী দাঁড়িয়ে যাবে এবং স্ত্রী তার পিছনে দাঁড়াবে। অতঃপর তারা একসঙ্গে দুই রাক'আত সালাত আদায় করবে এবং বলবে,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيَّ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مِنْهُمْ وَارْزُقْهُمْ مِنِّي، اللَّهُمَّ اجْمَعَ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ إِلَى خَيْرٍ، وَفَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ-

'হে আল্লাহ! আপনি আমার পরিবারে আমাকে বরকত দিন এবং আমার মধ্যে তাদের জান্য বরকত দিন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের থেকে আমাকে রিযিক দিন এবং আমার থেকে তাদেরকেও রিযিক দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের যতদিন একত্রে রাখেন কল্যাণেই একত্রে রাখুন। আর আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে কল্যাণের দিকেই বিচ্ছেদ ঘটান'।

(তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা/৮৯০০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/৭৫৪৭; সিলসিলাতুল)

ছ. সহবাস সম্পর্কিত কিছু করণীয় : সহবাসকালে কিছু করণীয় রয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য কর্তব্য।

(১) সহবাসকালে দো'আ পাঠ করা: সহবাসের সময় রাসূল (স:) নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করতে বলেছেন, بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ - مَا رَزَقْتَنَا

'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন তাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুন'।

(বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১, ৫১৬৫; মুসলিম হা/১৪৩৪; বুলুগুল মারাম হা/১০২০।)

এ দো'আ পাঠ করার পরে সহবাস করলে আল্লাহ যদি ঐ স্বামী-স্ত্রীকে কোন সন্তান দান করেন, তাহ'লে শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

(বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১; মুসলিম হা/১৪৩৪; মিশকাত হা/২৪১৬।)

সহবাসের ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্মুখভাগে যে দিক দিয়ে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ বলেন, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شم 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' (সূরা বাক্বারাহ, ২২৩)।

উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ মদীনায় এসে আনছার মহিলাদের বিবাহ করলেন। মুহাজির মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত। কিন্তু আনছার মহিলারা চিৎ হয়ে শয়ন করত না। একদা এক মুহাজির ব্যক্তি তার আনছার স্ত্রীকে এরূপ করার ইচ্ছা করলে সে রাসূল (স:)-কে জিজ্ঞেস না করে তা করতে অস্বীকৃতি জানাল। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, সে মহিলা রাসূল (স:)-এর নিকট আসল, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করল। তাই উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। অতঃপর نِسَاؤُكُمْ حَرْثَ ْ،لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّيْ شِئْتُم 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরূপ। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর' (সূরা বাক্বারাহ, ২২৩) আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসূল (স:) বললেন, না, শুধুমাত্র একই রাস্তায় সহবাস করা যাবে'। ১৪৬

(আহমাদ, ইরওয়া ৭/৬১; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৩০।)

অন্যত্র রাসূল (স:) বলেন, ِالْتِهَا مُقْبِلَةً، وَمُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ 'তার নিকটে আস, সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক দিয়ে, যদি তা লজ্জাস্থান হয়'।

(ত্বাবারাণী, কাবীর, ইরওয়া ৭/৬২; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৭।)
তিনি আরো বলেন,.. َأَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبْرَ وَالْحِيْضَةَ 'সামনে কর, পিছনে কর এবং পায়ুপথ ও ঋতুস্রাব থেকে বেঁচে থাক'।
(তিরমিযী হা/২৯৮০; মিশকাত হা/৩১৯১, সনদ হাসান।)

(২) নিষিদ্ধ স্থানে সহবাস না করা: স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করা নিষিদ্ধ। রাসূল (স:) বলেন, - لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে তার স্ত্রীর পায়ুপথে সহবাস করে'। ১৪৯
(ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; মিশকাত হা/৩৫৮৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৭৮-এর আলোচনা,দ্রঃ; ছহীহুল জামে' হা/৭৮০২।)
তিনি আরও বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي َأَدْبَارِهِن 'নিশ্চয়ই আল্লাহ হকের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করেন না। কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তোমরা মহিলাদের পায়ুপথে সহবাস কর না'।
(ইবনু মাজাহ হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৩১৯২; ছহীহাহ হা/৩৩৭৭।)
মহিলাদের পায়ুপথ ব্যবহার করাকে হারাম করা হয়েছে। রাসূল (স:) বলেছেন, إتيان ُالنِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ حَرَام , নারীদের পশ্চাৎদ্বারে সহবাস করা হরাম'।
(নাসাঈ, সুনানুল কুবরা; ছহীহাহ হা/৮৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১২৬।)

অন্যত্র তিনি বলেন- َإِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِن
'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের পায়ুপথ ব্যবহার করতে'।
(ছহীহুল জামে' হা/১৯২১।)

(৩) নিষিদ্ধ সময়ে সহবাস না করা: ঋতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আল্লাহ বলেন,
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
'আর লোকেরা তোমাকে প্রশ্ন করছে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। তুমি বল, ওটা হ'ল কষ্টদায়ক বস্তু। অতএব ঋতুকালে স্ত্রীসঙ্গ হ'তে বিরত থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর

নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন'

(সূরা বাক্বারাহ, ২২২)।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -সাথে কিংবা তার পায়ুপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ যে ব্যক্তি কোনো ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে কিংবা তার পায়ুপথে সঙ্গম করে অথবা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (স:)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করল'।

(ইবনু মাজাহ হা/৬৩৯; তিরমিযী হা/১৩৫; মিশকাত হা/৫৫১, হাদীছ ছহীহ।)

উল্লেখ্য, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু বৈধ। রাসূল (স:) বলেছেন, جَامِعُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ , তোমরা তাদের সাথে (তাদের হায়েয অবস্থায়) একই ঘরে অবস্থান ও অন্যান্য কাজ করতে পার শুধু সহবাস ছাড়া'।

(আবুদাউদ হা/২৫৮, ২১৬৫, সনদ ছহীহ।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের কেউ হায়েয অবস্থায় থাকলে আল্লাহর রাসূল (স:) তার সংস্পর্শে আসতে চাইলে তাকে হায়েযে শক্তভাবে কাপড় বাঁধার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে একান্ত সান্নিধ্যে আসতেন'।

(বুখারী হা/৩০২; মুসলিম হা/২৯৩।)

অন্য বর্ননায় আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا

'নবী করীম (স:) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উপর কাপড় রেখে তারপর করতেন'।

(আবুদাউদ হা/২৭২; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৬৩।)

স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র হ'লে এবং গোসলের মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন হ'লে তার সাথে সহবাস করা বৈধ।

আল্লাহ বলেন, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অতঃপর যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশ মতে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন'

(সূরা বাক্বারাহ, ২২২)।

ঋতুকালে স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফফারা দিতে হবে। নবী করীম (স:) এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, ِالَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يتصدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَار যে ব্যক্তি ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, সে যেন এক অথবা অর্ধ দীনার ছাদাকা করে'।

(আবুদাউদ হা/২৬৪; মুসনাদে আহমাদ হা/২১২১, সনদ ছহীহ।)

উল্লেখ্য যে, ১ ভরি সমান ১১.৬৬ গ্রাম। হাদীছে বর্ণিত এক দীনার সমান ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। আর অর্ধ দীনার সমান ২.১২৫ গ্রাম স্বর্ণ।

(৪) সহবাসের পর ওযু করা: সহবাসের পরে ঘুমাতে ও পানাহার করতে চাইলে কিংবা পুনরায় মিলিত হ'তে চাইলে মাঝে ওযু করা সুন্নাত।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّا

'তিন ব্যক্তির কাছে ফেরেশতা আসে না; কাফের ব্যক্তির লাশ, জাফরান ব্যবহারকারী এবং অপবিত্র ব্যক্তি যতক্ষণ না সে ওযু করে'।

(আবুদাউদ হা/৪১৮০; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৭৩, সনদ হাসান।)

আয়েশা (রা:) বলেন,

ِكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاة

নবী করীম (স:) যখন অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি লজ্জাস্থান ধুয়ে সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন'।

(বুখারী হা/২৮৮।)

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর বলেন, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) আল্লাহর রাসূল (স:)-কে বললেন, যদি রাতে কোন সময় তাঁর গোসল ফরয হয় (তখন কী করতে হবে?) রাসূলুল্লাহ (স:) তাঁকে বললেন, ওযু করবে, লজ্জাস্থান ধুয়ে নিবে তারপর ঘুমাবে'।১৬০

(বুখারী হা/২৯০; মুসলিম হা/৩০৬; মিশকাত হা/৪৫২।)

অন্যত্র তিনি বলেন, نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِّيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاء 'হ্যাঁ সে যেন ওযু করে। অতঃপর সে যেন ঘুমায় এবং যখন চাইবে গোসল করবে'।
(মুসলিম হা/৩০৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।)
তিনি আরো বলেন, نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ اللَّه
যদি সে চায় ওযু করবে'। (ইবনু হিব্বান হা/১২১৬; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪২।)

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সহবাসের পরে ওযু করা আবশ্যক নয় বরং মুস্তাহাব।
যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاء. রাসূল (স:) কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই নাপাক অবস্থায় ঘুমাতেন'। (আবুদাউদ হা/২৮৮; তিরমিযী হা/১১৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/৫৮৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।)

উল্লেখ্য, ওযূর পরিবর্তে তায়াম্মুম করাও যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, كان رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَو تَيَمَّم 'রাসূলুল্লাহ (স:) যখন অপবিত্র হ'তেন এবং ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন ওযু করতেন বা তায়াম্মুম করতেন'। ১৬৪ (বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৯৬৮; আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৪৫।)

(৫) ঘুমের পূর্বে অপবিত্রতার গোসল করা উত্তম : নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জানাবাতের পরে গোসল করা উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন কায়েস বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (স:) অপবিত্র অবস্থায় কিরূপ করতেন? তিনি কি ঘুমের পূর্বে গোসল করতেন, না গোসলের পূর্বে ঘুমাতেন? আয়েশা (রাঃ) বলেন, كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.
'তিনি উভয়টি করতেন। কখনো গোসল করে ঘুমাতেন, আবার কখনো ওযু করে ঘুমাতেন। আমি বললাম, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি কর্মে প্রশস্ততা দান করেছেন'।
(মুসলিম হা/৩০৭, 'অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়েয' অনুচ্ছেদ: আবুদাউদ হা/১২৯১। তিরমিযী হা/৪৪৯।)

অন্য হাদীছে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذه فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلا تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا؟ قَالَ: هَذَا أَزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطيب.

'একদা নবী করীম (স:) তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন। তিনি এর কাছে গোসল করলেন এবং ওর কাছেও গোসল করলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাকে একটি গোসলে পরিণত করতে পারলেন না? তিনি বললেন, এটা অধিকতর পরিচ্ছন্ন, অতি উত্তম ও সর্বাধিক পবিত্রতা'।

(আবুদাউদ হা/২১৯: মিশকাত হা/৪৭০, সনদ হাসান।)

(৬) স্বামী-স্ত্রী এক সাথে গোসল করা : স্বামী-স্ত্রীর একস্থানে একত্রে গোসল করা বৈধ। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كُنتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي، دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَان.

'আমি ও আল্লাহর রাসূল (স:) উভয়েই একই পাত্র থেকে গোসল করতাম। তখন তিনি আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। এমনকি আমি বলতাম, আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, উভয়েই অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন'।

(মুসলিম হা/৩২১। মিশকাত হা/৪৪০।)

বাসর পরবর্তী সকালে করণীয়:

ওয়ালীমা করা: বাসর পরবর্তী সকালে বরের অন্যতম কর্তব্য হ'ল ওয়ালীমা করা। এটা সুন্নাত। আলী (রাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহের পয়গাম পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স:) বললেন, إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ من وليمة 'অবশ্যই নববধূর জন্য ওয়ালীমা হ'তে হবে'। (আহমাদ হা/২৩০৮৫: ছহীহুল জামে' হা/২৪১৯: আদাবুয যিফাফ, মাসআলা নং ২৪।)

ওয়ালীমার মাধ্যমে বিবাহের কথা সকলের মাঝে প্রচার হয়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, ما أولَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاة রাসূল (স:) স্বীয় স্ত্রী যয়নাবের বিবাহে যেভাবে ওয়ালীমা করেছিলেন, এরূপ ওয়ালীমা তিনি পরবর্তী কোন স্ত্রীর বিবাহে করেননি। তাতে তিনি একটি বকরী দিয়ে ওয়ালীমা করেছেন'। (বুখারী হা/৫১৬৮। মুসলিম হা/২৫৬৯: মিশকাত হা/৩২১১)

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (স:) যেদিন যয়নাব (রাঃ)-এর সাথে বাসর রাত উদযাপন করলেন, সেদিন ওয়ালীমার ব্যবস্থা করলেন এবং মুসলিমদেরকে তৃপ্তি সহকারে রুটি ও গোশত খাওয়ালেন। অতঃপর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের প্রতি সালাম করে তাদের জন্য দো'আ করলেন। আর তারাও তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁর জন্য দো'আ করলেন। রাসূল (স:) তাঁর বাসর রাতের সকালে এরূপ করতেন'। (বুখারী হা/৫১৫৪।)

ওয়ালীমা কয় দিন করা যাবে:

বাসর পরিবর্তী তিন দিন ওয়ালীমা করা যায়।

আনাস (রাঃ) বলেন, تزوج النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ آيام

'নবী করীম (স:) ছাফিয়া (রাঃ)-কে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ তার মোহর নির্ধারণ করলেন, তিন দিন ওয়ালীমা খাওয়ালেন'।

(মুসনাদ আবু ইয়া'লা, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৭৪।)

ওয়ালীমা সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়_

(১) সমাজে ওয়ালীমার নামে বড় লোকদের মিলন মেলা বসে, যেখানে বরের বা অভিভাবকদের লক্ষ্য থাকে উপহারের দিকে। ঐসব অনুষ্ঠান থেকে দরিদ্র লোকজন বঞ্চিত হয়। অথচ ওয়ালীমার দাওয়াতে উপহার আদান-প্রদান রাসূলের সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হ'ল সৎ ব্যক্তিগণকে দাওয়াত দেওয়া। তারা দাওয়াত গ্রহণ করে ওয়ালীমাতে আসবেন ও নবদম্পতির মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। বেছে বেছে কেবল বড় লোকদের ওয়ালীমায় দাওয়াত দেওয়া হলে ঐ খাদ্যকে রাসূল (স:) নিকৃষ্ট বলেন, شر الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَه

'খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওয়ালীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয় এবং দরিদ্রদেরকে ত্যাগ করা হয়। আর ওয়ালীমার দাওয়াত যে কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করল'।

(বুখারী হা/৫১৭৭, মুসলিম হা/১৪৩২।)

(২) ওয়ালীমার দাওয়াত দিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। রাসূল (স:) বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا 'তোমাদের কাউকে ওয়ালীমার দাওয়াত করা হ'লে সে যেন তাতে অংশগ্রহণ করে'।

(বুখারী হা/৫১৭৩, মুসলিম হা/১৪২৯।)

(৩) ওয়ালীমা অনুষ্ঠান বাস্তবায়নের জন্য লোকেরা সাহায্য করতে পারে। আনাস (রাঃ) নবী করীম (স:)-এর স্ত্রী ছাফিয়া (রাঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলেন, যখন রাসূল রাস্তায় ছিলেন উম্মে সুলাইম ছাফিয়াকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করলেন অর্থাৎ সাজালেন এবং তাঁকে রাতে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নবী করীম (স:) বাসর ঘরেই সকাল করলেন। এরপর তিনি বললেন, যার কাছে যে খাবার আছে সে যেন তা নিয়ে আসে। অপর বর্ণনায় আছে, যার কাছে অতরিক্ত খাবার আছে সে যেন তা আমাদের নিকটে নিয়ে আসে। আনাস (রাঃ) বলেন, তিনি একটি দস্তরখান বিছালেন। তখন কেউ পনির নিয়ে আসল, কেউ খেজুর নিয়ে আসল, আবার কেউ ঘি নিয়ে আসল। সবকিছু দিয়ে তারা হাইস (খাদ্য বিশেষ) তৈরী করলেন। তারা (আমন্ত্রিত লোকেরা) হাইস খেতে লাগলেন এবং তাদের পাশের বৃষ্টির পানি হাউজ থেকে পান করতে লাগলেন। আর এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স:)-এর ওয়ালীমা।

(বুখারী হা/৩৭১; মুসলিম হা/১৩৬৫; নাসাঈ হা/৩৩৮০।)

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের জন্য কেউ সহযোগিতা করতে পারে। তবে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে মানুষকে দাওয়াত দিয়ে সেখানে আমন্ত্রিত মেহমানদের নিকট থেকে উপহার-উপঢৌকন, টাকা-পয়সা গ্রহণ করা সমীচীন নয়।

বিবাহ পরবর্তী কিছু কু-প্রথা

১. বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বরকে দাড় করিয়ে সালাম দেওয়ানোর প্রথা রাসূল (স:) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়।

২. বর ও কনের মুরুব্বীদের কদমবুসি করা একটি কু-প্রথা। কেবল বিয়ে নয়; যে কোন সময় কদমবুসি করা রাসূল (স:) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে হিন্দুয়ানী প্রণামকে প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা মুমিনদের জন্য কাম্য নয়।

৩. বরকে কনের আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার নাম করে মাহরাম ও গায়ের মাহরাম সকল মহিলাদের সাথে পর্দা বিহীন সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া শরী'আত বিরোধী কাজ।

৪. নববধূকে পুরুষ-মহিলা সকলে দেখা ও উপহার-উপঢৌকন দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়।

৫. বরের সাথে প্রাপ্ত বয়স্কা শ্যালিকাদের ও কনের ভাবীদের হাসি-তামাশা করা হারাম। তেমনি নববধূকে বরের বাড়ীতে নিয়ে আসার পর দেবরদের ঠাট্টা-তামাশা ও নানা অশালীন আচরণও হারাম।

৬. সমাজে বিবাহোত্তর ওয়ালীমা না করে বিবাহের অনেক দিন পরে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সন্তান জন্মের পরও বউ তুলে আনার রেওয়াজ দেখা যায়। আর এ উপলক্ষে কনের পিতার বাড়ীতে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এটা অপচয় ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান। শরী'আতে এরূপ অনুষ্ঠানের কোন নযীর পাওয়া যায় না।

■ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য :

১. পরিবারে ইসলামী অনুশাসন বজায় রাখা: পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন না থাকলে সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা এগুলো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ-সংশয়, অমিল-অশান্তি বাসা বেঁধে পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। বিশেষ করে বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। স্যাটেলাইটে প্রদর্শিত উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আমাদের পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। যেনা-ব্যভিচার, গুম-হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে উলঙ্গপনার ছাপ। বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি এখন আমাদের দেশেও চালু হ'তে শুরু করেছে। এগুলো বিজাতীয় কালচার। এর কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সেকারণ আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পরিবার থেকেই সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আদব-কায়েদা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়সে ছালাতের শিক্ষা, দশ বছর বয়সে ছালাত না পড়লে শাস্তি দেওয়া',

(আবুদাউদ হা/৪৯৫: মিশকাত হা/৫৭২। ছহীহুল জামে' হা/৫৮৬৮, সনদ ছহীহ।)
কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির প্রতি অধিক তাকীদ দিতে হবে।
পরিবারকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (স:) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبا، 'তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।
(আহমাদ, মিশকাত হা/৬১; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৭০; ইওরয়া হা/২০২৬, সনদ ছহীহ।)

২. হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা: হাসিমুখে থাকা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত।
(তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, সনদ ছহীহ।)
তাই গোমড়ামুখে থাকা সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও ছাদাক্বা। এজন্য স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (স:) বলেন,لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْق ،
কোন কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়'। (মুসলিম হা/২৬২৬; ছহীহুল জামে' হা/৭২৪৫।)
তিনি আরও বলেন,
وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوف
ভালো কাজে অজ্ঞতা প্রদর্শন করো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত।
(আবুদাউদ হা/৪০৮৪; মিশকাত হা/১৯১৮, সনদ ছহীহ।)
অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَة 'উত্তম কথা ছাদাক্বা'।
(বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।)

৩. উত্তম ব্যবহার করা: উত্তম ব্যবহার দিয়ে অন্যকে জয় করা যায়, তার হৃদয়ে আসন করে নেওয়া যায়। এমনকি শত্রুকেও বশে আনা যায়।
আল্লাহ বলেন, ولا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ - وَلَيٌّ حَمِيم '

‘আর ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু' (সূরা হা-মীম সাজদাহ, ৩৪)।

তাই স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও আন্তরিক আচার-আচরণ করতে হবে। কেননা সে তার সকল স্বজন ছেড়ে কেবল স্বামীর কাছে আসে।

আল্লাহ বলেন, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْراً كثيرا '

‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপসন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন'

(সূরা নিসা, ১৯)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, طَيِّبُوْا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ وَحَسِّنُوا أَفْعَالَكُمْ ، وَهَيِّئُوْا أَنْفُسَكُمْ بِحَسَبِ قُدْرَتِكُمْ، كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا،

'তোমরা তাদের সাথে সুন্দর কথা বল। তাদের জন্য সাধ্যমত তোমাদের আচার ও আকৃতিকে সুন্দর কর, যেমন তোমরা তাদের থেকে পছন্দ কর'।

(তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৪২ পৃঃ।)

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভাল ধারণা পোষণের জন্য রাসূল (স:) ছাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন, لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপছন্দ হ'লে অন্য কোন আচরণ পছন্দ হবেই'।

(মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়।)

তিনি আরো বলেন, هِيَ لَكَ عَلَى أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهَا 'সে তোমার নিকটে তোমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকারী'। (তাবারানী, ছহীহাহ হা/১৬৬।)

৪. স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা: অবসরে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা, তার মনের কথা জানা-বুঝা, তার কোন চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর জন্য যরূরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى { سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِلَّا اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ.

'নবী করীম (স:) যখন (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের ছালাতের জন্য মুওয়াযযিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন'।

(বুখারী হা/১১৬১।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.

'রাসূল (স:) যখন শেষ রাতে সালাত শেষ করতেন, তখন লক্ষ্য করতেন। আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে জাগাতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়তেন। অবশেষে মুওয়াযযিন এসে যখন ফজরের সালাতের জন্য তাঁকে ডাকতেন, তখন তিনি উঠে হালকা করে দু'রাক'আত সালাত পড়ে ফরয সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।

(আবুদাউদ হা/১২৬২; মিশকাত হা/১১৮৯, সনদ ছহীহ।)

৫. স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হওয়া: স্বামীদের করণীয় হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা। কেননা অপরিচ্ছন্ন থাকা ও অপরিষ্কার পোশাক পরিধান করা স্ত্রীরা পছন্দ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي، كَمَا أُحِبُّ أن تَتَزَيَّنَ لي - 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হ'তে ঐরূপ পছন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পছন্দ করি'।

(তাফসীর কুরতুবী, ৫/৯৭; তাফসীরে ত্বাবারী ৪/৫৩২।)

৬. বাড়ীতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া: সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ী থেকে বের হ'তে ও বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীর অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (স:) আমাকে বললেন,

يا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।

(তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০৮; তারাজু'আত হা/২৫৯; ইরওয়া হা/২০৪১, সনদ হাসান।)

তিনি আরো বলেন,

ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ ضَامِن على الله.

'তিন ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযিক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায়'।

(ছহীহ ইবুন হিব্বান, হা/৪৯৯; আবুদাউদ হা/২৪৯৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩২১, সনদ ছহীহ।)

৭. স্ত্রীর পরিবারকে সম্মান করা: স্ত্রীর পরিবারের লোকজনকে সম্মান করা স্বামীর জন্য যরূরী কর্তব্য। কেননা এতে তার মধ্যে স্বামীর প্রতি মহব্বত-ভালবাসা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে সে স্বামীর পরিবারের যাবতীয় কাজ যেমন সুচারুরূপে ও আন্তরিকতার সাথে করে থাকে, তেমনি তাদের মাঝে মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির পথ বন্ধ হ'তে সহায়তা করে।

৮. স্ত্রী অসুস্থ হ'লে তার সেবা-শুশ্রূষা করা: স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হ'লে সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওছমান (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূল (স:)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করীম (স:) তাঁকে বললেন, وَسَهْمَه .ُإِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا

'বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব ও গনীমতেরঅংশ তুমি পাবে'।

(বুখারী হা/৩১৩০, ৩৬৯৮।)

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (স:) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান, ডান হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেন এবং বলেন,

أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شَفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا-

'কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।

(বুখারী হা/৫৭৫০; মুসিলম হা/২১৯১; মিশকাত হা/১৫৩০।)

মানুষ অসুস্থ হ'লে সে আপনজনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য কামনা করে। তাই স্ত্রীর অসুস্থতায় সাধ্যমত তার পাশে থাকা, তার সেবা করা এবং তার জন্য দো'আ করা স্বামীর জন্য করণীয়।

৯. স্ত্রীকে সহযোগিতা করা: স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। বিশেষত সে অসুস্থ হ'লে বা তার পক্ষে কোন কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা যরূরী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاة 'তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন সালাতের সময় হ'ত তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'। (বুখারী হা/৬৭৬।)

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ يَفْلِى ثَوْبَهُ وَيَحْلُبُ شَاتَهُ وَيَخْدُمُ نَفْسَه 'তিনি মানুষের মধ্যেকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় কাপড় সেলাই করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন'।

(আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১; তিরমিযী হা/৩৪৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৯৬।)

অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন, كَانَ يَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِم. তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, স্বীয় জুতায় তালি লাগাতেন এবং অন্যান্য পুরুষের ন্যায় বাড়ীর কাজ করতেন'।

(আহমাদ হা/২৪৩৮২; ছহীহুল জামে' হা/৪৯৩৭।)

১০. স্ত্রীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করা ও তার থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্য ধারণ করা: স্ত্রীদের সাথে ভাল আচরণ করা প্রত্যেক স্বামীর জন্য করণীয়। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেওয়া এবং তারা কষ্ট দিলে তাতে ধৈর্য ধারণ করা কর্তব্য।

রাসূল (স:) বলেন, لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخر. 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপছন্দ হ'লে অন্য কোন আচরণ পছন্দ হবেই'।

(মুসলিম হা/১৪৬৯; মিশকাত হা/৩২৪০, 'বিবাহ' অধ্যায়।)

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضلع , تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا

নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।

(আহমাদ হা/২০১০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৪৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯২৬।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خيرا-

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অন্যথা চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি সদুপদেশ প্রদান কর। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারী সৃজিত হয়েছে এবং পাঁজরের সর্বাধিক বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে স্বীয় অবস্থায় রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদুপদেশ দান কর'। (মুসলিম হা/১৪৬৮।)

১১. স্ত্রীর প্রতি সুধারণা পোষণ করা: স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা স্বামীর উচিত নয়। কারণ স্ত্রীকে সন্দেহ করলে দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। আর সুখী-সুন্দর দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিশ্বস্ততা, আমানতদারিতা, সততা-সত্যবাদিতা, আন্ত রিকতা, অনাবিল প্রেম, অকৃত্রিম ভালবাসা, নম্রতা, সুস্মিত ব্যবহার ও বাক্যালাপ, একে অপরের উপকার স্বীকার করা ইত্যাদি গুণ উভয়ের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আর সন্দেহ এসব কিছুকে ধবংস করে ফেলে। কারণ সন্দেহ এমন জিনিস যার সূক্ষ্মতম শিকড় একবার মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে গেলে যতক্ষণ না তাকে উপড়ে ফেলা হয়, ততক্ষণ সে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করতে থাকে। এই সন্দেহ-সংশয়ের ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সংসার পরিণত হয় এক প্রকার জাহান্নামে। এরূপ সংসার স্থায়ী হয় না।

এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত বাণী প্রত্যেক স্বামীর মনে রাখা উচিত। তিনি বলেন,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের (পার্থিব ও পারলৌকিক বিষয়ের) শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো। অবশ্য (পাপ থেকে তওবা করলে ও পার্থিব অন্যায়ে) তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও তাহ'লে জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'

(সূরা তাগাবুন, ১৪)।

স্ত্রীকে অযথা সন্দেহ করা ঠিক নয়।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم

'হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ'

(সূরা হুজরাত, ১২)।

রসূল (স:) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث '

'তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা হতে বেঁচে থাক, কারণ মন্দ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা'।

(বুখারী হা/৫১৪৩, ৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।)

স্ত্রীদের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুমিনদের জন্য অবশ্য করণীয়।

যেমন আল্লহ বলেন, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا '

'যখন তোমরা এরূপ অপবাদ শুনলে তখন মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন তাদের নিজেদের মানুষদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করলে না'?

(সূরা নূর, ১২)।

১২. স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা: স্বামীর উপরে কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণ করা। রাসূল (স:) বলেন فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে'।

(বুখারী হা/১৯৭৫, ৫১৯৯; মিশকাত হা/২০৫৪।)

আবু দারদার হাদীছে আছে,
إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه ُ
'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হাকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর'।
(বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।)

১৩. স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা ও তাকে গুরুত্ব দেওয়া: স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাধ্যমে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কারো অবদান কম নয়। কাউকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ীর ভিতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যে কোন কাজে তার সাথে পরামর্শ করা ও সঠিক হ'লে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত।
আল্লাহ বলেন, ِوَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمر
'আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (সূরা আলে ইমরান ১৫৯)।
রাসূলুল্লাহ (স:) অহী নাযিলের পরে খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন।
(বুখারী হা/৪৯৫৩; মুসলিম হা/১৬০; মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল, অধ্যায়, অহীর সূচনা অনুচ্ছেদ)
এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।
(বুখারী হা/২৭৩২)

১৪. স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া: স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে।
রাসূল (স:) মালেক বিন হুওয়াইরিছ ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে
বলেন, ْارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوهُم
‘ তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও'।

(বুখারী হা/৬৩১; মুসলিম হা/৬৭৪।)
সুতরাং স্ত্রীকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়, ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ, ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যরূরী। এজন্য নিজ বাড়ীতে সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের ব্যবস্থা করা উচিত। নিজে তা করতে না পারলে যেখানে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত।

১৫. স্ত্রীকে তার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া: স্ত্রীকে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া উচিত। আর এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নিজে সাথে নিয়ে যাওয়া বা মাহরাম ব্যক্তিকে সাথে দিয়ে পাঠাতে হবে। ইফকের ঘটনাকালে আয়েশা (রাঃ) অসুস্থ হ'লে তিনি পিতার বাড়ীতে গমনের জন্য রাসূলের কাছে অনুমতি চান। রাসূল (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলে তিনি পিতৃগৃহে চলে যান।
(বুখারী হা/২৬৬১, ৪১৪১; মুসলিম হা/২৭৭০; আহমাদ হা/২৫৬৬৪।)

১৬. স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া: প্রত্যেক স্বামীর জন্য কর্তব্য হ'ল স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী কাজের নির্দেশ দেওয়া। যাতে তারা তা যথাসাধ্য পালন করে।
আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا 'আর তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' (সূরা ত্ব-হা, ১৩২)।
রসূল (স:) স্বীয় স্ত্রীদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তথা ইবাদতের নির্দেশ দিতেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (স:) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বললেন,
سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ، يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ
'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কতইনা ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করেছেন এবং কতইনা ফিৎনা নাযিল হয়েছে! কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে? যেন তারা সালাত আদায় করে। এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, দুনিয়ার বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে'।
(বুখারী হা/৭০৬৯।)

১৭. বাড়ীতে ব্যতীত অন্যত্র স্ত্রীকে ছেড়ে না রাখা: অনেকে স্ত্রীকে বিভিন্ন কারণে অন্যত্র রাখে। কেউবা স্ত্রীর উপরে রাগ করে তাকে তার পিতার বাড়ীতে ফেলে রাখে। এটা

উচিত নয়। বরং তাকে শিক্ষার জন্য বিছানা পৃথক করে রাখার প্রয়োজন হ'লে সেটা নিজ বাড়ীতেই হ'তে হবে।

রাসূল (স:) বলেন, وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْت 'আর তাকে বাড়ীতে ছাড়া অন্যত্র ত্যাগ করবে না'।

(আবুদাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ হাসান ছহীহ।)

অর্থাৎ পৃথক রাখতে হ'লে ঘরে মধ্যেই রাখবে।

১৮. স্ত্রীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা: কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের সকলের সাথে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ আচরণ করা স্বামীর জন্য অতীব যরূরী।

রাসূল (স:) বলেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيْهِمْ وَمَا وَلُوْا-

'আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান। (ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ'।

(মুসলিম হা/১৮২৭; নাসাঈ হা/৫৩৭৯; মিশকাত হা/৩৬৯০।)

তিনি আরও বলেন,

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ سَاقِطٌ

'যে ব্যক্তির নিকট দু'জন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে ক্বিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।

(তিরমিযী হা/১১৪১; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৯; মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ।)

রসূল (স:) আরও বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شَقَّيْهِ مَائِل ٌ

'যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।

(নাসাঈ হা/৩৯৪২; ইরওয়া হা/২০১৭, সনদ ছহীহ।)

১৯. উপদেশ দেওয়া: বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে সদুপদেশ দেওয়া স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। বিশেষত তার কোন ভুল-ত্রুটি হ'লে তা সংশোধনের উপদেশ দেওয়া যরূরী।

বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (স:) বলেন,

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ

'তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহ'লে ভিন্ন কথা)'।

(তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।)

২০. প্রহার না করা: স্ত্রীদের বিনা কারণে বা তুচ্ছ কোন ঘটনায় প্রহার করা উচিত নয়। বরং তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। আর প্রহার করা রাসূলের আদর্শ নয়। নবী করীম (স:) কখনো তাঁর স্ত্রীগণকে প্রহার করেননি।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم -شَيْئًا قَطْ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً, وَلَا خَادِمًا'

রাসূলুল্লাহ (স:) নিজ হাতে কোন কিছুকে প্রহার করেননি। না তাঁর কোন স্ত্রীকে, না কোন খাদেমকে'।

(মুসলিম হা/২৩২৮; ইবনু মাজাহ হা/১৯৮৪।)

তিনি স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে অস্বাভাবিক প্রহার করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেন ,ۚيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِه

তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসের মত মারপিট করে। অতঃপর সম্ভবত ঐ দিনের শেষাংশেই সে আবার তার শয্যাসঙ্গী হয়'। ২১১

(বুখারী হা/৪৯৪২; মুসলিম হা/২৮৫৫; তিরমিযী হা/৩৩৪৩; মিশকাত হা/২৬৭৬।)

অন্যত্র বলেন,

لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم ۚ

'তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের মত প্রহার করো না। কেননা দিনের শেষে তার সঙ্গে তো মিলিত হবে'।

(বুখারী হা/৫২০৪; মিশকাত হা/৩২৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়।)

তিনি আরো বলেন, 'যারা এভাবে স্ত্রীদেরকে প্রহার করে তারা তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নয়'।
(আবুদাউদ হা/২১৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৩৬০; মিশকাত হা/৩২৬১, সনদ ছহীহ।)

২১. সাধ্যমতো মাঝেমাঝে হাদিয়া দেওয়া: ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক আইনে স্ত্রীর ভরণপোষণের (নফকা) পাশাপাশি সাধ্যানুযায়ী তাকে মাঝেমাঝে হাদিয়া বা উপহার দেওয়া একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং পুণ্যময় কাজ। এটি কেবল দাম্পত্য জীবনের মধুরতাই বাড়ায় না, বরং এর পেছনে গভীর ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে।
পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে এই অভ্যাসের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি

ইসলামে উপহার আদান-প্রদানকে অত্যন্ত উৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ এটি মানুষের মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে এবং ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"তোমরা একে অপরকে হাদিয়া (উপহার) দাও, এতে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।" (আল-আদাবুল মুফরাদ)
দাম্পত্য জীবনে এই হাদিসের প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। সাধ্যের মধ্যে ছোট কোনো উপহারও স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

২. এটি একটি উত্তম সদকা (পুণ্যের কাজ)

অনেকে মনে করেন দান-সদকা কেবল বাইরের অভাবী মানুষকে করতে হয়। কিন্তু ইসলাম অনুযায়ী, নিজের পরিবারের পেছনে সানন্দে খরচ করা এবং তাদের মুখে হাসি ফোটানো অন্যতম সেরা সদকা।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন মানুষ তার পরিবারের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যা খরচ করে, তা তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হয়।
- এমনকি সহীহ বুখারীর এক হাদিসে এসেছে, স্বামী ভালোবেসে স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দেয়, তাতেও সে সওয়াব লাভ করে।

৩. "সাধ্যমতো" দেওয়ার নির্দেশ

ইসলাম সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে বা কষ্ট করে বড় উপহার দেওয়ার বোঝা চাপায়নি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

"বিত্তবান নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে।" (সূরা আত-তালাক, আয়াত: ৭)
তাই উপহার দামি হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। স্ত্রীর পছন্দের ছোট কোনো খাবার, একটা বই, একটা জামা কিংবা দৈনন্দিন ব্যবহারের সাধারণ কোনো জিনিসও যদি মহব্বতের সাথে দেওয়া হয়, তবে তা হাদিয়ার মর্যাদা পায়।

৪. মানসিক প্রশান্তি ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা

ঘর হলো একজন মানুষের শান্তি অর্জনের মূল জায়গা। স্ত্রী যখন দেখেন স্বামী নিজের প্রয়োজনীয় খরচের বাইরেও তার খুশির জন্য আলাদাভাবে ভাবছেন, তখন তার মধ্যে এক ধরনের মানসিক নিরাপত্তা ও তৃপ্তি তৈরি হয়। এই মানসিক সন্তুষ্টি সংসারের ছোটখাটো ভুলত্রুটি বা মান-অভিমান দ্রুত দূর করতে সাহায্য করে।
হাদিয়া দেওয়ার জন্য সবসময় বিশেষ কোনো দিন বা উৎসবের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই। কোনো কারণ ছাড়াই হুট করে অফিস থেকে ফেরার পথে স্ত্রীর পছন্দের কোনো জিনিস নিয়ে আসা কিংবা সাধ্যমতো মাঝেমাঝে তাকে চমকে দেওয়া (Surprise) দাম্পত্য সম্পর্ককে সবসময় প্রাণবন্ত রাখে।
দাম্পত্য জীবনের অধিকার ও দায়িত্বের বাইরে গিয়ে এই "হাদিয়া" দেওয়ার মানসিকতা মূলত পারস্পরিক ইহসান বা অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ, যা একটি আদর্শ মুসলিম পরিবারের মূল ভিত্তি।

২২. মাঝেমধ্যে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া: ইসলামী ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্ত্রীর অধিকার রক্ষা এবং তার মানসিক প্রফুল্লতার জন্য মাঝেমাঝে তাকে বাইরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল এবং প্রশংসনীয় অভ্যাস। এটি কেবল বিনোদন নয়, বরং দাম্পত্য জীবনকে একঘেয়েমি থেকে রক্ষা করার এবং পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধির একটি দারুণ মাধ্যম।
পারিবারিক জীবনে স্ত্রীকে নিয়ে মাঝেমাঝে ঘুরতে যাওয়ার ধর্মীয়, মানসিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো:

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর স্ত্রীদের সাথে অত্যন্ত মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। তিনি কেবল ঘরের ভেতরেই নয়, বরং বাইরেও স্ত্রীদের সময় দিতেন এবং তাদের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত কাটাতেন।

- **আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা:** সহীহ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) এক সফরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন।
- **পাহাড়ের আড়ালে হাবশিদের খেলা দেখা:** মদিনায় যখন হাবশিরা খেলাধুলা বা শারীরিক কসরত প্রদর্শন করছিল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আয়েশা (রা.)-কে নিজের চাদর দিয়ে আড়াল করে সেই খেলা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যতক্ষণ না আয়েশা (রা.) নিজে থেকে তৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরেছেন।

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, স্ত্রীদের সাথে হালাল উপায়ে আনন্দ করা, তাদের নিয়ে বাইরে যাওয়া এবং তাদের বিনোদনের খেয়াল রাখা সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।

২. একঘেয়েমি ও মানসিক ক্লান্তি দূরীকরণ

একটি সুশৃঙ্খল সংসার চালাতে গিয়ে নারীদের প্রতিদিন ঘরের চার দেয়ালের মাঝে একই ধরনের রুটিন মাফিক কাজ করতে হয়। রান্না করা, ঘর গোছানো, সন্তানদের দেখাশোনা করা—এসবের কারণে তাদের ওপর এক ধরনের মানসিক চাপ ও একঘেয়েমি তৈরি হয়।

- স্বামীকে সাথে নিয়ে প্রকৃতির মাঝে বা একটু খোলা পরিবেশে ঘুরতে গেলে স্ত্রীর মানসিক ক্লান্তি দূর হয়।
- এটি তার মনকে সতেজ করে, যা পরবর্তীতে ঘরের কাজে এবং পরিবারের প্রতি যত্নশীল হতে তাকে নতুন শক্তি জোগায়।

৩. গভীর মনস্তাত্ত্বিক বন্ধন ও একান্তে আলাপচারিতা

ঘরে সাধারণত সংসারের নানা ঝামেলা, মেহমান বা বাচ্চাদের কারণে স্বামী-স্ত্রী নিজেদের জন্য আলাদাভাবে গুণগত সময় (Quality Time) কাটানোর সুযোগ পান না।

- বাইরে কোথাও ঘুরতে গেলে বা হাঁটতে বের হলে নিজেদের মধ্যে একান্তে কথা বলার সুযোগ তৈরি হয়।
- এটি একে অপরের চিন্তা, ভালো লাগা ও মন্দ লাগাগুলো নতুন করে বুঝতে সাহায্য করে, যা দাম্পত্য জীবনের বোঝাপড়াকে আরও মজবুত করে।

৪. নারীর অধিকার এবং উত্তম ব্যবহারের বহিঃপ্রকাশ

ইসলামে স্বামীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করার জন্য। কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে:

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তমভাবে জীবনযাপন করো।"
(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)

আর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"* স্ত্রীকে চার দেয়ালে বন্দী না রেখে তার মানসিক চাহিদার মূল্যায়ন করা এবং তাকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়া এই উত্তম আচরণেরই অংশ।

ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ:

- **নিরাপদ ও মার্জিত পরিবেশ:** ঘুরতে যাওয়ার জন্য এমন জায়গা নির্বাচন করা উচিত যেখানে শালীনতা বজায় থাকে এবং পর্দার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করা যায়। প্রকৃতির কাছাকাছি (যেমন: নদী, পাহাড়, পার্ক বা খোলামেলা কোনো জায়গা) যাওয়া মনের জন্য বেশি উপকারী।
- **সামর্থ্যের বিবেচনা:** হাদিয়ার মতোই ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বড় কোনো খরচের চাপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সাধ্যের মধ্যে বিকেলে কোথাও একটু হাঁটতে যাওয়া, কাছাকাছি কোনো ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়া অথবা একটু ফুচকা খাওয়াও স্ত্রীর মুখে বড় হাসি ফোটাতে পারে।

সংসারকে কেবল দায়িত্ব আর কর্তব্যের ফ্রেমে না বেঁধে, এর মধ্যে কিছুটা আনন্দ ও ভালোবাসার ছোঁয়া রাখা অত্যন্ত জরুরি। স্ত্রীকে মাঝেমাঝে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া সেই আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে বড় ভূমিকা রাখে।

■ স্বামীর নিকট স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার আছে, যেগুলি আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই অধিকারগুলো যথাযথভাবে প্রদান করলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী যেমন অনুগত হয়, তেমনি তার প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা-মহব্বত অটুট থাকে।

নিম্নে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আশ্রয় দান: স্ত্রীকে আশ্রয় দান করা স্বামীর জন্য আবশ্যক। যেখানে স্ত্রী থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে ও নিরাপদ ভাবে সেখানে তার আবাসনের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য করণীয়।

আল্লাহ বলেন, أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِن তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দিয়ো। তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না'

(সূরা তালাক্ব, ৬)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ - بفاحشة مبينة

'তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়' (সূরা তালাক্ব, ১)।

২. ভরণ-পোষণ: স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর।

আল্লাহ বলেন,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا ۔ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرا ً

''সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিযিক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন'। (সূরা তালাক্ব, ৭)।

তিনি আরো বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ - وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف

'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা'। (সূরা বাক্বারাহ, ২৩৩)।

হাকীম বিন মু'আবিয়া আল-কুশাইরী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল!

مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكتسَيْتَ أَوِ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْت.

'আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোষাক পরিধান করলে তাকেও পোষাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না। আর তাকে পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।

(আবুদাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯, সনদ ছহীহ।)

তিনি আরো বলেন, ِإِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِه
‘কাউকে যখন আল্লাহ কল্যাণ (সম্পদ) দান করেন তখন সে নিজের এবং তার পরিবারস্থ লোকজনকে দিয়ে (ব্যয়) শুরু করবে'।
(মুসলিম হা/১৮২২; মিশকাত হা/৩৩৪৩।)

কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে তাহ'লে সে পাপী হবে।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, ُكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْت،
কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক নষ্ট করে'।
(আবুদাউদ হা/১৬৯২: মিশকাত হা/৩৩৪৬, সনদ ছহীহ।)

অন্যত্র তিনি আরও বলেন, ُكَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَه
‘কোনো ব্যাক্তির পাপের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, যাদের খোরপোষ তার দায়িত্ব সে তাদের খোরাকী আটকিয়ে রাখবে'।
(মুসলিম হা/৯৯৬; মিশকাত হা/৩৩৪৬।)
এ ধরনের লোককে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন,
إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عن أهل بيته-
'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে তা সংরক্ষণ করেছে, না তাতে অবহেলা করেছে? এমনকি পুরুষকে তার স্ত্রী (পরিবার-পরিজন) সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন'।
(নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/৯১৭৪; ছহীহাহ হা/১৬৩৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৭৪।)
পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচকৃত অর্থের ফযীলত অনেক বেশী।
রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন, أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عياله
'উত্তম হ'ল ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে'।
(মুসলিম হা/৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৩২।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

دِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِيْنَارٌ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّيْنَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ،

'এক দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ কর। এক দীনার দরিদ্রদের জন্য, এক দীনার দাসমুক্তির জন্য এবং এক দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক ছওয়াব লাভ হয় ঐ দীনারে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর'।

(মুসনাদ হা/১০১৩২; মুসলিম হা/৯৯৫; মিশকাত হা/১৯৩১।)

আর পরিবারের জন্য খরচ করা অর্থ ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে।

রাসূল (স:) বলেন, إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ،يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَة

'কোন ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য পুণ্যের আশায় যখন ব্যয় করে তখন সেটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যায়'।

(বুখারী হা/৫৫।)

এমনকি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যে পানি পান করায় তার জন্যও তার নেকী রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স:) বলেন .. إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِر

'নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে পানি পান করায় তখন সে তার বিনিময়ে ছওয়াব পায়'।

(মুসনাদ হা/১০১৩২; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৯৬৩।)

স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান করবে।

রাসূল (স:) বলেন, وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِن

আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে'।

(তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।)

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজে এমন অনেক দায়িত্বহীন মানুষ আছে, যারা নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে ভাল ও মানসম্মত পোষাক কিনে দেয় না। অথচ নিজে মূল্যবান পোষাক পরিধান করে।

৩. স্ত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা: স্বামীর উপরে স্ত্রীর অন্যতম অধিকার হ'ল তার নিরাপত্তার সুব্যবস্থা করা, যাতে তার জান-মাল, ইয্যত-আব্রু, মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে এবং সে ঐ পরিবেশে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। সেই সাথে দ্বীনী যাবতীয় কর্মকাণ্ড

সুচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে। অনুরূপভাবে তাকে সকল প্রকার ফিৎনা থেকে রক্ষা করা। যেমন অসৎ মহিলাদের সাথে মেশার সুযোগ না দেওয়া, প্রেক্ষাগৃহে না নিয়ে যাওয়া, বাদ্য-বাজনা সম্বলিত অশ্লীল গান না শুনানো, তাকে বেপর্দা ও অর্ধ নগ্ন হয়ে চলতে বাধ্য না করা, গায়ের মাহরাম পুরুষ (দেবর-ভাসুর, বন্ধু-বান্ধব)-দের সাথে মিশতে বাধ্য না করা। তদ্রূপ তাকে কোন চাকুরী করতে বাধ্য না করা, যাতে সে পরপুরুষের সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিশতে বাধ্য হয়। আর এসবের মাধ্যমে নারীরা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। যার শেষ পরিণতি হচ্ছে বিচ্ছেদ।

৪. স্ত্রীকে পর্দার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া : ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী, স্ত্রীকে পর্দার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া স্বামীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। পরিবারে দ্বীনদারী ও শালীনতা বজায় রাখার জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা স্বামীর নৈতিক ও আইনি দায়িত্ব।

নিচে স্ত্রীকে পর্দার পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় ও মাধ্যম আলোচনা করা হলো:

১. পৃথক আবাসন বা ঘরের ব্যবস্থা করা

পর্দার পরিবেশ নিশ্চিত করার সবচেয়ে বড় এবং প্রাথমিক মাধ্যম হলো—সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীর জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা।

- ইসলামি শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী, স্বামীর সামর্থ্য থাকলে স্ত্রীর জন্য এমন একটি স্বাধীন কক্ষ বা ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করা উচিত, যেখানে দেবর, ভাসুর বা অন্য কোনো পরপুরুষের মুখোমুখি না হয়ে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারেন।
- যদি যৌথ পরিবারে থাকতে হয়, তবে স্ত্রীর থাকার ঘরটিতে যেন অনাত্মীয় পুরুষ হুট করে ঢুকে না পড়ে, সেদিকে কঠোর নজর রাখা এবং প্রাইভেসি নিশ্চিত করা।

২. দেবর, ভাসুর ও পরপুরুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা

যৌথ পরিবারে পর্দার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হয় দেবর ও ভাসুরদের ক্ষেত্রে। রাসুলুল্লাহ (সা.) দেবরকে 'মৃত্যু'র সাথে তুলনা করেছেন (সহিহ বুখারি), যা দ্বারা বোঝানো হয়েছে এক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা অনেক বেশি।

- ঘরে ভাই বা অন্য আত্মীয়রা থাকলে স্ত্রীকে আলাদা কক্ষে থাকার সুযোগ দেওয়া।
- ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়ার (ইস্তিজান) অভ্যাস তৈরি করা, যাতে স্ত্রী নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পান।

৩. ঘরোয়া কাজ ও কেনাকাটায় সহযোগিতা

অনেক সময় বাহ্যিক নানা প্রয়োজনে নারীদের বাইরে যেতে হয়, যা পর্দার পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায়।

- ঘরের বাইরের কাজ যেমন: কাঁচাবাজার করা, মুদি সদাই আনা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র স্বামী নিজেই বহন করা।
- কোনো কারণে স্ত্রীকে বাইরে যেতে হলে তাকে একা না ছেড়ে যথাসম্ভব স্বামী নিজে সাথে থাকা এবং নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা।

৪. দ্বীনি শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করা

পর্দা কেবল জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার বিষয় নয়, এটি মন থেকে মেনে নেওয়ার বিষয়।

- স্ত্রীকে পর্দার গুরুত্ব, ফজিলত এবং এর পেছনের হিকমত বা প্রজ্ঞা সম্পর্কে ভালোবাসা ও নম্রতার সাথে বোঝানো।
- ঘরে নিয়মিত দ্বীনি তালিম বা বই পড়ার পরিবেশ তৈরি করা, যেন তার মাঝে নিজে থেকেই পর্দার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।" (সূরা আত-তাহরীম: ৬)

স্বামীর দায়িত্ব কেবল স্ত্রীকে পর্দার আদেশ দেওয়া নয়, বরং এমন একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করা যেখানে স্ত্রী কোনো ধরনের মানসিক বা শারীরিক সংকীর্ণতা ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর এই বিধানটি পালন করতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামি পরিবার গঠনে স্ত্রীর বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ

■ স্ত্রীর বিবাহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ :

ইসলামী শরিয়তে একটি আদর্শ ও সুখী পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা অনন্য। বিয়ের পূর্বের প্রস্তুতি যেমন একজন নারীকে একটি নতুন জীবনের জন্য যোগ্য করে তোলে, তেমনি বিয়ের পরের দায়িত্ব পালন সেই জীবনকে সুখময় ও বরকতময় করে।
একজন মুসলিম নারীর বিবাহ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী করণীয় দায়িত্বসমূহ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

হবু স্ত্রীর বিবাহ পূর্ববর্তী করনীয় দায়িত্ব সমূহ :

একটি সফল, সুখী এবং বরকতময় দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয় বিয়ের পূর্বের মানসিক, আত্মিক ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি থেকেই। ইসলামে বিয়ে কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত। একজন হবু স্ত্রীর বিয়ের পূর্ববর্তী করনীয় দায়িত্ব ও প্রস্তুতিসমূহ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. মানসিক প্রস্তুতি ও নিয়ত পরিশুদ্ধ করা

যেকোনো নেক আমলের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। বিয়ে করার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাত পালন করা, নিজের দৃষ্টি ও চরিত্রকে হেফাজত করা এবং একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠন করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। বিয়েকে কেবল একটি সামাজিক প্রথা বা রোমান্টিক কল্পনার জগৎ না ভেবে, এটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা উচিত।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১)*

২. পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতাকে প্রাধান্য দেওয়া

বিয়ের ক্ষেত্রে একজন নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো সঠিক জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা। রূপ-লাবণ্য বা কেবল অর্থ-সম্পদ না দেখে, পুরুষের দ্বীনদারী ও ভালো চরিত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "তোমাদের কাছে যদি এমন কোনো পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করো। যদি তা না করো, তবে পৃথিবীতে ফিতনা (বিপর্যয়) ও ব্যাপক ফাসাদ সৃষ্টি হবে।" *(সুনান তিরমিজি, হাদিস নং ১০৮৪)*

৩. ইস্তেখারা করা

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মতো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করা সুন্নত। ইস্তেখারার মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সমস্ত কাজে ইস্তেখারা করার শিক্ষা দিতেন, যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ইচ্ছা করে, সে যেন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এবং (ইস্তেখারার) দুয়া করে। (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১১৬৬)

৪. ছেলের সাধ্যমত মোহর চাওয়া

মোহর নারীর একটি ন্যায্য অধিকার, যা সম্মানজনক ও সাধ্যের মধ্যে হওয়া উচিত। অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করে বরের পরিবারকে চাপের মুখে ফেলা ইসলামের শিক্ষা নয়। যে বিয়েতে খরচ ও ঝামেলা কম, সে বিয়েতে বরকত বেশি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর খুশি মনে দিয়ে দাও..." *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪)*

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হলো তা, যা সবচেয়ে সহজ ও কম খরচে সম্পন্ন হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৪৫২৯)*

৫. মুরুব্বিদের কাছ থেকে সাংসারিক বিষয়ে জ্ঞান নেওয়া

একটি নতুন পরিবারে গিয়ে কীভাবে মানিয়ে নিতে হবে, শাশুড়ি-শ্বশুর ও স্বামীর সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তা অভিজ্ঞ মুরুব্বি ও মা-বাবার কাছ থেকে শেখা একজন হবু স্ত্রীর অন্যতম ব্যবহারিক দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "যদি তোমরা নিজেরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের (অভিজ্ঞদের) জিজ্ঞেস করো।" *(সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৩)*

ঐতিহাসিক উদাহরণ: আরবের বিখ্যাত নারী আসমা বিনতে খারিজা ফাজারী তাঁর মেয়ের বিয়ের দিন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, *"মা! তুমি আজ তোমার চেনা*

পরিবেশ ছেড়ে এমন এক পরিবেশে যাচ্ছ যা তুমি চেনো না। তুমি তার (স্বামীর) জন্য জমিন হয়ে যাও, সে তোমার জন্য আসমান হয়ে যাবে।"

৬. সন্তান প্রতিপালন (প্যারেন্টিং) বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা

মা হওয়া একটি বিশাল দায়িত্ব। একটি সন্তানকে আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় জ্ঞান থাকা জরুরি, যা বিয়ের আগে থেকেই পড়াশোনার মাধ্যমে অর্জন করা উচিত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে এবং একজন নারী তার স্বামীর সংসার ও সন্তানের দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৫৫৪)*

৭. ঘরোয়া কাজকর্ম ও রান্নাবান্নায় পারদর্শী হওয়া

বাপের বাড়িতে থাকার সময়ই রান্নাবান্না, ঘর গুছানো এবং ঘরের টুকিটাকি কাজ শিখে নেওয়া উচিত। এতে নতুন সংসারে গিয়ে কোনো প্রকার বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় না।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে ঘরের ভেতরের সমস্ত কাজ (আটা পেষা, পানি আনা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া) নিজ হাতে করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আলী (রা.)-কে বাইরের কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। *(যাদুল মা'আদ)*

৮. ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস

ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব অপরিসীম। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যই পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকা সুন্নত, যা পারস্পরিক আকর্ষণ ও ভালোবাসা বজায় রাখে।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" *(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২২৩)*

৯. আত্মনির্ভরশীলতা বা হাতের কাজ শেখা

কোনো না কোনো হাতের কাজ (যেমন: সেলাই, হস্তশিল্প বা আধুনিক কোনো গঠনমূলক স্কিল) জানা থাকলে তা অবসর সময়কে সুন্দরভাবে কাটানোর পাশাপাশি প্রয়োজনে পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে বা মানসিকভাবে সাহায্য করতে ভূমিকা রাখে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম স্ত্রী যয়নব বিনতে জাহশ (রা.) নিজের হাতে চামড়া ট্যানিং ও সেলাইয়ের কাজ করতেন এবং তা থেকে উপার্জিত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করতেন। তাকে রাসুল (সা.) দীর্ঘহস্ত বা দানশীলা বলে প্রশংসা করেছিলেন। (সহীহ মুসলিম)

১০. মিতব্যয়ী ও অল্পে তুষ্ট হওয়ার মানসিকতা তৈরি

অপচয় করা শয়তানের কাজ। স্বামীর উপার্জনের ওপর ভিত্তি করে সংসার চালানো এবং অল্পে তুষ্ট থাকার মানসিকতা বিয়ের আগে থেকেই নিজের ভেতর গড়ে তুলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" *(সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৭)*

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী হয়, সে কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

১১. নেক দাম্পত্য জীবনের জন্য নিয়মিত দুয়া করা

একটি নেককার ও ভালোবাসাপূর্ণ পরিবারের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রতিনিয়ত দুয়া করা উচিত। কারণ আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো কিছুই সুন্দরভাবে সম্পন্ন সম্ভব নয়। কুরআনে একটি চমৎকার দুয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: "হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীদের (বা স্বামীদের) পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ স্বরূপ করুন।" *(সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৪)*

১২. ফরজ ইবাদতে নিখুঁত হওয়া ও নফলে অভ্যস্ত হওয়া

বিয়ের পর নতুন পরিবেশে এবং নতুন দায়িত্বের কারণে ইবাদতের রুটিনে কিছুটা পরিবর্তন আসতে পারে। তাই বিয়ের আগেই যদি ফরজ ইবাদতের প্রতি নিখুঁত যত্ন এবং নফল ইবাদতের (যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, নফল রোজা) অভ্যাস থাকে, তবে বিয়ের পরেও তা ধরে রাখা সহজ হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন তাকে বলা হবে: জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি প্রবেশ করো।" *(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪১৬৩)*

১৩. নৈতিক গুণাবলী (ধৈর্য ও রাগ নিয়ন্ত্রণ) অর্জনের চেষ্টা করা

ধৈর্য, নম্রতা, রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা এবং মিষ্টি ভাষা—এই গুণগুলো দাম্পত্য জীবনকে জান্নাতী সুখে রূপান্তর করে। অহংকার, হিংসা ও পরনিন্দা থেকে নিজেকে মুক্ত করার অভ্যাস বিয়ের আগেই করা হবু স্ত্রীর প্রধানতম দায়িত্ব।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৩৪)*

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ঈমানের দিক থেকে সেই মুমিন সবচেয়ে নিখুঁত, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" *(সুনান তিরমিজি, হাদিস নং ১১৬২)*

■ বিবাহ পরবর্তী স্ত্রীর করনীয় দায়িত্ব সমূহ

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। দাম্পত্য জীবনকে সুখময় ও বরকতময় করতে কুরআন ও হাদিসে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

যেমন -

১. ধৈর্যশীল হওয়া: দাম্পত্য জীবনের উত্থান-পতন এবং নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে ধৈর্যের (সবর) কোনো বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

(সূরা আল-বাকারা: ১৫৩)

একটি নতুন পরিবারে বিভিন্ন মানসিকতার মানুষের সাথে চলতে গেলে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় হাসিল করে দেন।

২. স্বামীর খারাপ ব্যবহারেও ধৈর্য ধারণ করা: মানুষ হিসেবে স্বামীর মেজাজ কখনো খারাপ হতে পারে বা সে ভুল করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর ধৈর্য ধারণ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে অন্য কারো সামনে সেজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে নারীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সেজদা করতে।"

(তিরমিজি, হাদিস: ১১৫৯)

স্বামীর অন্যায় আচরণে স্ত্রী যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে এবং নরম ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করে, তবে তা সংসারে শান্তি ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে

বিশেষ পুরস্কারের কারণ হয়। তবে স্বামী যদি শরিয়ত বিরোধী কাজ বা জুলুম করে, তবে শালীনভাবে তার প্রতিবাদ করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে।

৩. স্বামীর পরিবারের উত্তম সংরক্ষক হওয়া: স্ত্রীর একটি বড় দায়িত্ব হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ঘর, সম্পদ ও সম্মান রক্ষা করা। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: "সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগতা এবং আল্লাহর হেফাজতে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে (স্বামীদের অধিকার ও সম্পদ) হেফাজত করে।" (সূরা আন-নিসা: ৩৪)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নারী তার স্বামীর ঘর এবং সন্তানের অভিভাবক, সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী)

৪. দ্বীনহীন পরিবার হলেও নিজের পর্দাকে রক্ষা করা: শ্বশুরবাড়ি দ্বীনদার না হলেও একজন মুসলিম নারীর জন্য পর্দার বিধান শিথিল হয়ে যায় না। কারণ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েজ নেই।

- কুরআনের নির্দেশ: "তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..." (সূরা আন-নূর: ৩১)
- পরিস্থিতি যেমনই হোক, শালীন পোশাক ও পর্দার পরিধি বজায় রেখে শ্বশুরবাড়ির সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৫. শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে উত্তম ব্যবহার করা: ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা স্ত্রীর ওপর বাধ্যতামূলক (ফরজ) না হলেও, স্বামীর সন্তুষ্টি এবং পারিবারিক সৌহার্দ্যের জন্য তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিজি)
- বাবা-মায়ের সেবা করা স্বামীর ওপর ফরজ। স্ত্রী যদি এই কাজে স্বামীকে সহযোগিতা করে এবং শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি যত্নশীল হয়, তবে স্বামী তার প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত থাকে।

৬. শ্বশুরালয়ের অন্যান্যদের সাথে আচরণ (ননদ, দেবর, ভাসুর, জা): শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করা ইসলামি আখলাকের অংশ। তবে এখানে পর্দার বিধান কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

- **দেবর ও ভাসুর প্রসঙ্গে সতর্কতা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) দেবর/ভাসুরদের সাথে অবাধ মেলামেশার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, "দেবর বা ভাসুর হলো মৃত্যুসম (ভয়াবহ)।" (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫২৩২)। অর্থাৎ, তাদের থেকে পর্দা করা ফরজ।

- **ননদ ও জা:** তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।

৭. নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত: পারিবারিক পবিত্রতা ও বংশীয় মর্যাদা রক্ষায় এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

- পবিত্র কুরআনে সফল মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "এবং যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।" (সূরা আল-মুমিনুন: ৫)
- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজানের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তখন তাকে বলা হবে: জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি প্রবেশ করো।" (সহীহ ইবনে হিব্বান)

৮. স্বামীর গৃহের কাজ করা: ঐতিহাসিকভাবে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঘরের ভেতরের কাজ করা স্ত্রীর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘরের ভেতরের কাজের দায়িত্ব ফাতেমা (রা.)-কে এবং বাইরের কাজের দায়িত্ব আলী (রা.)-কে দিয়েছিলেন।
- ইসলামি ফিকহবিদদের মতে, সামাজিক প্রথা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ঘরের স্বাভাবিক কাজকর্ম (রান্না, ঘর গোছানো ইত্যাদি) করা স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব, যা দাম্পত্য জীবনে বরকত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

৯. স্বামীর রাগের সময় স্ত্রী বিনম্র হওয়া: আগুনে যেমন আগুন নেভানো যায় না, পানির প্রয়োজন হয়—তেমনি স্বামীর রাগের সময় স্ত্রীর বিনম্র আচরণ সংসারের বড় বড় ঝড় থামিয়ে দিতে পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) জান্নাতি নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

"তোমাদের জান্নাতি স্ত্রীরা হলো প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিনী এবং স্বামীর প্রতি অনুগত; যার স্বামী রাগান্বিত হলে সে তার হাতে হাত রেখে বলে—আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি চোখে ঘুম আনব না।" (সিলসিলাতুস সহীহাহ, হাদিস: ২৮৭)

ইসলামে বৈবাহিক জীবন পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী যখন এই দায়িত্বগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে পালন করবেন, তখন তা কেবল একটি সামাজিক দায়িত্ব থাকবে না, বরং তা ইবাদতে পরিণত হবে।

■ **স্ত্রীর নিকট স্বামীর হক:**

ইসলামি শরিয়তে দাম্পত্য জীবনকে সুশৃঙ্খল ও ভালোবাসাপূর্ণ করতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নিচে স্ত্রীর নিকট স্বামীর কিছু প্রধান হক তুলে ধরা হলো-

১. স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া: স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা উপস্থিতিতে তার ঘর এবং সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা স্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। স্বামী যাকে পছন্দ করেন না বা যার আগমনকে ক্ষতিকর মনে করেন, তাকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব।

- **হাদিসের দলিল:** বিদায় হজের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার হলো—তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে পদধূলি দিতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো এবং তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি না দেয় যার আগমন তোমরা পছন্দ করো না।" *(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১২১৮)*

এটি স্বামীর মালিকানা ও পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, স্ত্রী তার নিজের বাবা-মা বা মাহরাম আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, বরং সাধারণ সামাজিক যাতায়াত এবং অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

২. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল সিয়াম (রোজা) না রাখা: ফরজ ইবাদত (যেমন রমজানের রোজা) আল্লাহর নির্দেশ হওয়ায় এতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু নফল রোজা রাখার কারণে স্বামীর সাধারণ অধিকার বা দাম্পত্য চাহিদাতে যেন বিঘ্ন না ঘটে, সেজন্য স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক।

- **হাদিসের দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "কোনো নারীর জন্য তার স্বামীর উপস্থিতিতে **তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা হালাল (বৈধ) নয়** এবং তার অনুমতি ছাড়া তার ঘরে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও বৈধ নয়।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫১৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১০২৬)*

ইসলাম দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক সান্নিধ্য ও ভালোবাসাকে কতটা গুরুত্ব দেয়, এই বিধান তার প্রমাণ। নফল ইবাদতের চেয়ে স্বামীর অধিকার রক্ষা করাকে এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ির বাইরে না যাওয়া: পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে স্ত্রীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামীর সম্মতি থাকা আবশ্যক। ইসলামে পরিবারকে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে দেখা হয়, যেখানে স্বামী হলেন পরিচালক

- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন: "পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল (অভিভাবক), যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।" *(সূরা আন-নিসা: ৩৪)*
- ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, সে যেন তাকে বাধা না দেয়।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস: ৮৭৩)*

এই হাদিস থেকে ফিকহবিদগণ দলিল নেন যে, মসজিদে যাওয়ার মতো উত্তম কাজের জন্যও স্ত্রীর স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হয়, যা প্রমাণ করে সাধারণ প্রয়োজনে বাইরে যেতে অনুমতি নেওয়া কতটা জরুরি।

তবে জরুরি বা মৌলিক প্রয়োজনে (যেমন: অসুস্থতায় ডাক্তারের কাছে যাওয়া, দ্বীনের ফরজ জ্ঞান অর্জন করা বা জীবন বাঁচানোর তাগিদে) স্বামী যদি অন্যায়ভাবে বাধা দেয়, তবে শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে স্ত্রী বের হতে পারবেন।

৪. স্বামীকে সম্মান করা ও তার আনুগত্য করা: ইসলামি পারিবারিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো স্বামীর আনুগত্য করা (যতক্ষণ না তা আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল হয়)। স্বামীকে সম্মান করা এবং তার বৈধ আদেশ মেনে চলার মধ্যেই নারীর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত।

- পুণ্যবতী নারীদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন: "সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগতা এবং আল্লাহর হেফাজতে তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে (স্বামীদের অধিকার) হেফাজত করে।" *(সূরা আন-নিসা: ৩৪)*
- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমজান মাসের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য

করে, তখন তাকে বলা হবে: জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি প্রবেশ করো।" *(সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৪১৬৩)*

আনুগত্যের সীমা: এই আনুগত্য অন্ধ আনুগত্য নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।" *(মুসনাদে আহমাদ)*। অর্থাৎ, স্বামী যদি শরিয়ত বিরোধী কোনো কাজ করতে বলে, তবে তা মানা যাবে না। কিন্তু দুনিয়াবি ও বৈধ বৈবাহিক বিষয়ে স্বামীকে সম্মান ও আনুগত্য করা স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব।

ইসলামে স্বামীর এই অধিকারগুলো যেমন সুনির্দিষ্ট, তেমনি স্বামীর ওপরেও স্ত্রীর মোহরানা, ভরণপোষণ, বাসস্থান এবং তার সাথে সর্বোত্তম ও কোমল ব্যবহার করার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। উভয় পক্ষ যখন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, তখনই একটি সংসার জান্নাতের টুকরোয় পরিণত হয়।

■ উভয়ের (স্বামী - স্ত্রী) যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ইসলামি শরিয়তে বৈবাহিক জীবন কেবল দুটি মানুষের চুক্তি নয়, বরং এটি একটি আত্মিক ও সামাজিক ইবাদত। সংসারকে সুশৃঙ্খল, শান্তিময় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আদর্শ গড়ে তুলতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কিছু যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

নিচে কিছু বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হলো-

১. সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা: সন্তানদের মানসিক বিকাশ এবং দ্বীনি তরবিয়তের জন্য ঘরের পরিবেশ শান্ত রাখা পিতা-মাতা উভয়ের যৌথ দায়িত্ব। সন্তানদের সামনে ঝগড়া করলে তাদের মনে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায় এবং তারা মানসিক হীনম্মন্যতায় ভোগে।

- ইসলামে যেকোনো মুসলিমের গোপন ত্রুটি বা বিবাদকে আড়াল করার নির্দেশ রয়েছে, আর তা যদি নিজেদের সন্তানদের সামনে হয় তবে তার ক্ষতি আরও মারাত্মক। আল্লাহ বলেন, *"তোমরা নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহের কথা ভুলে যেও না।"* (সূরা আল-বাকারা: ২৩৭)।

মতবিরোধ হলে তা সন্তানদের আড়ালে নিজেদের ঘরে শালীনভাবে সমাধান করা উচিত।

২. যার দ্বীনদারী সন্তোষজনক নয় তাকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেওয়া: পারিবারিক দ্বীনি পরিবেশ ও আখলাক রক্ষা করার জন্য ঘরে কার যাতায়াত থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ

করা জরুরি। মন্দ বা ফাসেক (পাপাচারী) লোকের সংস্পর্শে পরিবারের সদস্যদের দ্বীনদারী নষ্ট হতে পারে।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তুমি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাবার যেন পরহেজগার (মুত্তাকী) লোকে খায়।"* (আবু দাউদ, হাদিস: ৪৮৩২)।

যৌথভাবে স্বামী-স্ত্রী এমন কোনো ব্যক্তিকে ঘরে প্রশ্রয় দেবেন না, যার দ্বারা পরিবারের সদস্যদের ঈমান, আমল বা চরিত্রের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৩. পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা ও সন্তানদের স্নেহ করা: দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তিই হলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া। একই সাথে সন্তানদের স্নেহ ও যত্নের মাধ্যমে বড় করে তোলা পিতা-মাতার যৌথ আমানত।

- আল্লাহ তাআলা বলেন, *"তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড় সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"* (সূরা আর-রুম: ২১)।
- সন্তানদের স্নেহের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"* (তিরমিজি)।

৪. নিন্দিত স্বভাব প্রতিহত করা: সংসারে বিভিন্ন নিন্দিত স্বভাব (যেমন: গিবত বা পরনিন্দা, অহংকার, খিটখিটে মেজাজ, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা বলা) ঢুকে পড়লে বরকত চলে যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব একে অপরকে এসব থেকে দূরে রাখা।

- এটি মূলত ইসলামের 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার' (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ)-এর অংশ।

আল্লাহ বলেন, *"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে।"*

(সূরা আত-তাওবা: ৭১)।

৫. সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা: ইসলামি শরিয়তে অর্থনৈতিকভাবে সংসারের ভরণপোষণের মূল দায়িত্ব স্বামীর (সূরা আন-নিসা: ৩৪)। তবে বর্তমান যুগে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা, গোছানো এবং ব্যবস্থাপনায় স্ত্রীর সহযোগিতা ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"পুরুষ তার পরিবারের অভিভাবক এবং সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের অভিভাবক এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"* (সহীহ বুখারী)।

অর্থাৎ, উপার্জন ও ব্যবস্থাপনায় উভয়ের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে।

৬. পরিবারে অসুস্থ সদস্যদের প্রতি এবং একে অপরের অসুস্থতায় খেয়াল রাখা ও জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা: অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এই সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো এবং সেবা করা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, বরং বড় ইবাদত। এর পাশাপাশি অসুস্থতার সময়ে নিজেদের শারীরিক ও জৈবিক চাহিদাকে সংযত বা নিয়ন্ত্রণ করা শরিয়তের নির্দেশ।

- **অসুস্থের সেবা:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমরা ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করো এবং বন্দীকে মুক্ত করো।"* (সহীহ বুখারী)।

স্বামী-স্ত্রী নিজেদের এবং পরিবারের (যেমন মা-বাবা বা সন্তান) অসুস্থতায় একে অপরকে সর্বোচ্চ ছাড় ও সেবা দেবেন।

- **চাহিদা নিয়ন্ত্রণ:** ইসলামে স্ত্রীর ঋতুস্রাব, সন্তান প্রসব-পরবর্তী সময় (নেফাস) কিংবা স্বামী-স্ত্রীর যেকোনো একজনের শারীরিক অসুস্থতার সময়ে সহবাস বা অতিরিক্ত শারীরিক চাপ সৃষ্টি করা হারাম বা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সময়ে ধৈর্য ধারণ করা ও পারিপার্শ্বিক শান্তি বজায় রাখা উভয়ের কর্তব্য।

৭. একে অপরের পছন্দের জিনিসগুলো শেয়ার করা এবং খাওয়ানো: একে অপরকে খাইয়ে দেওয়া এবং পছন্দের জিনিস উপহার দেওয়া বা শেয়ার করার মাধ্যমে দাম্পত্য ভালোবাসা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

- রাসুলুল্লাহ (সা.) সাদ ইবনে আবি ওক্কাস (রা.)-কে বলেছিলেন, *"তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছুই খরচ করো না কেন, তোমাকে তার সওয়াব দেওয়া হবে; এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দাও, তারও সওয়াব পাবে।"* (সহীহ বুখারী, হাদিস: ৫৬)।

৯. উভয়ের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক, হাদিয়া আদান-প্রদান, বিশ্বস্ততা ও পারিবারিক সময় কাটানো: বিবাহের মাধ্যমে কেবল দুটি মানুষের মিলন হয় না, বরং দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। তাই একে অপরের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ

নেওয়া, তাদের সম্মান করা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা ইসলামের অন্যতম বিধান 'সিলারেহম' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অন্তর্ভুক্ত।

- **হাদিয়া আদান-প্রদান:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"তোমরা একে অপরকে হাদিয়া (উপহার) দাও, এর ফলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।"* (আল-আদাবুল মুফরাদ)।

স্বামীর উচিত স্ত্রীর পরিবারকে এবং স্ত্রীর উচিত স্বামীর পরিবারকে সাধ্যানুযায়ী উপহার দেওয়া।

- **পারিবারিক সময় ও বিশ্বস্ততা:** পরিবারকে সময় দেওয়া উত্তম চরিত্রের লক্ষণ। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে তাঁর স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন, এমনকি আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। আর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ইসলাম কঠোর। শ্বশুরবাড়ির কোনো গোপন বিষয় বা ত্রুটি নিজের পরিবারের কাছে বা বাইরে প্রকাশ না করে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করা উভয়ের ওপর ফরজ।

সংসার জীবন একটি গাড়ির মতো, যার দুটি চাকা হলো স্বামী ও স্ত্রী। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন, *"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের পোশাক।"* (সূরা আল-বাকারা: ১৮৭)।

পোশাক যেমন মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং শীত-গরম থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যৌথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একে অপরের মর্যাদা রক্ষা করবেন এবং সংসারকে জান্নাতী সুখে ভরিয়ে তুলবেন।

পঞ্চম অধ্যায়: পারিবারিক সমস্যার কারণ ও সমাধান

■ পারিবারিক সমস্যার কারণ :

পরিবার সমাজের একক ও ভিত্তিভূমি। সুতরাং পরিবার সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালিত হলে সমাজ সুন্দর-সুশৃঙ্খল হয়। আর যদি পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। কারণ পরিবারের সদস্যরা সমাজের একেকটা অংশ। এজন্য ইসলাম পরিবার গঠন ও তাকে শক্তিশালী করণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন কারণে পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নিম্নে কতিপয় কারণ উল্লেখ করা হ'ল_

১. ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কাজ ও মন্দ স্বভাবের প্রসার: ইসলামী শরী'আত পরিপন্থী কার্যাবলী পারিবারিক শৃংখলাকে বিনষ্ট করে দেয়, সৃষ্টি করে অশান্তি। যেমন পরিবারের সদস্যরা ফরয ইবাদত তথা ছালাতে অভ্যস্ত নয়, শারঈ পর্দা মেনে চলে না, কাফির-মুশরিক ও বিধর্মী-বিজাতিদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতিনীতি অনুসরণ করে চলে। এসব ক্ষেত্রে পরিবার প্রধান সদস্যদের শাসন না করলে তারা আরো বেপরোয়া হয়ে যায়। তারা আরো স্বাধীনভাবে ও ব্যাপকহারে অনৈসলামী কাজ করতে থাকে। ফলে পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ বিনষ্ট হয়। শুরু হয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

২. স্ত্রী-সন্তানদের প্রহার করা: কথায় কথায় স্ত্রী-সন্তানদের শাস্তি দেওয়া, প্রহার করা পরিবারে অশান্তির কারণ। স্বামী বা পিতা নিজের নির্দেশ পালন ও কাজ-কাম দ্রুত সম্পন্নের ব্যাপারে স্ত্রী-সন্তানদের তাকীদ করা এবং তাদের কাজ-কর্ম পরিবার প্রধানের মনপুত না হ'লে বিভিন্ন শাস্তি দেওয়া ও প্রহার করায় পরিবারে কলহ সৃষ্টি হয়।

৩. অন্যের হক বিনষ্ট করা: স্ত্রী-সন্তান ও অন্যদের হক যথাযথ আদায় না করা, তাদের অধিকার হ্রাস করা ও যুলুম করা পরিবারে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। অনেক সময় স্বামী, পিতা বা বড় ভাই পরিবার প্রধান হয়ে অন্যদের হক আদায় করে না। কখনও অজ্ঞতাবশত, কখনও উদাসীনতায় এবং কখনও অন্যকে যব্দ করার হীন মানসিকতায়। এতে পরিবারে অশান্তি দানা বাঁধে।

৪. পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও কু-ধারণা: অবনতির কারণে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী ভিন্ন যাপন করে থাকে। এক স্থানে বসা, একত্রে খাবার গ্রহণ, আলোচনা ও পরামর্শ হয়ে ওঠে না। সেই সাথে একে অপরের প্রয়োজন অনুধাবনের চেষ্টা করে না। অনেক

ক্ষেত্রে পরস্পরের খোঁজ-খবরও রাখে না। আবার তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কু-ধারণাও তৈরী হয়। যা তাদের মধ্যে স্থায়ী মনোমালিন্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

৫. যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব: স্বামী বা পরিবার প্রধান কর্তৃক স্ত্রী-সন্তান ও অন্যান্যদের প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ না দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইসলাম বিরোধী স্বভাব অনুপ্রবেশ করে। গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি তাদের মানবিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে। তাই তাদের চরিত্র গঠন, ভুল সংশোধন ও মানবিক উন্নয়নের জন্য নছীহত ও শাসন উভয়ই বজায় রাখতে হবে।

৬. পরিবারের সদস্যদের মর্যাদা না দেওয়া: প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে। তাই তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা পরিবারের সদস্যদের কর্তব্য। কিন্তু পরিবার প্রধান তাদের মর্যাদা না বুঝলে এবং তাদের মর্যাদা না দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে অপমান-অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করলে তাদের মাঝে ক্ষোভের আগুন ধূমায়িত হয়। ফলে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সুখের সংসার হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ।

৭. অল্পে তুষ্ট না থাকা: মানুষ অল্পে তুষ্ট থাকে না। লোভ তার সীমাহীন। যত পায়, তত চায়। এ চাওয়া কখনও সম্পদের ক্ষেত্রে, কখনও মানসিক চাহিদার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, তা কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না। কারণ সম্পদের লোভ তাকে হারাম পথে অর্থ উপার্জনে প্ররোচিত করে। আবার প্রবৃত্তি তাকে অন্যায় পথে যেতে বাধ্য করে। যেমন মানুষ অনেক সময় নিজ স্ত্রী অপেক্ষা অন্যের স্ত্রীকে সুন্দরী ও উত্তম ভাবে। মনের পর্দায় তাকে কল্পনা করে। ফরে তার দিকে সে ঝুকে পড়ে। এতে পরকীয়ায় জড়ায় অনেকে।

৮. পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা: পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ। প্রবাসী স্বামী বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকে, কেউবা দেশের মধ্যেই কর্মসংস্থানের কারণে স্ত্রী থেকে দূরে থাকে। আবার অনেকে সারাদিন কর্মস্থলে থেকে অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরে অন্যের সাথে খোশ-গল্পে মত্ত হয়, কেউবা স্ত্রী-পরিজনকে সময় না দিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পর দিন এভাবে চলতে থাকলে এ থেকেই মনোমালিন্য ও অশান্তি শুরু হয়।

৯. আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা: আধুনিক যোগযোগ মাধ্যমসমূহ জীবনের গতি সঞ্চারিত করলেও পারিবারিক গতিকে অনেক সময় থামিয়ে দেয়। এগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে কল্যাণ আবার কোন ক্ষেত্রে অকল্যাণ বয়ে আনছে। বিশেষত পারিবারিক অশান্তির জন্য এসব জিনিস অনেকটাই দায়ী। বর্তমানে স্বামী কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে ফিরে টিভি,

মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ে, স্ত্রীর খোঁজও করে না। আবার স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে টিভি দেখা, মোবাইলে অন্যের সাথে আলাপচারিতা বা ফেসবুক ও ইন্টারনেটে অন্যের সাথে চ্যাটিং করায় ব্যস্ত থাকে। স্বামী কখন বাড়ী আসে, কি খায়, কি করে কোন খোঁজ রাখে না। স্বামীর খেদমত, সন্তান প্রতিপালন, পরিবারের কাজকর্মে ও বাড়ীর পরিচ্ছন্নতায় ভাটা পড়ে। শুরু হয় মান-অভিমান, মনোমালিন্য ও এক সময় চূড়ান্ত পরিণতি।

১০. দ্বীনদারী ও তাকওয়ার অভাব: পরিবারে অশান্তির সবচেয়ে বড় এবং মূল কারণ হলো আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার অনুপস্থিতি। স্বামী বা স্ত্রী যখন নিজেদের সৃষ্টি কর্তা এবং আখিরাতের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যায়, তখন তাদের মধ্যে অহংকার, স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা জন্ম নেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারী বা ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে বলেছেন। এর ব্যতিক্রম হলেই পরিবারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

১১. অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা: একটি পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব আদায়ের ওপর। বর্তমান সমাজে অনেক স্বামী বা স্ত্রী নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সোচ্চার, কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

- স্বামীর অবহেলা: স্ত্রীর খোরপোশ (নফকা), বাসস্থান ও মানসিক নিরাপত্তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করা।
- স্ত্রীর অবহেলা: স্বামীর বৈধ আনুগত্য না করা, সংসারের শৃঙ্খলা রক্ষা না করা এবং স্বামীর সম্পদ ও গৃহের আমানত রক্ষা না করা।

১২. অনিয়ন্ত্রিত রাগ ও জিহ্বার অপব্যবহার: অধিকাংশ পারিবারিক ঝগড়া শুরু হয় সামান্য কারণে, যা পরবর্তীতে হিংস্র রূপ নেয় কেবল মুখের ভাষার অসংযমতার কারণে। কটু কথা, গালিগালাজ, খোঁটা দেওয়া এবং একে অপরের পরিবারকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার কারণে বৈবাহিক সম্পর্কের মিষ্টতা ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মানুষকে উত্তম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৫৩)।

১৩. অর্থনৈতিক চাপ ও অপচয়: অর্থনৈতিক সংকট অনেক সময় মানসিক চাপ তৈরি করে, যা পরে পারিবারিক কলহে রূপ নেয়। তবে এর চেয়েও বড় সমস্যা হলো অসচ্ছলতা সত্ত্বেও অপচয় ও বিলাসিতার প্রতিযোগিতা। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যখন অতি-

ভোক্তাবাদী (Consumerist) মানসিকতা তৈরি হয় এবং তারা নিজেদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন সংসারে অশান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

১৪. পরকীয়া, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও পর্দার লঙ্ঘন: বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি) এবং অবাধ মেলামেশার কারণে পারিবারিক বিশ্বাসযোগ্যতা চরম হুমকিতে পড়েছে। পর্দার বিধান বা হিজাব লঙ্ঘন করার ফলে চোখের জিনা এবং মনের জিনা বাড়ছে, যা প্রকারান্তরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে (পরকীয়া) রূপ নিচ্ছে। স্বামী বা স্ত্রী যখন ঘরে জীবনসঙ্গীকে সময় না দিয়ে ভার্চুয়াল জগতে মত্ত থাকে, তখন পারস্পরিক দূরত্ব তৈরি হয়।

১৫. সন্দেহপ্রবণতা ও গুপ্তচরবৃত্তি (তাজাসসুস): একে অপরকে অন্ধভাবে সন্দেহ করা এবং সবসময় খুঁত খুঁজে বেড়ানো সম্পর্ক ধ্বংসের অন্যতম কারণ। মোবাইল চেক করা, ডায়েরি ঘাঁটা বা সবসময় জেরা করার মানসিকতা অপর পক্ষের মনে ক্ষোভের জন্ম দেয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট বলেছেন, "তোমরা একে অপরের গুপ্তচরবৃত্তি করো না।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)।

১৬. কড়া শাসন ও নমনীয়তার অভাব: পরিবার পরিচালনায় অতিরিক্ত কঠোরতা বা স্বৈরাচারী মনোভাব ক্ষতিকর। স্বামী যদি নিজেকে পরিবারের একমাত্র 'শাসক' মনে করে স্ত্রীর কোনো মতামত বা আবেগকে মূল্যায়ন না করে, তবে স্ত্রীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। একইভাবে স্ত্রী যদি একগুঁয়ে ও অবাধ্য আচরণ করে, তবে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়।

■ পারিবারিক সমস্যা সমাধানের উপায় :

পারিবারিক জীবনকে শান্তিময় ও সুন্দর করে তুলতে ইসলাম এবং মনোবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট কিছু বাস্তবসম্মত উপায়ের কথা বলা হয়েছে। একটি পরিবারে যখন দ্বীনদারি, পারস্পরিক সম্মান এবং সঠিক বোঝাপড়া থাকে, তখন বড় বড় ঝড়ও সহজে সামলে নেওয়া যায়।

কুরআন, হাদিস এবং সামাজিক বাস্তবতার আলোকে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায়গুলো নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হলো:

১. পরিবারে আল্লাহভীতি, দ্বীনি পরিবেশ ও ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থা করা: পরিবারে আল্লাহভীতি (তাকওয়া), দ্বীনি পরিবেশ এবং ইসলামি শিক্ষার ব্যবস্থা করা কেবল একটি

ভালো কাজই নয়, বরং এটি পরিবারের অভিভাবকের ওপর একটি বড় ফরজ দায়িত্ব। কারণ, পরিবার হলো একটি শিশুর প্রথম মাদ্রাসা এবং একটি সমাজের মূল ভিত্তি। আপনার পরিবারে কীভাবে একটি সুন্দর দ্বীনি ও ইসলামি পরিবেশ গড়ে তুলবেন_

ক.অভিভাবকের নিজের আমল ও রোল মডেল হওয়া: পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে সন্তানরা মুখের কথার চেয়ে চোখের দেখা থেকে বেশি শেখে। আপনি যদি নিজে আল্লাহকে ভয় করেন এবং দ্বীন মেনে চলেন, তবে পরিবারে তা আপনাআপনি ছড়িয়ে পড়বে।

- **অনুকরণীয় হওয়া:** নিজে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সঠিক সময়ে আদায় করুন, কুরআন তিলওয়াত করুন এবং সুন্নতি জীবনযাপন করুন। আপনাকে দেখে পরিবারের অন্যরা উদ্বুদ্ধ হবে।
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী:** *"তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী)*

খ.দৈনিক পারিবারিক 'তালীম' বা দ্বীনি আলোচনার মজলিস: পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো প্রতিদিন অন্তত ১৫-২০ মিনিটের একটি পারিবারিক তালীমের ব্যবস্থা করা।

- **কী করবেন:** এশার সালাতের পর বা সুবিধাজনক সময়ে পরিবারের সবাইকে (স্ত্রী, সন্তান, ভাই-বোন) নিয়ে একসাথে বসুন।
- **বই নির্বাচন:** নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিসের বই (যেমন: রিয়াদুস সলেহীন, মুনতাখাব হাদিস), সিরাহ বা ঈমান-আমল ও আখলাক সংশোধনের বই থেকে একজন রিডিং পড়বে এবং বাকিরা শুনবে। এর ফলে ঘরে সাকিনাহ (প্রশান্তি) এবং রহমতের ফেরেশতারা নাজিল হয়।

গ.জামাতে সালাত আদায়ের অভ্যাস করা: ঘরে সালাতের বা নামাজের একটি আবহ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

- **বাসায় জামাত:** পুরুষরা ফরয সালাত মসজিদে আদায় করার পর সুন্নাত ও নফল নামাজগুলো ঘরে এসে আদায় করতে পারেন। কোনো কারণে মসজিদে যেতে না পারলে বা নফল সালাতের ক্ষেত্রে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ঘরে জামাত কায়েম করুন।
- **তাহাজ্জুদের অভ্যাস:** মাঝে মাঝে গভীর রাতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ডেকে তাহাজ্জুদ ও দোয়ার অভ্যাস করতে পারেন, যা দাম্পত্য জীবনে বরকত আনে।

ঘ.ঘরে একটি 'ইসলামিক লাইব্রেরি' বা বুক কর্নার তৈরি করা: বই মানুষের চিন্তাভাবনা বদলে দেয়। ঘরের একটি নির্দিষ্ট কোণায় কিছু সুন্দর ও সহজবোধ্য ইসলামিক বইয়ের কালেকশন রাখুন।

- সীরাতুন্নবী (রাসূল সা.-এর জীবনী), সাহাবিদের জীবনী, ছোটদের ইসলামিক গল্পের বই, সহজ বাংলা অনুবাদসহ কুরআন এবং মাসনুন দোয়ার বই।
- সন্তান বা পরিবারের সদস্যরা যেন অবসর সময়ে মোবাইল না টিপে এই বইগুলো পড়ার অভ্যাস করে, সেই তাগিদ দিন।

ঙ. স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ ও হালাল বিনোদনের ব্যবস্থা: বর্তমান যুগে মোবাইল, টিভি এবং সোশ্যাল মিডিয়া ঘরের দ্বীনি পরিবেশ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ।

- কঠোরতা নয়, সচেতনতা: ঘরে গান-বাজনা, অশ্লীল সিনেমা বা বেপর্দা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। এর বিকল্প হিসেবে ইসলামিক নাশিদ (গজল), শিক্ষণীয় ইসলামিক কার্টুন বা ডকুমেন্টারি দেখার অভ্যাস করানো যেতে পারে।
- ডিজিটাল ডিটক্স: খাবার টেবিলে বা পারিবারিক আলোচনার সময় মোবাইল ফোন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রাখুন।

চ.সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই মখরাজ ও দ্বীনি বুনিয়াদ শেখানো: সন্তানদের মুখে যখন প্রথম ভাষা ফোটে, তখন থেকেই তাদের আল্লাহর নাম, কালিমা এবং ছোট ছোট মাসনুন দোয়া (যেমন: খাওয়ার পূর্বের দোয়া, ঘুমানোর দোয়া) শেখানো উচিত।

- শুদ্ধ কুরআন শিক্ষা: সন্তানদের জন্য ঘরে যোগ্য উস্তাদ বা শিক্ষকের মাধ্যমে সহীহ উচ্চারণ (মখরাজ ও তাজবীদ) সহকারে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।
- লজ্জা ও পর্দার শিক্ষা: সন্তান একটু বড় হলেই তাকে পোশাক-আশাকে শালীনতা ও পর্দার প্রাথমিক শিক্ষা দিন।

ছ. আল্লহভীতি বা তাকওয়া জাগ্রত করার কৌশল: তাকওয়া হলো গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা। পরিবারের সদস্যদের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিতে হবে যে, দুনিয়ার কেউ না দেখলেও আল্লাহ আমাদের দেখছেন।

- কোনো ভুল বা অন্যায় কাজ দেখলে সরাসরি বকাঝকা না করে নরম সুরে বলুন, *"আল্লাহ কিন্তু আমাদের দেখছেন, তিনি রাগ করবেন।"*
- কথায় কথায় আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অভ্যাস করুন (যেমন: ভালো খাবার খেলে, সুস্থ থাকলে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা)।

পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ তৈরি করতে গিয়ে কখনো অতিরিক্ত কঠোরতা বা জোর-জুলুম করবেন না। দ্বীন সুন্দর এবং সহজ। প্রিয় নবী (সা.) সবসময় নম্রতার মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করেছেন। পরিবারের কারো কোনো ত্রুটি দেখলে তা সবার সামনে ছোট না করে, গোপনে পরম মহব্বতের সাথে বুঝিয়ে বলুন। আপনার ভালোবাসা এবং ধৈর্যই একটি সাধারণ পরিবারকে জান্নাতি পরিবারে রূপান্তর করতে পারে।

২. ক্ষমা, ত্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা ও সংশোধন: মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে ছোটখাটো ভুলগুলোকে বড় করে না দেখে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখলে সংসার টিকে থাকে।

- আল্লহ বলেন,"যদি তোমরা তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করো এবং তাদেরকে মার্জনা করো, তবে জেনে রাখো যে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" *(সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৪)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো আচরণ সে অপছন্দ করে, তবে তার অন্য কোনো আচরণে সে সন্তুষ্ট হবে।" *(সহীহ মুসলিম)*

৩. সদস্যদের যথাযথ মর্যাদা ও প্রাপ্য হক প্রদান: পরিবারের প্রত্যেকের—বাবা-মা, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান—আলাদা হক বা অধিকার রয়েছে। এই হকগুলো ঠিকঠাক আদায় করলে পরিবারে কোনো অশান্তি থাকে না।

- আল্লহ বলেন, "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে, যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে তাদের ওপর।" *(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২৮)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যিনি তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম।" *(সুনানে তিরমিযী)*

৪. রাগ পরিহার ও ধৈর্য ধারণ করা: রাগ মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ করে দেয়। পারিবারিক কলহের অন্যতম প্রধান কারণ এই রাগ।

- আল্লহ বলেন, "যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৩৪)*

- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি তিনবার বললেন, "তুমি রাগ করো না।" *(সহীহ বুখারী)*। এছাড়া রাসূল (সা.) আরও বলেছেন, "রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন"—এই ভাবার্থটি রাসুলের এই বাণী সমর্থন করে: "সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দেয়, বরং সেই প্রকৃত শক্তিশালী যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" *(সহীহ বুখারী)*

৫. সকলের প্রতি সুধারণা পোষণ ও কুধারণা পরিহার: পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলার এক বিরাট হাতিয়ার হলো সকলের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং কুধারণা পরিহার করা। অধিকাংশ পারিবারিক কলহ, ভুল বোঝাবুঝি এবং সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয় মনের ভেতর জন্ম নেওয়া ছোট একটি কুধারণা বা সন্দেহ থেকে। ইসলাম এ বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে এবং মনকে পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর জোর দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে যেকোনো বিষয়ে ঢালাওভাবে বা অহেতুক ধারণা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন, কারণ অনেক ধারণাই গুনাহের পর্যায়ে পড়ে।

- আল্লহ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান বা ধারণা থেকে দূরে থাকো; কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না..." *(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২)*

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুধারণা কেবল একটি মানসিক চিন্তাই নয়, এটি মানুষকে অন্য তিনটি বড় গুনাহের দিকে টেনে নিয়ে যায়: ১. মনের ভেতর কুধারণা তৈরি হয়। ২. সেই কুধারণা সত্যি প্রমাণ করার জন্য মানুষ অন্যের দোষ বা গোপন বিষয় অনুসন্ধান (Spying) শুরু করে। 3. দোষ খুঁজে পাওয়ার পর তা অন্যের কাছে বলে গীবত বা পরনিন্দা করে। ইসলাম এই পুরো চক্রটিকে গোড়াতেই কেটে দিতে বলেছে।

রাগের মাথায় বা শয়তানের প্ররোচনায় কারো প্রতি হুট করে খারাপ ধারণা পোষণ করা ঈমানদারের শান নয়।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, কুধারণা হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

- কুধারণা মানুষের অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতায় ভরিয়ে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কে যদি একবার কুধারণা বা অহেতুক সন্দেহ ঢুকে পড়ে, তবে সেখানে আর ভালোবাসা অবশিষ্ট থাকে না।

কারো কোনো আচরণ বা কথা যদি প্রথম দৃষ্টিতে নেতিবাচকও মনে হয়, ইসলাম বলে তার কোনো ভালো ব্যাখ্যা বা ওজর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে। একেই বলে সুধারণা পোষণ করা।

- আল্লাহ তাআলা বলেন,"আমার বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে তেমনই আচরণ করি।" *(সহীহ বুখারী)*
- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলতেন: "তোমার ভাইয়ের মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কথার মন্দ অর্থ করো না, যতক্ষণ তুমি তার ভালো অর্থ বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পাও।"
- ইসলামি পণ্ডিতগণ বলতেন, কোনো ভাইয়ের কোনো আচরণে খটকা লাগলে তার পক্ষে অন্তত ৭০টি ওজর (কারণ) খোঁজো। যদি কোনো ওজর খুঁজে না পাও, তবে নিজেকে বলো— "হয়তো তার এমন কোনো গ্রহণযোগ্য কারণ আছে যা আমি জানি না।"

পারিবারিক জীবনে এই সুন্দর গুণটি চর্চা করার জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- **খোলামেলা যোগাযোগ (Clear Communication):** স্বামী, স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যের কোনো আচরণে যদি সন্দেহ বা খটকা তৈরি হয়, তবে তা মনে চেপে না রেখে বা আড়ালে গোয়েন্দাগিরি না করে, সরাসরি ও নম্রভাবে তার সাথে কথা বলুন। যেমন: "তুমি আজকে এই কাজটি করলে, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। একটু বুঝিয়ে বলবে?"
- **কানকথায় কান না দেওয়া:** অনেকেই সংসারে আগুন লাগানোর জন্য এসে বলতে পারে, "তোমার স্ত্রী তো অমুক কাজ করছিল" বা "তোমার স্বামী তো ওটা বলছিল"। এই ধরনের কথায় কান দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, কোনো ফাসেক ব্যক্তি খবর নিয়ে এলে তা যাচাই করতে (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ০৬)।
- **শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকা:** শয়তানের সবচেয়ে প্রিয় কাজ হলো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। যখনই মনে কারো প্রতি ক্ষোভ বা কুধারণা

আসবে, তখনই বুঝতে হবে এটি শয়তানের উসকানি। সাথে সাথে পড়তে হবে: *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম*।

- **গোপন বিষয় খোঁজা বন্ধ করা:** একে অপরের মোবাইল লুকিয়ে চেক করা, ডায়েরি পড়া বা সবসময় চোখে চোখে রাখা—এই স্বভাবগুলো কুধারণা বাড়িয়ে দেয়। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান বজায় রাখতে হবে।

সুধারণা মানুষকে মানসিকভাবে শান্ত রাখে এবং পরিবারে শান্তি আনে। আর কুধারণা নিজের মনের শান্তি কেড়ে নেয় এবং একটি সাজানো সংসারকে নরকে পরিণত করে। মনের আয়না পরিষ্কার রাখাই সুখী পরিবারের মূল চাবিকাঠি।

৬. পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শ (শূরা): পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শ (শূরা) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং কার্যকর মাধ্যম। একটি পরিবারে যখন একনায়কতন্ত্র বা একজনের একক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে সবার মতামতকে সম্মান দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্বের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ইসলামে 'শূরা' বা পারস্পরিক পরামর্শকে কেবল একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক নীতি হিসেবেই দেখা হয়নি, বরং এটিকে মুমিন জীবনের অন্যতম ভূষণ এবং পারিবারিক সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে পরামর্শকে উল্লেখ করেছেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে (যিনি ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত হতেন) সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

- মুমিনদের অন্যতম গুণ: "...এবং যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে এবং তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" *(সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৩৮)*

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা সালাত (নামাজ) ও ইনফাক (দান)-এর মতো বড় ইবাদতের পাশাপাশি 'পারস্পরিক পরামর্শ'-কে মুমিনের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- রাসূল (সা.)-কে আল্লাহর নির্দেশ: "...সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর

যখন তুমি কোনো সংকল্প করবে, তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো..." *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)*

যে পরিবারে 'শূরা' বা পারস্পরিক আলোচনার পরিবেশ থাকে, সেই পরিবারে স্বৈরতান্ত্রিক অহংকার থাকে না। অহংকার যেখানে থাকে না, সেখানে আল্লাহর রহমত ও প্রশান্তি (সাকিনাহ) বর্ষিত হয়।

৭. মুখ ও জিহ্বা সংযত রাখা: পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বজায় রাখা এবং বৈবাহিক সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মুখ ও জিহ্বা সংযত রাখা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সংসারের বড় বড় মারামারি বা বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় কোনো এক পক্ষের মুখের একটিমাত্র ধারালো, অসম্মানজনক বা কটু কথার মাধ্যমে।

ইসলামে জিহ্বা বা বাচনভঙ্গি নিয়ন্ত্রণের ওপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছে, তা অভাবনীয়।

একজন মুমিনের ঈমানের পরিপক্কতা এবং আখলাকের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় তার মুখের ভাষার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মুখের কথা ও জিহ্বা সংযত রাখাকে জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের (লজ্জা স্থান) হেফাজতের নিশ্চয়তা (জামিন) দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব।" *(সহীহ বুখারী)*
- রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বাপেক্ষা উত্তম মুসলিম কে? তিনি বললেন: "যার মুখ (জিহ্বা) ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।" *(সহীহ বুখারী)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।" *(সহীহ বুখারী)*

পারিবারিক পরিবেশে আমরা অনেক সময় খুব অসতর্কভাবে কথা বলি, যা অন্য সদস্যদের মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে। জিহ্বার অপব্যবহারের কয়েকটি প্রধান রূপ হলো:

- **খোঁচা দিয়ে কথা বলা (তাচ্ছিল্য করা):** স্বামী বা স্ত্রীর অতীত ভুল, তাদের পরিবার, গায়ের রঙ বা অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে খোঁচা বা তানা (Taunt) দেওয়া চরম অন্যায়।
- **গালিগালাজ বা অভিশাপ দেওয়া:** রাগের মাথায় স্ত্রীকে বা স্বামীকে গালি দেওয়া, কিংবা সন্তানদের অভিশাপ দেওয়া মুমিনের কাজ নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, *"মুমিন কখনো লানতকারী (অভিশাপকারী), গালিগালাজকারী বা অশ্লীলভাষী হয় না।" (তিরমিযী)*
- **কণ্ঠস্বরের কর্কশতা ও চিৎকার:** কথায় কথায় উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি করা ঘরের বরকত ও শান্তি কেড়ে নেয়। লোকমান হাকীম তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: *"আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৯)*

আমরা মুখে যা-ই উচ্চারণ করি না কেন, তার প্রতিটি অক্ষর অলক্ষিতভাবে রেকর্ড করা হচ্ছে।

- "মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক (ফেরেশতা) তার সাথেই রয়েছে।" *(সূরা কাফ, আয়াত: ১৮)*

আমরা অনেক সময় রাগের মাথায় বলে ফেলি, "তোমাকে বিয়ে করে আমার জীবনটা শেষ", "তোমার মতো মানুষ আমি দেখিনি" বা "তোমার মুখ দেখতে চাই না"। এই একটিমাত্র অসতর্ক বাক্য পুরো জীবনের নেক আমল নষ্ট করার জন্য এবং একটি সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট।

দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে মুখের ভাষা মিষ্টি ও সংযত রাখতে নিচের আমল ও মানসিকতাগুলো চর্চা করা যায়:

- **রাগের মাথায় 'চুপ' থাকার থেরাপী:** যখনই বুঝবেন আপনার প্রচণ্ড রাগ উঠছে এবং মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরিয়ে আসতে চাইছে, তখনই কথা বলা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিন। স্থান পরিবর্তন করুন, বসে থাকলে শুয়ে পড়ুন অথবা ওযু করুন। রাসূল (সা.) বলেছেন, *"যখন তোমাদের কারো রাগ উঠবে, সে যেন চুপ থাকে।" (মুসনাদে আহমাদ)*
- **সুন্দর ও মার্জিত শব্দের চয়ন:** নিজের পরিবার বা স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় "তুই-তুকারি" বা আদেশসূচক কর্কশ শব্দ পরিহার করে সম্মানজনক ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্বোধন ব্যবহার করুন। সুন্দর কথা বলাও একটি সদকা (দান)।

- **দোষ গোপন করা ও পিঠপিছে কথা না বলা:** স্ত্রীর কোনো ত্রুটি বা স্বামীর কোনো স্বভাব খারাপ লাগলে তা নিয়ে নিজের মা-বাবা বা বন্ধুদের কাছে গীবত (পরনিন্দা) করবেন না। সরাসরি তাকে একা নির্জনে বুঝিয়ে বলুন।
- **ভুল স্বীকার করার মানসিকতা:** নিজের মুখ দিয়ে কোনো কটু কথা বের হয়ে গেলে অহংকার না করে সাথে সাথে সঙ্গীর কাছে আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ (Sorry বলা) করুন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।

তলোয়ারের আঘাতের ক্ষত একসময় শুকিয়ে যায়, কিন্তু জিহ্বার আঘাতের ক্ষত যুগ যুগ ধরে মানুষের অন্তরে থেকে যায়। যে ঘরের মানুষের মুখের ভাষা নরম ও মার্জিত, সেই ঘরে শয়তান সহজে ফাটল ধরাতে পারে না।

৮. গোপনীয়তা রক্ষা ও আত্মীয়ের মাধ্যমে মীমাংসা: স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের কথা বা শোবার ঘরের গোপনীয়তা বাইরে প্রকাশ করা চরম গুনাহের কাজ। বড় কোনো সমস্যা হলে তৃতীয় পক্ষের সৎ আত্মীয়দের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।

- আল্লহ বলেন, "যদি তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তবে বরের পরিবার থেকে একজন এবং কনের পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।" *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৫)*

এই আয়তের মূল শিক্ষাসমূহ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ:

১. নিরপেক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্বাচন: বর ও কনে—উভয় পক্ষ থেকে এমন একজন করে আত্মীয়কে সালিশ মানতে হবে যিনি সৎ, বুদ্ধিমান, দ্বীনদার এবং আবেগতাড়িত না হয়ে নিরপেক্ষভাবে কথা বলতে পারেন। এমন কাউকে নেওয়া যাবে না যিনি পক্ষপাতিত্ব করে সংসারে আগুন বাড়িয়ে দেবেন।

২. উদ্দেশ্য হতে হবে সংশোধন: সালিশদের মানসিকতা হতে হবে সম্পর্কটি টিকিয়ে রাখা, ভাঙা নয়। আয়াতে বলা হয়েছে, *"তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন।"* অর্থাৎ, নিয়ত যদি পরিষ্কার থাকে, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য আসে।

৩. আদালত বা বাইরের লোকের আগে আত্মীয়: যেকোনো সমস্যা প্রথমেই থানা-পুলিশ, কোট-কাচারি বা বাইরের পরপুরুষ/পরনারীর কাছে নিয়ে গেলে সম্পর্কের মর্যাদা নষ্ট হয়। নিজের রক্তসম্পর্কীয় বা নিকটাত্মীয়দের মাধ্যমে ঘরোয়াভাবে মিটিয়ে ফেললে সম্মান বজায় থাকে।

- **ছোটখাটো সমস্যা (ঘরের ভেতর রাখুন):** রান্না খারাপ হওয়া, সংসারে কিছুটা টানাপোড়েন, মেজাজ খিটখিটে হওয়া বা সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি—এই বিষয়গুলো নিজেদের শোবার ঘরের ভেতরেই রাখুন। এগুলো নিজের মা-বাবাকেও বলার প্রয়োজন নেই।
- **বড় সংকট (অভিভাবকদের জানান):** যদি দেখা যায় দিনের পর দিন কোনো এক পক্ষ চরম জুলুম করছে, অধিকার খর্ব করছে বা শরীয়তবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত হচ্ছে, এবং বারবার বলার পরও সংশোধন হচ্ছে না—তখনই কেবল উভয় পক্ষের মুরুব্বি বা সালিশদের যুক্ত করুন।
- **সালিশের সামনে সত্য বলা:** সালিশি মজলিসে কোনো পক্ষই অহংকার বা জেদ ধরে বসে থাকবেন না। নিজের ভুল থাকলে তা স্বীকার করা এবং সঙ্গীর ভুলকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে নতুন করে সংসার শুরুর মানসিকতা রাখা উচিত।
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রী তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়।" *(সহীহ মুসলিম)*

গোপনীয়তা রক্ষা করলে সম্পর্কের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস মজবুত হয়। আর সমস্যা বড় হলে বিশ্বস্ত আত্মীয়দের মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করলে শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। ইসলাম ভাঙার চেয়ে গড়াকে এবং জেদ দেখানোর চেয়ে মিলেমিশে থাকাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে।

৯. পরিবারে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: পারিবারিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো পরিবারে ন্যায় ও ইনসাফ (عدل وإنصاف) প্রতিষ্ঠা করা। অনেক পরিবারে অশান্তির মূল কারণ বাহ্যিক কোনো সমস্যা নয়, বরং পরিবারের প্রধান বা সদস্যদের পারস্পরিক আচরণে ইনসাফের অভাব। যখনই পরিবারে পক্ষপাতিত্ব, হকের অবহেলা কিংবা একজনের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়, তখনই সেখানে ক্ষোভ ও দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ইসলাম পারিবারিক জীবনে কেবল ভালোবাসার কথাই বলেনি, বরং ইনসাফ বা ন্যায়বিচারকে বাধ্যতামূলক করেছে।

আল্লাহ তাআলা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আপনজনদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

- **আল্লাহ বলেন,:** "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা (ইনসাফ), সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন..." *(সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৯০)*
- **স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে ইনসাফ:** "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকো আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধেও যায়..." *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৩৫)*

পারিবারিক পরিমণ্ডলে ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের রূপগুলো প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত:

ক. স্ত্রী এবং পিতা-মাতার মধ্যে ইনসাফ (স্বামীর ভূমিকা): আমাদের সমাজে যৌথ পরিবারে বা আলাদা থাকলেও অনেক সময় স্বামীরা মা-বাবা এবং স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারেন না।

- ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান: মাকে খুশি করতে গিয়ে স্ত্রীর ওপর জুলুম করা যাবে না, আবার স্ত্রীর অন্ধ ভক্ত হয়ে মা-বাবার অধিকার ও সম্মান খর্ব করা যাবে না। ইসলামে মা-বাবার স্থান যেমন সর্বোচ্চ, তেমনি স্ত্রীরও সুনির্দিষ্ট ও অলঙ্ঘনীয় অধিকার রয়েছে।
- আলাদা অধিকার: স্ত্রীকে তার সাধ্যানুযায়ী খোরপোশ ও মানসিক শান্তি দেওয়া স্বামীর দায়িত্ব। তেমনি পিতা-মাতার সেবা ও ভরণপোষণ করাও সন্তানের দায়িত্ব। এই দুই দায়িত্বকে মুখোমুখি দাঁড় না করিয়ে প্রজ্ঞা ও ইনসাফের সাথে দুজনকে দুজনের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে।

খ. সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ: পিতা-মাতার আচরণে সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলে ভাই-বোনের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং সন্তানদের মনে ক্ষোভের জন্ম হয়।

- বিখ্যাত সাহাবি নুমান ইবনে বাশীর (রা.) বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা তাঁকে একটি বাগান উপহার দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এর সাক্ষী রাখতে চাইলেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এমন উপহার দিয়েছ?" তিনি বললেন, "না।" তখন রাসূল (সা.) বললেন: "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করো।" তিনি আরও বললেন, "তাহলে আমাকে এর সাক্ষী বানিও না, কারণ আমি কোনো জুলুমের সাক্ষী হতে পারি না।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

- উপহার সামগ্রী দেওয়া, আদর-ভালোবাসা প্রকাশ করা কিংবা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়ে বা বড়-ছোটর মধ্যে কোনো অন্যায্য বৈষম্য করা যাবে না। সবাইকে সমান নজরে দেখতে হবে।

গ. একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইনসাফ (যদি থাকে): যদি কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তাদের মধ্যে বাসস্থান, ভরণপোষণ এবং সান্নিধ্য বা সময় বণ্টনের ক্ষেত্রে শতভাগ ইনসাফ করা ফরজ।

- কুরআনে আল্লহ বলেন, *"আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে (স্ত্রীদের মধ্যে) ইনসাফ করতে পারবে না, তবে একজনকেই বিয়ে করো..." (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ০৩)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"যার দুটি স্ত্রী রয়েছে, কিন্তু সে তাদের একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ল (ইনসাফ করল না), কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে তার শরীরের একপাশ অবশ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত থাকবে।" (সুনানে আবু দাউদ)*

পরিবারে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যবহারিক উপায়

- **কাজের ভারসাম্য রক্ষা করা:** ঘরের সমস্ত কাজ বা বোঝা কেবল স্ত্রীর ওপর কিংবা কেবল মায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ইনসাফ পরিপন্থী। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে নিজের কাজ নিজে করতেন এবং স্ত্রীদের ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। পারিবারিক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ইনসাফেরই অংশ।
- **অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শোনা:** পরিবারে কোনো সদস্যের মধ্যে বিরোধ হলে একপক্ষের কথা শুনেই রায় দেওয়া যাবে না। পক্ষপাতহীনভাবে উভয়ের কথা শুনতে হবে, হোক সে আপনার ছোট ভাই, বোন, সন্তান বা স্ত্রী।
- **যৌতুক বা অন্যায্য দাবি পরিহার:** বিয়ের সময় কনেপক্ষের ওপর কোনো আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা বা অন্যায্য কিছু দাবি করা চরম বেইনসাফি ও জুলুম।

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সুফল

- **পারিবারিক সুখ ও শান্তি:** যখন পরিবারের প্রতিটি সদস্য অনুভব করে যে সে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান পাচ্ছে, তখন ক্ষোভের অবসান ঘটে এবং ঘরে প্রশান্তি নেমে আসে।
- **আল্লাহর বিশেষ মর্যাদা:** যারা পরিবারে ও অধীনস্থদের সাথে ইনসাফ করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই ইনসাফকারীগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর ডানপাশে আলোর

মিম্বরসমূহের ওপর অবস্থান করবে। তারা হলো ওইসব লোক, যারা তাদের শাসনে, তাদের পরিবারে এবং তাদের অধীনস্থদের বিষয়ে ইনসাফ করে।" (সহীহ মুসলিম)

পরিবারে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঘরকে জুলুমের অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখার একমাত্র উপায়। একজন আদর্শ অভিভাবক বা ঘরের কর্তা হিসেবে নিজের আবেগ বা অন্ধত্বকে দূরে সরিয়ে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই ইসলামের মূল শিক্ষা।

১০. আচার-আচরণ ও ভাষায় নম্রতা: পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও মধুরতা বজায় রাখার জন্য আচার-আচরণ ও ভাষায় নম্রতা (Rifq / رفق) অবলম্বন করা একটি যাদুকরী চাবিকাঠি। মানুষের বাহ্যিক রূপ বা সম্পদ নয়, বরং তার মুখের মিষ্টি ভাষা এবং বিনীত আচরণই অন্যের মন জয় করতে পারে। বিশেষ করে চার দেয়ালের ভেতরে, যেখানে মানুষ তার আসল রূপ প্রকাশ করে, সেখানে নম্রতা বজায় রাখা একটি বড় ইবাদত। ইসলামে নম্রতা, ভদ্রতা ও কোমল আচরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কোমল আচরণ পছন্দ করেন এবং আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর স্বভাবকে পরম নম্র ও দয়াশীল করে তৈরি করেছিলেন, যা ছিল ইসলাম প্রচারের সফলতার অন্যতম কারণ।

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন:

"আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় (নম্র) হয়েছিলেন; যদি আপনি কর্কশভাষী ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেতো..." *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)*

এমনকি আল্লাহ যখন মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অত্যাচারী শাসক ফেরআউনের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন, তখনও নির্দেশ দিয়েছিলেন:

"তোমরা উভয়ে তার সাথে নরম কথা (কোমল ভাষা) বলবে; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।" *(সূরা ত্বাহা, আয়াত: ৪৪)*

ফেরআউনের মতো ব্যক্তির সাথে যদি নরম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ থাকে, তবে নিজের দ্বীনি ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী বা সন্তানের সাথে আমাদের ভাষার নম্রতা কতখানি হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর নিখাদ ও কোমল আচরণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করতেন। তিনি নম্রতা সম্পর্কে বলেছেন:

- "নিশ্চয়ই নম্রতা বা কোমলতা যে জিনিসেই থাকে, তা সেটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর যে জিনিস থেকে নম্রতা কেড়ে নেওয়া হয়, তা কলঙ্কিত ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে।" *(সহীহ মুসলিম)*
- "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোমল বা নম্র এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা দান করেন না।" *(সহীহ মুসলিম)*
- "আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব না, কোন ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম এবং কার জন্য জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করা হারাম? (সে হলো ওই ব্যক্তি) যে মানুষের কাছাকাছি (সহজ সরল), নম্র ও কোমল স্বভাবের।" *(সুনানে তিরমিযী)*

আমরা অনেক সময় বাইরের মানুষের সাথে খুব ভালো ও মার্জিত ব্যবহার করি, কিন্তু ঘরে ফিরেই মেজাজ খিটখিটে করি বা রুক্ষ ভাষায় কথা বলি। এটি একটি মারাত্মক মুনাফিকী স্বভাব।

- কর্কশ ভাষা, কথায় কথায় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা এবং গলার আওয়াজ উঁচিয়ে কথা বলা ঘরের বরকত ও শান্তি কেড়ে নেয়। লুকমান হাকীম তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: *"আর তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই কণ্ঠস্বরের মধ্যে গাধার কণ্ঠস্বরই সবচেয়ে অপ্রীতিকর।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৯)*
- স্বামী বা স্ত্রীর কোনো ভুল হলে তা যদি ব্যঙ্গাত্মক বা কঠোর ভাষায় বোঝানো হয়, তবে অপর পক্ষ নিজের ভুল সুধরানোর চেয়ে জেদি হয়ে ওঠে। ফলে জেদ থেকে সংসারে আগুন জ্বলে।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আচরণে নম্রতা ফুটিয়ে তুলতে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করা উচিত:

- **সুন্দর ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্বোধন:** নিজের জীবনসঙ্গী বা সন্তানদের সাথে কথা বলার সময় "তুই-তুকারি" বা আদেশসূচক কর্কশ শব্দ পরিহার করে সম্মানজনক ও ভালোবাসাপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করুন। প্রিয় নবী (সা.) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-কে ভালোবেসে 'আয়েশ' বা 'হুমায়রা' (লালচে গালওয়ালী) বলে ডাকতেন।

- **অনুরোধের ভাষা ব্যবহার করা:** কোনো কাজের জন্য আদেশ না করে অনুরোধের সুরে কথা বলুন। যেমন: "আমাকে এক গ্লাস পানি দাও" না বলে, "আমাকে এক গ্লাস পানি দেবে প্লিজ?" বা "একটু কষ্ট করে পানিটা দাও না"—এতে সম্পর্কের মাধুর্য বাড়ে।
- **ভুল সংশোধনের কোমল পদ্ধতি:** পরিবারে কারো কোনো ভুল হলে সবার সামনে তাকে লজ্জিত না করে, পরম স্নেহে আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে বলুন। রাসূল (সা.) কখনো কারো ভুল দেখলে সরাসরি তার নাম ধরে বলতেন না, বরং সাধারণ ভাষায় বলতেন, *"লোকদের কী হলো যে তারা এমন কাজ করছে!"*
- **উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি না করা:** ঘরের ভেতর কোনো কারণে রাগ হলেও কণ্ঠস্বর নিচু রাখুন। শান্ত মাথায় কথা বললে যেকোনো কঠিন সমস্যার সমাধান সহজে সম্ভব।

সুন্দর আচরণ এবং মিষ্টি ভাষা হলো এক প্রকারের 'সদকা' বা দান। যে ঘরের মানুষের ভাষা নম্র ও মার্জিত, সেই ঘরে শয়তান সহজে ফাটল ধরাতে পারে না এবং সেই পরিবারটি দুনিয়াতেই জান্নাতের একটি টুকরোয় পরিণত হয়।

১১. আধুনিক সমস্যা: সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল ও বন্ধুত্ব: বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে পারিবারিক ভাঙন, দাম্পত্য কলহ এবং মানসিক দূরত্বের পেছনে সবচেয়ে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইলের অতিরিক্ত আসক্তি এবং অবাধ বন্ধুত্বের (ওপেন ফ্রেন্ডশিপ) সংস্কৃতি। এই আধুনিক মাধ্যমগুলো বাহ্যিক যোগাযোগ সহজ করলেও ঘরের ভেতরের আত্মিক যোগাযোগকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ইসলাম এই আধুনিক ফিতনাগুলো থেকে বেঁচে থাকার এবং পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত দূরদর্শী গাইডলাইন দিয়েছে।

বর্তমান সময়ে অনেক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকলেও তারা একে অপরের থেকে হাজার মাইল দূরে থাকেন। কারণ উভয়ের চোখ ও মন মগ্ন থাকে নিজ নিজ ফোনের স্ক্রিনে। একে সমাজবিজ্ঞানে বলা হয় 'ফাবিং' (Phubbing—ফোনের কারণে সঙ্গীকে অবহেলা করা)।

- **স্বচ্ছতার অভাব ও সন্দেহ:** ফোন লুকিয়ে ব্যবহার করা, পাসওয়ার্ড গোপন রাখা বা সঙ্গী পাশে এলে স্ক্রিন লক করে ফেলা—এই স্বভাবগুলো পরিবারে চরম অনাস্থা ও কুধারণার জন্ম দেয়।

- **ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:** ইসলাম বলে, এমন কাজ থেকে দূরে থাকতে যা সন্দেহের জন্ম দেয়। সততা ও স্বচ্ছতা ঈমানের অঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে কোনো গোপন দেয়াল থাকা উচিত নয়।
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ:** প্রিয় নবী (সা.) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর পুরো মনোযোগ থাকত পরিবারের প্রতি। তিনি স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন, ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।

সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে 'পাবলিক' বা উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যা ইসলামি সংস্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

- **নজর লাগা বা হিংসা (আইনুল হাসাদ):** অনেকেই ফেসবুকে নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক ছবি, ঘোরাঘুরি বা দামী উপহারের ছবি প্রদর্শন করেন। এর ফলে মানুষের হিংসা এবং কুদৃষ্টি (নজর) লাগে, যা একটি হাসিখুশি সংসার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"নজর লাগা একটি সত্য বিষয়।" (সহীহ বুখারী)*। তিনি আরও বলেছেন, *"তোমরা তোমাদের নিয়ামত অর্জনের বিষয়গুলো গোপন রাখার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কারণ প্রতিটি নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার শিকার হয়।" (তাবারানী)*
- **অবাস্তব প্রত্যাশা ও তুলনা:** সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্যের কৃত্রিম সুখী জীবনের ছবি দেখে মানুষ নিজের সঙ্গীর সাথে তুলনা করতে শুরু করে। "ওর হাসবেন্ড ওকে এটা দিল, আমারটা দিল না" কিংবা "ওর ওয়াইফ কত সুন্দর করে গুছিয়ে চলে"—এই তুলনামূলক মানসিকতা নিজের সংসারের শান্তি কেড়ে নেয়।
- **পারিবারিক ক্ষোভ প্রকাশ করা:** ঘরের কোনো মান-অভিমান বা ঝগড়া হলে তা ফেসবুকে স্ট্যাটাস বা রিলস বানিয়ে প্রকাশ করা চরম বোকামি ও গুনাহের কাজ। এটি সমস্যার সমাধান তো করেই না, উল্টো লোক হাসাহাসি বাড়ায়।

"আমরা জাস্ট ফ্রেন্ড"—এই আধুনিক স্লোগানটি আজ বহু সুশৃঙ্খল পরিবারকে ছারখার করে দিচ্ছে। বিয়ের পর কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক মাধ্যমে পরপুরুষ বা পরনারীর সাথে অবাধ মেলামেশা এবং গভীর বন্ধুত্ব ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম।

- **দৃষ্টির হেফাজত:** আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়কে প্রথমে দৃষ্টি সংযত করার নির্দেশ দিয়েছেন: "মু'মিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে..." এবং "মু'মিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিসংযত রাখে " *(সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩০-৩১)*

- **শয়তানের অনুপ্রবেশ:** ঘরের বাইরে অন্য কারো সাথে শেয়ারিং-কেয়ারিং বাড়লে নিজের জীবনসঙ্গীর প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। একেই বলে 'ইমোশনাল চিটিং' বা মানসিক পরকীয়া। রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করে বলেছেন: "কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়, কারণ তখন তাদের তৃতীয় জন হয় শয়তান।" *(সুনানে তিরমিযী)*
- **অন্যের জীবনসঙ্গী থেকে দূরে থাকা:** অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা, চ্যাটিং বা অপ্রয়োজনীয় হাসিলতাফ করা মারাত্মক ফিতনা। যে ব্যক্তি অন্যের ঘর ভাঙার চেষ্টা করে বা পরকীয়া উসকে দেয়, তার ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেছেন, *"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোনো নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে উসকানি দেয়।" (সুনানে আবু দাউদ)*

পরিবারকে এই আধুনিক ভাইরাসগুলো থেকে মুক্ত রাখতে নিচের নিয়মগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা চাই:

- **ডিজিটাল ডিটক্স ও 'নো ফোন জোন':** ঘরের কিছু নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানকে ফোনমুক্ত ঘোষণা করুন। যেমন— খাবার টেবিলে এবং শোবার ঘরে ঘুমানোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে কেউ মোবাইল ব্যবহার করবেন না। এই সময়টা নিজেদের মধ্যে কথা বলুন।
- **মোবাইল ব্যবহারে শতভাগ স্বচ্ছতা:** স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ফোনের পাসওয়ার্ড জানবেন এবং যেকোনো সময় একে অপরের ফোন ব্যবহারের মানসিকতা রাখবেন। কোনো লুকোছাপা না থাকলে শয়তান সন্দেহের বীজ বপন করতে পারে না।
- **সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে পর্দা রক্ষা:** ফেসবুকে নিজের বা স্ত্রীর ব্যক্তিগত ছবি আপলোড করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। প্রোফাইল পিকচারে শালীনতা বজায় রাখুন। কোনো পরনারী বা পরপুরুষের ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রিয়্যাক্ট বা কমেন্ট করা বন্ধ করুন।
- **বন্ধুমহল সীমিত করা:** বিয়ের পর "ওপেন ফ্রেন্ডশিপ" বা "ফ্রেন্ডস সার্কেল"-এর পরিধি ছোট করে আনতে হবে। আড্ডা বা বন্ধুত্ব কেবল সমলিঙ্গের (পুরুষের বন্ধু পুরুষ, নারীর বন্ধু নারী) দ্বীনদার মানুষদের সাথেই হওয়া উচিত, যা পরিবারে পজিটিভ প্রভাব ফেলবে।

প্রযুক্তিকে আমাদের জীবনের দাস বানাতে হবে, টেকনোলজির দাস যেন আমরা নিজেরা না হয়ে যাই। সোশ্যাল মিডিয়ার ভার্চুয়াল লাইক-কমেন্টের চেয়ে ঘরের ভেতরের মানুষের মুখের একটি সত্যিকারের হাসি এবং মনের শান্তি কোটি গুণ বেশি মূল্যবান।

১৩. দাম্পত্য ও যৌনাচার বিষয়ে জ্ঞান এবং সন্তান ধারণ: দাম্পত্য জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ লোকলজ্জার কারণে অবহেলিত অধ্যায় হলো যৌন জীবন ও সন্তান ধারণের সঠিক জ্ঞান। আমাদের সমাজে এই বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা না করার কারণে অনেক দম্পতি ভুল ধারণার শিকার হন, যা পরবর্তীতে চরম মানসিক দূরত্ব, এমনকি বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম একটি বাস্তবসম্মত জীবনব্যবস্থা। এখানে দাম্পত্য মিলনকে কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম বলা হয়নি, বরং এটিকে একটি পবিত্র ইবাদত এবং সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

★দাম্পত্য মিলন বা যৌনাচার বিষয়ে ইসলামি জ্ঞান: লজ্জা ঈমানের অঙ্গ হলেও দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জা যেন বাধা না হয়, ইসলাম সেই শিক্ষা দিয়েছে। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে দাম্পত্য জীবনের অন্তরঙ্গ বিষয়েও নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করতেন।

ক. দাম্পত্য মিলন একটি ইবাদত ও সদকা: ইসলামে বিবাহিত জীবনের পারস্পরিক শারীরিক সম্পর্ক অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করার মধ্যেও সদকার সওয়াব রয়েছে।" সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কামভাব পূর্ণ করবে, আর তাতেও কি সওয়াব হবে?" তিনি বললেন, "তোমরা কী মনে করো, সে যদি তা হারাম উপায়ে (ব্যভিচার) পূর্ণ করত, তবে কি তার গুনাহ হতো না? অতএব, যখন সে তা হালাল উপায়ে পূর্ণ করে, তখন তার জন্য সওয়াব রয়েছে।" *(সহীহ মুসলিম)*

খ. মিলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি আদব ও বিধান:

পারস্পরিক তৃপ্তি ও অধিকার: দাম্পত্য মিলনে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। কেবল নিজের তৃপ্তির দিকে না তাকিয়ে সঙ্গীর চাহিদার প্রতিও যত্নশীল হতে হবে। ইমাম গাজালী (র.) তাঁর *এহয়াউ উলুমিদ্দীন* গ্রন্থে লিখেছেন, মিলনের সময় স্বামীর উচিত স্ত্রীর পূর্ণ তৃপ্তি নিশ্চিত করা।

মিলনের দোয়া পড়া: মিলনের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদের যে সন্তান দান করবেন, তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন।" এই দোয়া পড়লে শয়তান সন্তানের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। *(সহীহ বুখারী)*

ইসলামে যা সম্পূর্ণ হারাম:১. স্ত্রীর ঋতুস্রাব (পিরিয়ড) বা নেফাস (সন্তান প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ) অবস্থায় মিলন করা সম্পূর্ণ হারাম (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২২২)। ২. স্ত্রীর মলদ্বার বা পেছনের রাস্তা ব্যবহার করা মারাত্মক গুনাহ ও অভিশাপের কাজ *(সুনানে আবু দাউদ)*।

★ সন্তান ধারণ (Family Planning) এবং এর সময়োপযোগিতা: বিয়ে ও দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখা এবং একটি সুন্দর ও সৎ সন্তান গড়ে তোলা।

দ্রুত সন্তান নেওয়ার গুরুত্ব: আমাদের বর্তমান আধুনিক সমাজে ক্যারিয়ার, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা "নিজেদের মতো করে সময় কাটানো"-র অজুহাতে বিয়ের পর দীর্ঘ বছর ধরে সন্তান নেওয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়। ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞান—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কোনো বিশেষ সমস্যা ছাড়া অযথা সন্তান নেওয়া পিছিয়ে দেওয়া অনুচিত।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা এমন নারীকে বিয়ে করো যে অধিক স্নেহময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারিণী। কেননা কিয়ামতের দিন আমি অন্যান্য উম্মতের সামনে তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব।" *(সুনানে আবু দাউদ)*
- চিকিৎসা বিজ্ঞান কী বলে: চিকিৎসকদের মতে, নারীদের সন্তান ধারণের একটি নির্দিষ্ট বয়স (Peak Age) থাকে। বিয়ের পর দীর্ঘ সময় ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী (বিশেষ করে পিল বা ইনজেকশন) ব্যবহার করলে পরবর্তীতে গর্ভধারণে জটিলতা বা বন্ধ্যাত্বের (Infertility) ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
- মানসিক বন্ধন: সন্তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা এবং পারিবারিক দায়িত্ববোধকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। সন্তানহীন পরিবারে অনেক সময় একঘেয়েমি থেকে খিটখিটে মেজাজ ও কলহের সৃষ্টি হয়।

সন্তান আল্লাহর বিশেষ উপহার: সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে, তা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা। কন্যাসন্তান হলে মন খারাপ করা বা স্ত্রীকে দোষারোপ করা জাহেলিয়াত বা ইসলামপূর্ব যুগের অন্ধকার স্বভাব।

- আল-কুরআনে আল্লহ বলেন, *"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।" (সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ৪৯)*

গ. ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান (আজল): যেকোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: স্ত্রীর চরম শারীরিক অসুস্থতা, পূর্বের সন্তানটি খুব ছোট হওয়া ইত্যাদি কারণে) যদি সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তবে ইসলামে তার অনুমতি রয়েছে।

- সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে 'আজল' (সহবাসের শেষ মুহূর্তে বীর্য বাইরে ফেলা) করতেন এবং রাসূল (সা.) তা নিষেধ করেননি। তবে স্থায়ীভাবে বন্ধ্যাত্বকরণ বা কোনো কারণ ছাড়া কেবল সন্তান লালন-পালনের ভয়ে (আর্থিক অনটনের আশঙ্কায়) জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বা গর্ভপাত (Abortion) করানো ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

যৌন জীবন বা মিলনের কোনো বিষয় বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে শেয়ার করা ইসলামে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে একান্ত সময় কাটানোর পর তা মানুষের কাছে বর্ণনা করে বেড়ায় *(সহীহ মুসলিম)*।

দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক শারীরিক ও মানসিক সন্তুষ্টি সংসারের ভিত মজবুত করে। লজ্জা পরিহার করে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত এই বিষয়ে সঠিক ও হালাল ইসলামি গাইডলাইন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। একটি সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনই পারে একটি সুন্দর ও নেককার সন্তান উপহার দিতে।

১৪. যৌথ পরিবার ও নিজস্ব সার্কেল: আমাদের বর্তমান সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থায় যৌথ পরিবার (Combined Family) এবং স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব সার্কেল বা একান্ত বৃত্ত (Privacy & Personal Circle)—এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি অন্যতম বড় শিল্প। অনেক সংসার ভেঙে যায় কেবল এই দুই বিষয়ের মাঝে সমন্বয় করতে না পারার কারণে।

ইসলাম একক পরিবার বা যৌথ পরিবার—কোনোটাকেই বিশেষভাবে বাধ্যতামূলক করেনি, বরং পরিস্থিতির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। তবে যৌথ পরিবারে থাকার ক্ষেত্রে ইসলাম পর্দার বিষয়ে যেমন কঠোর নিয়ম দিয়েছে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব গোপনীয়তা ও অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও অত্যন্ত জোর দিয়েছে।

যৌথ পরিবারে বাবা-মা, ভাই-বোন বা অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে থাকাটা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও একাত্মতা বাড়ায়। তবে এখানে ইসলামি শরীয়তের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো পর্দার বিধান রক্ষা করা।

আমাদের সমাজে যৌথ পরিবারে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি শিথিল করা হয়, তা হলো দেবর, ভাসুর বা দুলাভাইদের সাথে অবাধ মেলামেশা। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

- সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের সাথে মেলামেশার বিধান কী?" তিনি বললেন: "দেবর বা ভাসুর হলো মৃত্যুর সমতুল্য (তথা মারাত্মক ধ্বংসাত্মক ফিতনা)।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

এর অর্থ হলো, ঘরে দেবর বা ভাসুরের অবাধ যাতায়াত এবং তাদের সাথে পর্দার অভাব যেকোনো সময় বড় ধরণের গুনাহ, মানসিক পরকীয়া বা পারিবারিক ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, যেমনটা মৃত্যু মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। তাই যৌথ পরিবারে থাকলেও ভাবি ও দেবরের মধ্যকার পর্দা এবং শালীন দূরত্ব শতভাগ বজায় রাখা আবশ্যক।

যৌথ পরিবারে ঘরের ভেতরেও নারীদের এমন পোশাক পরা উচিত নয় যা শালীনতার পরিপন্থী। দেবর, ভাসুর বা শ্বশুরবাড়ির অন্য পরপুরুষদের সামনে আসার সময় অবশ্যই ঢিলেঢালা পোশাক ও মাথা-বুক চাদর দিয়ে আবৃত রাখতে হবে।

যৌথ পরিবারে থাকার মানে এই নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর কোনো নিজস্ব জীবন বা প্রাইভেসী থাকবে না। ইসলাম দাম্পত্য জীবনের একান্ত বিষয়গুলোকে পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখার অধিকার দিয়েছে।

ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী, স্ত্রীর খোরপোশের মতোই তার সামর্থ্য অনুযায়ী পৃথক ও নিরাপদ বাসস্থানের (বা অন্তত একটি স্বাধীন কক্ষের) ব্যবস্থা করে দেওয়া স্বামীর ওপর ফরজ, যেখানে অন্য কারো অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে না।

- আল্লহ বলেন,"তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা যেখানে বসবাস করো, তাদেরও (স্ত্রীদেরও) সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা করো..." *(সূরা আত-তালাক, আয়াত: ০৬)*
- ফিকহবিদদের মতে, স্ত্রীর অধিকার হলো এমন একটি স্বাধীন কক্ষ পাওয়া, যার চাবি থাকবে তার কাছে এবং যেখানে তার অনুমতি ছাড়া দেবর, ভাসুর বা অন্য

কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। এমনকি বাথরুম বা রান্নাঘরও যদি সম্ভব হয় আলাদা করে দেওয়া উত্তম, যাতে পর্দা রক্ষায় কোনো বেগ পেতে না হয়।

'বাচ্চা ছাড়া আলাদা দুটি সার্কেল' (কোয়ালিটি টাইম): বিয়ের পর প্রথম দিকে এবং সন্তান হওয়ার পর—উভয় সময়েই স্বামী-স্ত্রীর নিজেদের মধ্যকার বোঝাপড়া দৃঢ় করার জন্য যৌথ পরিবারের কোলাহল থেকে দূরে কিছু একান্ত সময়ের প্রয়োজন হয়।

- **সাহচর্যের গুরুত্ব:** একে অপরের সাথে গল্প করা, একসাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা নিজেদের ক্যারিয়ার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করা দাম্পত্য ভালোবাসাকে সতেজ রাখে।
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ:** রাসূল (সা.) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.)-এর সাথে নির্জনে মরুভূমিতে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন *(সুনানে আবু দাউদ)*। তিনি স্ত্রীদের সাথে একান্ত সময়ে মনের কথা বলতেন ও গল্প করতেন। যৌথ পরিবারে থেকেও স্বামী-স্ত্রীর উচিত নিজেদের জন্য এই বিশেষ বৃত্তটুকু বজায় রাখা।

যৌথ পরিবার ও নিজস্ব সার্কেলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপায়: যৌথ পরিবারের দায়িত্ব পালন এবং নিজেদের দাম্পত্য সুখ—উভয়টি একসাথে ধরে রাখতে নিচের পদক্ষেপগুলো নেওয়া যেতে পারে:

- অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করার সংস্কৃতি (ইস্তিজান): যৌথ পরিবারে এক ঘরে অন্য ঘরের সদস্যদের প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া বা নক করার নিয়ম চালু করতে হবে। কুরআন স্পষ্টভাবে ঘরের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বা অন্য সদস্যরা যেন ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেয় (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৯)।
- স্ত্রীর ওপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো: যৌথ পরিবারে অনেক সময় সব কাজের দায়িত্ব একা নতুন বউয়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা ইনসাফ পরিপন্থী। স্বামীর উচিত স্ত্রীর ক্ষমতার বাইরে কাজের চাপ থাকলে তাকে সাহায্য করা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে কাজ ভাগ করে দেওয়া। রাসূল (সা.) ঘরে স্ত্রীদের কাজে হাত লাগাতেন।
- ন্যায্যতার সাথে ভারসাম্য রক্ষা (স্বামীর দায়িত্ব): স্বামীকে তার মা-বাবার সেবা ও স্ত্রীর অধিকারের মাঝে রেফারি বা সেতু হিসেবে কাজ করতে হবে। মা-বাবার সামনে স্ত্রীকে অতিরিক্ত ধমক দেওয়া বা স্ত্রীর কথায় অন্ধ হয়ে মা-বাবাকে

অবহেলা করা—উভয়টিই গুনাহ। দুটি সম্পর্কের সীমানা আলাদা এবং দুটিকেই ইনসাফের সাথে বজায় রাখতে হবে।

- যোগাযোগের স্পষ্টতা: নিজের ঘরোয়া বা একান্ত সার্কেলের কথা পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে উচ্চস্বরে বা খোলামেলা আলোচনা না করাই শ্রেয়। নিজেদের সুখের মুহূর্তগুলো নিজেদের মধ্যেই রাখা উত্তম।

যৌথ পরিবার একটি সুন্দর সামাজিক নিরাপত্তা দেয়, যেখানে মুরুব্বিদের দোয়া ও সন্তানদের সঠিক বেড়ে ওঠার পরিবেশ থাকে। কিন্তু এর সফলতা নির্ভর করে মেম্বারদের পারস্পরিক সম্মান, নিখাদ পর্দা এবং স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা প্রাইভেসীর অধিকার দেওয়ার ওপর। সীমানা মেনে চললে যৌথ পরিবারও জান্নাতের মতো শান্তিময় হতে পারে।

১৫. নারী ও কর্মসংস্থান বিষয়ক বিভ্রান্তি নিরসন: বর্তমান আধুনিক বস্তুবাদী সমাজে নারী ও কর্মসংস্থান বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর রূপ ধারণ করেছে। একদিকের চরমপন্থী মতবাদ বলে— নারীকে কেবল ঘরের চার দেয়ালে বন্দী থাকতে হবে, তার কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবদান থাকতে পারবে না। অন্যদিকের উগ্র আধুনিক বা তথাকথিত নারীবাদী (Feminist) আন্দোলন দাবি করে— অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বা "আত্মনির্ভরশীল" না হলে নারীর কোনো মর্যাদা নেই, এবং এই তথাকথিত স্বাধীনতার নামে অনেক সময় পরিবার প্রথাকে ভেঙে ফেলার উসকানি দেওয়া হয়।

বাস্তবতা হলো, এই দুটি ধারণাই চরমপন্থী এবং ইসলাম এই দুইয়ের মাঝখানে একটি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ, প্রগতিশীল ও সম্মানজনক সমাধান দিয়েছে।

ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার ও উপার্জনের স্বাধীনতা:

বিভ্রান্তি: ইসলাম নারীকে ঘরে বন্দী রাখে এবং তাকে উপার্জন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দেয় না।

বাস্তব নিরসন: এটি একটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ইসলাম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই নারীকে স্বাধীনভাবে সম্পদের মালিক হওয়া, ব্যবসা করা এবং হালাল উপায়ে উপার্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে, যখন ইউরোপের নারীরাও তাদের নিজস্ব সম্পদের মালিক হতে পারত না।

- **কুরআনের ঘোষণা:** "...পুরুষ যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা উপার্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ..." *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩২)*
- **ঐতিহাসিক উদাহরণ:** রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন আরবের অন্যতম সফল ও শীর্ষ ধনী ব্যবসায়ী। রাসূল (সা.) স্বয়ং তাঁর ব্যবসায়ের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছিলেন। এছাড়া অন্য একজন উম্মুল মুমিনীন হযরত জয়নব বিনতে জাহশ (রা.) নিজের হাতে চামড়ার কাজ ও হস্তশিল্প তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং সেই উপার্জিত অর্থ গরিবদের মাঝে দান করে দিতেন।

নারীর মূল দায়িত্ব বনাম ঐচ্ছিক কর্মসংস্থান:

বিভ্রান্তি: ঘরের কাজ বা সন্তান লালন-পালন করা এক ধরণের দাসত্ব বা পিছিয়ে পড়া, নারীকে বাইরে গিয়ে পুরুষের সমান কাজ করতেই হবে।

বাস্তব নিরসন: ইসলাম প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত যোগ্যতা ও শারীরিক গঠন অনুযায়ী দায়িত্ব বণ্টন করেছে। পুরুষের ওপর চাপানো হয়েছে পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব (খোরপোশ ও নিরাপত্তা), আর নারীর ওপর দেওয়া হয়েছে একটি জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে (সন্তান) গড়ে তোলার মহৎ দায়িত্ব।

- **পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা:** ইসলামে একজন নারী কন্যা হিসেবে বাবার ওপর, স্ত্রী হিসেবে স্বামীর ওপর এবং মা হিসেবে সন্তানের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, নারীর নিজের কোনো উপার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। তার নিজের কোটি টাকা থাকলেও ঘরের এক টাকার খরচ চালানোর দায়িত্বও স্বামীর। "পুরুষেরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল, যেহেতু আল্লাহ তাদের একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে..." *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৪)*
- **কাজের রূপরেখা:** একজন নারী যদি চান, তবে তিনি শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা, কুটির শিল্প, অনলাইন বিজনেস বা যেকোনো হালাল ও মার্জিত উপায়ে কর্মসংস্থান বেছে নিতে পারেন—যদি তার ঘরের মূল দায়িত্ব (সন্তান ও সংসার) ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং তিনি ইসলামি পর্দার বিধান রক্ষা করতে পারেন।

"মেয়েদের আত্মনির্ভরশীলতা বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ"— এই ধারণার সত্যতা কতটুকু?

বিভ্রান্তি: নারীর চাকরি বা স্বাবলম্বী হওয়াই বিবাহ বিচ্ছেদের একমাত্র বা মূল কারণ।

বাস্তব নিরসন: বিষয়টি আসলে সরাসরি উপার্জনের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এর পেছনে কাজ করে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ও দ্বীনি শিক্ষার অভাব।

- **অহংকার বনাম বিনম্রতা:** সমস্যা তখন তৈরি হয় না যখন একজন নারী টাকা আয় করেন; সমস্যা তখন হয় যখন তথাকথিত আত্মনির্ভরশীলতার নামে মনের মধ্যে অহংকার চলে আসে এবং সে স্বামীকে অবজ্ঞা করতে শুরু করে বা "আমার তো নিজের টাকা আছে, আমার স্বামীর কী দরকার?"—এমন মানসিকতা পোষণ করে। ইসলাম বলে, নারীর সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব তার অহংকারে নয়, বরং তার বিনম্রতা ও ভালোবাসায়।
- **পুরুষের দায়িত্বহীনতা:** অনেক সময় স্ত্রী চাকরি করলে স্বামী নিজের খরচ চালানোর দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয় বা স্ত্রীর আয়ের ওপর নজর দেয়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। স্বামীর এই বেইনসাফি ও জুলুমের কারণেও অনেক সময় সংসারে ফাটল ধরে।
- **সহযোগিতার অভাব:** কর্মজীবী নারীদের ঘরের কাজ এবং বাইরের কাজ—উভয়টি একসাথে সামলাতে গিয়ে তীব্র মানসিক ও শারীরিক চাপে (Stress) ভুগতে হয়। স্বামী যদি তাকে ঘরের কাজে সাহায্য না করে (যা সুন্নাত), তবে ভুল বোঝাবুঝি ও বিচ্ছেদ অবধারিত হয়ে পড়ে।

তথাকথিত ক্ষতিকর নারী সংগঠন থেকে দূরত্ব:

বিভ্রান্তি: নারীবাদী সংগঠনগুলোই নারীর অধিকারের একমাত্র রক্ষক।

বাস্তব নিরসন: বর্তমান যুগের অনেক তথাকথিত নারী সংগঠন বা ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আড়ালে নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা পরিবার প্রথাকে একটি "শৃঙ্খল" মনে করে এবং নারীকে ঘরের বাইরে এনে পুঁজিপতিদের সস্তা শ্রমিক বানানোর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে।

- **ইসলামের পরিপূরক মডেল:** ইসলাম নারী ও পুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানায়নি, বরং একে অপরের পরিপূরক ও বন্ধু বানিয়েছে। "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু..." *(সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৭১)*

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের পোশাক।" *(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭)*

- পোশাক যেমন মানুষের শরীরকে রক্ষা করে ও সৌন্দর্য বাড়ায়, তেমনি স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের সম্মান রক্ষা করবে এবং একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার চালাবে—এটাই ইসলামের শিক্ষা।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইসলামি গাইডলাইন ও সমাধান: যদি কোনো নারী বিশেষ প্রয়োজনে বা নিজের যোগ্যতার বিকাশের জন্য কর্মসংস্থান বেছে নিতে চান, তবে নিচের শর্তগুলো মেনে চলা উচিত:

- **হালাল পরিবেশ:** কর্মক্ষেত্রে যেন অবাধ পরপুরুষের মেলামেশা (Free Mixing) না থাকে এবং শালীন ও নিরাপদ পরিবেশ থাকে।
- **পর্দার বিধান:** পোশাক ও আচার-আচরণে শতভাগ ইসলামি পর্দার বিধান (হিজাব ও শালীনতা) বজায় রাখতে হবে।
- **অগ্রাধিকার নির্ধারণ (Priority):** মনে রাখতে হবে, একজন সফল ক্যারিয়ার উইম্যান হওয়ার চেয়ে একজন সফল মা এবং সফল স্ত্রী হওয়া আল্লাহর কাছে কোটি গুণ বেশি মর্যাদার। কারণ সন্তানকে সঠিক দ্বীনি শিক্ষায় গড়ে তোলার চেয়ে বড় কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং বা অবদান পৃথিবীতে হতে পারে না।
- **স্বামী-স্ত্রীর আন্ডারস্ট্যান্ডিং:** স্ত্রী বাইরে কাজ করতে চাইলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি, কাজের বোঝাপড়া এবং ঘরের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে।

ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু তাকে উপার্জনের কোলুর বলদ বানায়নি। নারী ঘরের রানী এবং সন্তানের প্রথম শিক্ষক। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা যেন কখনো দাম্পত্যের অহংকার বা পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণ না হয়, বরং তা যেন পারস্পরিক সহযোগিতা ও দ্বীনি মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম হয়—সেদিকেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

১৬. যৌতুক বিরোধী অবস্থান ও শরয়ী বিধান জানা: আমাদের সমাজে যৌতুক (Dowry) একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, যা হাজার হাজার নারীর জীবনকে নরক বানিয়ে দিয়েছে এবং বহু সাজানো সংসারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিয়ের মতো একটি পবিত্র ইবাদতকে কেন্দ্র করে কনেপক্ষের ওপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া বা কোনো কিছু দাবি করা চরম জুলুম।

ইসলাম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই যৌতুকের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং নারীর জন্য পরম সম্মানজনক একটি অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে, যার নাম মোহরানা।

যৌতুকের শরয়ী বিধান (ইসলামি দৃষ্টিকোণ): ইসলামি শরীয়তে বিয়ের চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য কনেপক্ষের কাছ থেকে কোনো প্রকার টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র, গাড়ি-বাড়ি বা অন্য কোনো সামগ্রী দাবি করা সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহ। এটি একটি জঘন্য সামাজিক অপরাধ।

ক. ইসলামে বিয়ের অর্থনৈতিক মডেল: পুরুষ দেবে, নারী নেবে: ইসলামের বিধান অনুযায়ী, বিয়ের সময় বা বিয়ের পর আর্থিক লেনদেনের সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের। পুরুষ নারীকে 'মোহরানা' দেবে, কনেপক্ষ বরপক্ষকে কোনো টাকা বা উপহার দিতে বাধ্য নয়।

- আল্লহ বলেন, "আর তোমরা নারীদের তাদের মোহরানা খুশি মনে দিয়ে দাও। অতঃপর তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে তার কিছু অংশ তোমাদের ছেড়ে দেয়, তবে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।" *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ০৪)*

খ. জোরপূর্বক বা সামাজিক চাপে কনেপক্ষের সম্পদ নেওয়া হারাম: অনেক সময় বরপক্ষ সরাসরি যৌতুক না চাইলেও সামাজিক প্রথা বা লোকলজ্জার দোহাই দিয়ে কনের বাবার কাছ থেকে দামী আসবাবপত্র বা বিয়ের পুরো খরচ দাবি করে। ইসলামে কারো ওপর চাপ সৃষ্টি করে বা তার অনিচ্ছায় কোনো সম্পদ নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

- আল্লহ বলেন, *"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না..." (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন: "কোনো মুসলিমের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ছাড়া গ্রহণ করা হালাল নয়।" *(মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী)*

সামাজিক চাপ বা লজ্জায় পড়ে কনের বাবা যা দেন, তা কখনোই 'আন্তরিক সন্তুষ্টি' থেকে হয় না, বরং তা হয় বাধ্য হয়ে। তাই এই ধরণের উপহার বা সামগ্রী গ্রহণ করা এক প্রকারের জোরপূর্বক ছিনতাই (গসব) বা আত্মসাতের শামিল।

গ. যৌতুক হলো এক প্রকারের 'রিশওয়াহ' বা ঘুষ: বিয়ের শর্ত হিসেবে বা বিয়ে টিকিয়ে রাখার উসিলা হিসেবে যে অর্থ দাবি করা হয়, তা ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে 'রিশওয়াহ' (ঘুষ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা—উভয়ের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।" (সুনানে ইবনে মাজাহ)*

কনের বাবার বাড়ি থেকে উপহার নেওয়ার সঠিক নিয়ম: প্রশ্ন উঠতে পারে: কনের বাবা যদি ধনী হন এবং নিজের খুশি মনে মেয়ে-জামাইকে কোনো উপহার দেন, তবে তা নেওয়া যাবে কি?

- **শর্তহীন হতে হবে:** উপহার কেবল তখনই হালাল হবে, যখন বরপক্ষের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো দাবি, ইঙ্গিত বা সামাজিক চাপ থাকবে না। কনের বাবা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়, লোকদেখানো মানসিকতা (রিয়া) ছাড়া, সাধ্যের মধ্যে কোনো হাদিয়া বা উপহার দিলে তা নেওয়া জায়েয।
- **রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ:** প্রিয় নবী (সা.) তাঁর কলিজার টুকরো কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে বিয়ের সময় একটি পানির মশক, একটি চামড়ার গদি (যার ভেতরে খেজুর পাতা ভরা ছিল) এবং দুটি যাতা উপহার দিয়েছিলেন। এটি ছিল অত্যন্ত সাধারণ এবং কনের বাবার পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার, কোনো বাধ্যতামূলক যৌতুক বা বরের দাবিকৃত আসবাবপত্র নয়।

যৌতুক প্রথার সামাজিক ক্ষতি ও ইসলামি সমাধান: যৌতুক প্রথা কেবল একটি গুনাহই নয়, এটি সমাজকে বিভিন্নভাবে কলুষিত করে:

- **নারীর ওপর নির্যাতন:** যৌতুকের টাকা বা মালামাল ঠিকঠাক না পেলে অনেক সময় স্ত্রীর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়, যা ইসলামে চরমভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করার এবং তাদের সাথে সদাচরণ করার তাগিদ দিয়েছিলেন।
- **পরিবার দেউলিয়া হওয়া:** মেয়ের বিয়ের যৌতুক যোগাড় করতে গিয়ে অনেক সৎ ও দরিদ্র বাবা সুদের ওপর ঋণ নেন, জমি বিক্রি করেন এবং নিঃস্ব হয়ে যান। একজন মুসলিম ভাই অন্য ভাইয়ের এই কষ্টের কারণ হতে পারে না।
- **বিয়ের ব্যয় কমানো সুন্নাত:** ইসলামে সেই বিয়েকে সবচেয়ে বেশি বরকতময় বলা হয়েছে, যা খুব সহজ ও কম খরচে সম্পন্ন হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই সবচেয়ে বরকতময় বিয়ে হচ্ছে তা, যা সবচেয়ে সহজ এবং কম খরচে সম্পন্ন হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ)*

যৌতুক বিরোধী সামাজিক অবস্থান ও আমাদের করণীয়:

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা: তরুণ সমাজ ও বরপক্ষকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে— "আমি বিয়েতে কনেপক্ষের কাছ থেকে একটি টাকাও বা কোনো অন্যায্য উপহার নেব না।"

মোহরানা আদায় করা: যৌতুক পরিহার করার পাশাপাশি স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরানা সাধ্যানুযায়ী নগদ বা দ্রুত আদায় করে দেওয়ার মানসিকতা রাখতে হবে।

সামাজিক প্রতিরোধ: যে বিয়েতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌতুকের লেনদেন হয়, সচেতন দ্বীনি ভাইদের উচিত সেই বিয়েতে অংশগ্রহণ করা বা বরযাত্রী যাওয়া থেকে বিরত থেকে নৈতিক প্রতিবাদ জানানো।

অন্যকে সাবধান করা: নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের যৌতুকের ভয়াবহতা এবং এর শরয়ী গুনাহ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

যৌতুক নেওয়া পুরুষত্বের কলঙ্ক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক জুলুম। ইসলাম নারীকে দিয়েছে অধিকার ও সম্মান, আর পুরুষকে করেছে দায়িত্বশীল। কনেপক্ষের পকেট কেটে নয়, বরং নিজের হালাল উপার্জনে স্ত্রীকে সম্মান দিয়ে ঘরে তোলাই একজন প্রকৃত মুমিন পুরুষের প্রধান পরিচয়।

১৭. ধর্মপরায়ণতা, তালাকের জ্ঞান এবং সর্বোপরি ধৈর্য ধারণ করা: পারিবারিক জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী, মজবুত এবং শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত থেকে সুরক্ষিত রাখার শেষ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি স্তম্ভ হলো—ধর্মপরায়ণতা (দ্বীনদারিতা), তালাক সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান এবং সর্বোপরি ধৈর্য (সবর)।

একটি সুন্দর দাম্পত্যের সূচনা হয় দ্বীনদারিতার মাধ্যমে, তা টিকে থাকে ধৈর্যের ওপর ভর করে এবং শয়তানের পাতা সবচেয়ে বড় ফাঁদ অর্থাৎ অহেতুক বা ভুল পদ্ধতিতে 'তালাক' দেওয়া থেকে এটি রক্ষা পায় সঠিক শরয়ী জ্ঞানের মাধ্যমে।

ধর্মপরায়ণতা বা দ্বীনদারিতা (পারিবারিক সুখের মূল ভিত্তি): হাদিসের নির্দেশনা (পাত্রী নির্বাচন): রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নারীদের চারটি গুণ দেখে বিয়ে করা হয়: তার সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দ্বীনদারিতা (ধর্মপরায়ণতা)। সুতরাং তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ করে সফলকাম হও, অন্যথায় তোমার হাত ধূলিধূসরিত হবে (তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে)।" *(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)*

পাত্র নির্বাচন: একইভাবে কন্যার অভিভাবকদের প্রতি রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমাদের কাছে এমন কোনো পাত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার দ্বীনদারিতা ও চরিত্র সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার সাথে বিয়ে সম্পন্ন করো। তা না করলে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে (তিরমিযী)।

কেন দ্বীনদারিতা জরুরি?

রূপ-যৌবন বা টাকা-পয়সা চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু মানুষের ভেতর যদি আল্লাহভীতি বা ধর্মপরায়ণতা থাকে, তবে সে সুখের সময়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ (শুকরগুজার) থাকে এবং দুঃখের বা অভাবের সময়ে ধৈর্য ধারণ করে। একজন দ্বীনদার স্বামী বা স্ত্রী কখনো

তার সঙ্গীর ওপর জুলুম করতে পারে না, কারণ সে জানে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

তালাক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন (শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার উপায়): আমাদের সমাজে একটি মারাত্মক ও দুঃখজনক প্রবণতা হলো— রাগের মাথায়, সামান্য ঝগড়া বা তুচ্ছ কারণে হুট করে মুখে 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করা বা কাগজের স্ট্যাম্পে সই করে দেওয়া। এর বড় কারণ হলো তালাকের ভয়াবহতা এবং এর শরয়ী বিধান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা।

- **আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় হালাল:** ইসলামে অনিবার্য পরিস্থিতিতে বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হলেও এটিকে অত্যন্ত নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় হালাল কাজ হলো তালাক।" *(সুনানে আবু দাউদ)*
- **শয়তানের সবচেয়ে বড় আনন্দ:** হাদিসে এসেছে, ইবলিশ শয়তান প্রতিদিন পানির ওপর তার সিংহাসন পাতে এবং তার অনুসারী ছোট শয়তানদের কাজের হিসাব নেয়। একজন এসে বলে, আমি অমুক গুনাহ করিয়েছি; ইবলিশ বলে, তুমি তেমন কিছুই করোনি। অতঃপর যখন কোনো শয়তান এসে বলে, "আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ (তালাক) ঘটিয়ে দিয়ে এসেছি", তখন ইবলিশ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে— "হ্যাঁ, তুমিই আসল কাজ করেছ।" *(সহীহ মুসলিম)*

তালাক সংক্রান্ত কিছু জরুরি শরয়ী জ্ঞান:

- **কথায় কথায় তালাকের হুমকি নিষিদ্ধ:** তালাক কোনো ছেলেখেলা বা ঠাট্টার বিষয় নয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যা গুরুত্ব দিয়ে বললেও কার্যকর হয়, আবার ঠাট্টা বা তামাশা করে বললেও কার্যকর হয়ে যায়। তার একটি হলো তালাক *(তিরমিযী)*। তাই রাগের মাথায় বা ভয় দেখানোর জন্য কখনো 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করা যাবে না।
- **ভুল পদ্ধতিতে এক বসায় তিন তালাক:** রাগের মাথায় এক বসায় "তিন তালাক" উচ্চারণ করা বা লিখে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে চরম গুনাহের কাজ। রাসূল (সা.)-এর যুগে এক ব্যক্তি একসাথে তিন তালাক দিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন— "আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতেও আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে?" *(সুনানে নাসায়ী)*

- **ইসলামে বিচ্ছেদের সঠিক নিয়ম:** যদি কোনোভাবেই সংসার টিকিয়ে রাখা সম্ভব না হয়, তবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (যেমন: স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় মাত্র একটি 'তালাকে রাজঈ' বা প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দেওয়া) অগ্রসর হতে হয়, যাতে ইদ্দতকালীন সময়ের মধ্যে রাগ কমে গেলে আবার পুনরায় সংসার জোড়া লাগানোর সুযোগ থাকে।

সর্বোপরি একে অপরের উপর ধৈর্য (সবর) ও সহযোগিতা: দাম্পত্য জীবন কোনো মসৃণ রাস্তা নয়; এটি একটি দীর্ঘ পথচলা যেখানে ভালো সময় যেমন আসবে, তেমনি কঠিন পরীক্ষা বা মানসিক টানাপোড়েনের সময়ও আসবে। এই পুরো পথটা পার করার একমাত্র পাথেয় হলো ধৈর্য ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের কোনো আচরণ খারাপ লাগলেও ধৈর্য ধরতে, কারণ তার ভেতরেই হয়তো বড় কোনো কল্যাণ লুকিয়ে আছে।

- আল্লহ বলেন, “এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সৎভাবে জীবনযাপন করো। অতঃপর তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হতে পারে যে তোমরা এমন একটি জিনিসকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ অফুরন্ত কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।" *(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১৯)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি তার কোনো আচরণ সে অপছন্দ করে, তবে তার অন্য কোনো আচরণে সে সন্তুষ্ট হবে।" *(সহীহ মুসলিম)*

সংসার কোনো একজনের একক দায়িত্ব নয়, এটি একটি টিমওয়ার্ক। দুনিয়ার জীবনে এবং আখিরাতের জান্নাত পাওয়ার লড়াইয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সবচেয়ে বড় সহযোগী।

- **দ্বীনি কাজে সহযোগিতা:** রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই দম্পতির ওপর আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষণের দোয়া করেছেন, যারা রাতে তাহাজ্জুদের জন্য নিজে ওঠে এবং পরম ভালোবাসায় সঙ্গীর মুখে পানি ছিটিয়ে তাকেও ডেকে তোলে *(সুনানে আবু দাউদ)*।
- **সংসারের কাজে সহযোগিতা:** আমাদের প্রিয় নবী (সা.) পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ (রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপতি, নবী) হওয়া সত্ত্বেও ঘরে এসে স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করতেন, নিজের ছেঁড়া জুতো বা কাপড় নিজে সেলাই করতেন।

একটি সুখী পরিবার কেবল নিয়মের বেড়াজালে তৈরি হয় না, এর জন্য প্রয়োজন হয় হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর ভয়, পারস্পরিক ছাড় দেওয়ার মানসিকতা এবং একে অপরকে জান্নাতের পথ দেখানোর ব্যাকুলতা। যখন স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের ত্রুটিগুলোকে ঢেকে রেখে ধৈর্যের সাথে দ্বীনের ওপর অবিচল থাকবে, তখন দুনিয়ার কোনো ফিতনা বা শয়তানের চক্রান্ত সেই পরিবারকে ভাঙতে পারবে না। ইনশাআল্লাহ, এই পরিবারটি দুনিয়াতেও শান্তিময় হবে এবং আখিরাতেও সপরিবারে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) শিশুর জন্মের আগে ও পরে করনীয় দায়িত্ব

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকে যারা শিশু-কিশোর আগামী দিনে তারাই দেশ ও জাতির কাণ্ডারী। তারাই জাতির কর্ণধার। তাই আজকের শিশু-কিশোরদের যদি সঠিক পথে পরিচালিত করা না যায়, তবে তারা বিপথগামী হবে এবং তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবে। তাই শিশুদের কীভাবে ইসলামের পথে পরিচালিত করা যায়, ছোটবেলা থেকে তাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বদ্ধমূল করে দেওয়া যায়, আদর্শ ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়, জীবনের শুরুতেই নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করা যায়, এর সঠিক দিকনির্দেশনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

■ শিশুর পরিচয় :

সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায়, মানবজীবনের প্রাথমিক স্তর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক কালকে শৈশব বলা হয় এবং এই স্তরের মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়।

তবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ, আইন এবং ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী শিশুর সংজ্ঞা ও বয়সসীমায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (UNCRC) অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে শিশুর একটি সুনির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। "১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো মানব সন্তানই শিশু, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের অধীনে তার আগেই সাবালকত্ব অর্জন করে।" *(বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে এই সংজ্ঞাটিই রাষ্ট্রীয় ও আইনি কাজের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হয়।)*

ইসলামে শিশুর পরিচয় ও বয়সসীমা 'বয়স' বা বছরের চেয়ে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার ওপর বেশি নির্ভর করে।

- মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শুরু করে যতক্ষণ না সে 'বালিগ' বা সাবালক হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক (আরবিতে: 'তিফ্ল' طِفْل) বলা হয়।

- ছেলেদের ক্ষেত্রে স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাত এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড শুরু হওয়ার মাধ্যমে শৈশবের সমাপ্তি ঘটে এবং তারা পূর্ণ বয়স্ক হিসেবে গণ্য হয়। লক্ষণ প্রকাশ না পেলে সাধারণত ইসলামী ফিকাহবিদদের মতে ১৫ বছর পূর্ণ হলে তাকে আর শিশু ধরা হয় না।
- আল্লহ বলেন, "আর তোমাদের শিশুরা যখন সাবালকত্বে (পূর্ণ বয়সে) পৌঁছাবে, তখন তারাও যেন অনুমতি চায়—যেমন অনুমতি চেয়েছে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা..." (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৫৯)

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শিশু মনস্তত্ত্বে মানব শিশুর বিকাশকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

- নবজাতক (Neonatal): ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত।
- শিশু বা দুগ্ধপোষ্য (Infant): ১ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত।
- টডলার (Toddler): ১ বছর থেকে ৩ বছর পর্যন্ত (যখন শিশু হাঁটতে ও আধো-আধো বলতে শেখে)।
- প্রাক-বিদ্যালয়গামী শিশু (Preschooler): ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত।
- বিদ্যালয়গামী শিশু (School-age): ৬ থেকে ১২ বছর পর্যন্ত।
- কৈশোর (Adolescent): ১৩ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত (একে শিশুর শেষ স্তর বা বয়ঃসন্ধিকাল বলা হয়)।

সহজ কথায়, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শুরু করে সমাজ, আইন বা প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী পূর্ণ বয়স্ক বা সাবালক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানব জীবনের রূপালী সময়টিকে শৈশব এবং এই সময়কালের মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। শিশুরা হলো নিষ্পাপ, অনুকরণপ্রিয় এবং একটি দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

■ শিশু জন্মের পূর্ব প্রস্তুতি :

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মিলনের ফলে স্ত্রী গর্ভধারণ করে। এ গর্ভধারণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ পৃথিবীতে মানব সন্তান আগমনের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়। বংশ পরম্পরা বজায় থাকে। তাই গর্ভধারণের পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। এ সময়ে উভয়ের উপর কিছু বিধি-নিষেধ বর্তায়, যা মান্য করা অত্যাবশ্যক। কেননা যদি তা মেনে না চলা হয়, তাহলে মা ও শিশু উভয়ের জীবন ঝুঁকিতে থাকে। এমনকি অনেক সময় মা কিংবা শিশু অথবা উভয়েই

মারা যেতে পারে। তাই এ ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নে গর্ভধারণের সময় থেকে নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠের আগ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর করণীয় কিছু আবশ্যকীয় বিষয়াবলী উল্লেখ করা হলো।

১.গর্ভধারণের সঠিক সময় নির্ধারণ করা: একটি সুস্থ-সবল শিশুর জন্ম এবং নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য পরিকল্পিত গর্ভধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ইসলামী জীবনবিধান—উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই গর্ভধারণের সঠিক সময় নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে মায়ের বয়স, শারীরিক-মানসিক সুস্থতা এবং দুটি সন্তানের মধ্যকার বিরতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

নিচে বিষয়টির প্রতিটি দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গর্ভধারণের সঠিক বয়স: চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, নারীদের গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং সঠিক বয়স হলো ২০ থেকে ৩৫ বছর।

- ২০ বছরের নিচে কেন নয়: এই বয়সে মেয়েদের জরায়ু এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তান ধারণের জন্য পুরোপুরি পরিপক্ক হয় না। ফলে গর্ভপাত, কম ওজনের শিশু জন্ম নেওয়া এবং প্রসবকালীন জটিলতার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে।
- ৩৫ বছরের ঊর্ধ্বে কেন নয়: ৩৫ বছরের পর নারীদের ডিম্বাণুর কার্যকারিতা ও গুণগত মান কমতে থাকে। এর ফলে গর্ভধারণে সমস্যা, গর্ভকালীন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং গর্ভস্থ শিশুর ডাউন সিন্ড্রোমসহ বিভিন্ন জন্মগত ত্রুটির ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

ওভুলেশন বা ডিম্বস্ফোটনের সঠিক সময় (Biological Timing): নারীর মাসিক চক্রের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গর্ভধারণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। একে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'ফারটাইল উইন্ডো' (Fertile Window) বা উর্বর সময় বলা হয়।

- সঠিক দিন নির্ধারণ: সাধারণত ২৮ দিনের নিয়মিত মাসিক চক্রের ক্ষেত্রে ১৪তম দিনে ওভুলেশন বা ডিম্বাণু নিঃসৃত হয়। এই ১৪তম দিনের আগের ৩-৪ দিন এবং পরের ১ দিন হলো গর্ভধারণের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।
- হাদীসের বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য: আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, জরায়ুতে শুক্রাণু ৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে, কিন্তু ডিম্বাণু মাত্র ১২ থেকে ২৪

ঘণ্টা জীবিত থাকে। তাই ওভুলেশনের সঠিক সময় হিসাব করে মেলামেশা করলে গর্ভধারণ নিশ্চিত হয়।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও মায়ের শারীরিক সক্ষমতা: ইসলামে গর্ভধারণের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বয়স বেঁধে দেওয়া না হলেও, নারীর শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইসলামী ফিকহের একটি অন্যতম মূলনীতি হলো—"লা দারারা ওয়া লা দিরার" (কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না)। যদি কোনো নারী শারীরিক বা মানসিকভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম না হন, তবে তাঁর সুস্থ হওয়া পর্যন্ত গর্ভধারণ বিলম্বিত করা উত্তম।

দুটি সন্তানের মধ্যবর্তী সঠিক বিরতি: একটি সন্তান জন্ম নেওয়ার পর পরবর্তী সন্তান গ্রহণের মাঝে একটি নির্দিষ্ট বিরতি রাখা মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্যই জরুরি। একে বলা হয় 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' বা পরিবার পরিকল্পনা।

- পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা: আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় সন্তানকে পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়েছেন: "আর মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর স্তন্যদান করবে, যদি কেউ স্তন্যদানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়..." (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৩৩)
- কুরআনের ইঙ্গিত: দুই বছর দুধ পানের এই সময়সীমা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, একটি শিশু পুরোপুরি মায়ের দুধের ওপর নির্ভরশীল থাকা অবস্থায় অন্য একটি শিশু গর্ভে এলে প্রথম শিশুটি পুষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে এবং মায়ের শরীরও ভেঙে পড়বে। তাই দুটি সন্তানের মাঝে অন্তত ২ থেকে ৩ বছরের বিরতি রাখা ইসলামী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম নির্দেশনা।

গর্ভধারণের সঠিক সময় কেবল শারীরিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না, বরং স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বোঝাপড়া এবং একটি শিশুকে পৃথিবীতে এনে তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মতো পরিবেশ ও মানসিক প্রস্তুতির ওপরও নির্ভর করে। পরিবারে নতুন অতিথি আসার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পারস্পরিক সম্মতি ও মানসিক প্রশান্তি অত্যন্ত জরুরি।

২. গর্ভবতী মায়ের যত্ন: গর্ভাবস্থা একটি নারীর জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর গর্ভস্থ শিশুর সঠিক বেড়ে ওঠা এবং নিরাপদ প্রসব নির্ভর করে। ইসলাম এবং আধুনিক চিকিৎসা

বিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই গর্ভবতী মায়ের বিশেষ যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত জোরালো নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নিচে গর্ভবতী মায়ের যত্নের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

মানসিক যত্ন ও পারিবারিক পরিবেশ: গর্ভাবস্থায় মায়ের মানসিক অবস্থা গর্ভস্থ শিশুর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই এই সময়ে মাকে সবসময় প্রফুল্ল, দুশ্চিন্তামুক্ত ও শান্ত শান্তিতে রাখা উচিত।

- স্বামীর প্রধান দায়িত্ব: গর্ভবতী মায়ের যত্নের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মেজাজ খিটখিটে বা আবেগপ্রবণ হতে পারে, এই সময়ে স্বামীকে পরম ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে।
- পবিত্র কুরআনের সান্ত্বনা: আল্লাহ তাআলা গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের কঠিন সময়ে মায়ের মানসিক প্রশান্তির প্রতি কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হযরত মরিয়ম (আ.)-এর ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়। যখন তিনি প্রসব বেদনায় কাতর ও চিন্তিত ছিলেন, তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল: "...তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পাদদেশে একটি ঝরনা ধারা সৃষ্টি করেছেন। ...অতএব আহার করো, পান করো এবং চোখ জুড়াও..." (সূরা মরিয়ম: ২৪-২৬)

শারীরিক যত্ন ও বিশ্রাম: গর্ভবতী মায়ের শরীর সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেশি পরিশ্রম করে, কারণ তার ভেতরে আরেকটি প্রাণ বড় হচ্ছে।

- **বিশ্রামের পরিমাপ:** চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, একজন গর্ভবতী মায়ের দৈনিক অন্তত **৮ ঘণ্টা রাতে** এবং দুপুরে খাওয়ার পর **২ ঘণ্টা** বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নেওয়া (বাম কাতে শোয়া উত্তম) উচিত।
- **ভারী কাজ বর্জন:** এই সময়ে ভারী বালতি তোলা, ঘর মোছা বা উবু হয়ে ভারী কাজ করা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে।
- **কুরআনের স্বীকৃতি:** মা কত কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, তা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন: "...তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে..." (সূরা লোকমান: ১৪)
- **ইসলামী শিথিলতা:** মায়ের শারীরিক কষ্টের কথা বিবেচনা করে ইসলাম গর্ভবতী নারীর জন্য সাময়িকভাবে রমযানের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতা শিথিল করেছে। তিনি পরবর্তীতে এই রোযা কাযা করে নিতে পারবেন। (সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ২২৭৪)

পুষ্টি ও খাদ্যাভ্যাসের যত্ন: গর্ভবতী মায়ের খাবার সাধারণ মানুষের মতো হলে চলে না। তাকে সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। (পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত সূচি রয়েছে)। তবে যত্নের অংশ হিসেবে খেয়াল রাখতে হবে যেন মা কোনোভাবেই দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত না থাকেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট নিয়মিত গ্রহণ করেন।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Antenatal Care): গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ডাক্তারী পরীক্ষা বা চেক-আপ করানো আবশ্যক।

- চেক-আপের সময়সূচি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে, একজন গর্ভবতী মায়ের পুরো গর্ভাবস্থায় অন্তত ৪ বার (বর্তমানে আদর্শ নিয়ম অনুযায়ী ৮ বার) ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত:
    1. প্রথমবার: ১৬ সপ্তাহের মধ্যে।
    2. দ্বিতীয়বার: ২৪-২৮ সপ্তাহের মধ্যে।
    3. তৃতীয়বার: ৩২ সপ্তাহের মধ্যে।
    4. চতুর্থবার: ৩৬ সপ্তাহের মধ্যে।
- টিকা ও পরীক্ষা: টিটি (ধনুষ্টঙ্কার) টিকা সময়মতো নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মিত ওজন মাপা, রক্তচাপ (Blood Pressure) পরীক্ষা করা এবং আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা প্রয়োজন।
- ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি: ইসলামে রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা গ্রহণকে সুন্নাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো..." (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৩৮৫৫)

ধর্মীয় ও আত্মিক যত্ন: গর্ভবতী মায়ের ইবাদত-বন্দেগি, কুরআন তিলওয়াত ও যিকির শিশুর আত্মিক গঠনে দারুণ ভূমিকা রাখে।

- মাকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে কষ্ট হলে বসে বা ইশারায় নামায পড়ার স্পষ্ট অনুমতি ইসলামে রয়েছে।
- মায়ের উচিত নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করা। যেমন কুরআনে শেখানো হয়েছে: "রব্বি হাবলি মিনাস সালিহীন।" (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন।) (সূরা আস-সাফফাত: ১০০)

৩. গর্ভবতী মায়ের খাবার: গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির ওপর গর্ভস্থ শিশুর শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য সরাসরি নির্ভরশীল। গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে পুষ্টির চাহিদা সাধারণ সময়ের চেয়ে অনেক বেড়ে যায়। ইসলাম এবং আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান—উভয় ক্ষেত্রেই গর্ভকালীন সময়ে পুষ্টিকর ও হালাল খাবার গ্রহণের প্রতি বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

নিচে গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাবারের তালিকা ও নিয়মাবলী বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা ও সুন্নাহর আলোতে গর্ভকালীন খাবার: পবিত্র কুরআনে গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সময়ে পুষ্টিকর ও ক্লান্তি দূরকারী খাবার গ্রহণের চমৎকার ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত মরিয়ম (আ.) যখন প্রসব বেদনায় কাতর ছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর খাবারের জন্য খেজুর ও পানির ব্যবস্থা করেছিলেন।

- আল্লহ বলেন, "আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কাণ্ড নাড়া দাও, তা তোমার ওপর তাজা পাকা খেজুর ফেলবে। অতএব আহার করো, পান করো এবং চোখ জুড়াও..." (সূরা মরিয়ম, আয়াত: ২৫-২৬)
- খাবারের গুণগত মান (হালাল ও তৈয়্যিব): ইসলামে গর্ভবতী মাকে সবসময় হালাল ও পুষ্টিকর (তৈয়্যিব) খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ মায়ের উপার্জিত ও ভক্ষিত খাদ্যের প্রভাব সন্তানের স্বভাব-চরিত্রে পড়ে। "হে মানবমণ্ডলী! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার করো..." (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৮)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গর্ভবতী মায়ের সুষম খাদ্যতালিকা: চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতে, গর্ভবতী মায়ের খাদ্যতালিকায় প্রধান ৬টি খাদ্য উপাদান (শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ ও পানি) সঠিক অনুপাতে থাকা জরুরি। নিচে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

ক) প্রথম ত্রৈমাসিক (১-৩ মাস) ফলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার: গর্ভধারণের প্রথম তিন মাস শিশুর স্নায়ুতন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনের মূল সময়। এই সময়ে জরায়ুর ভেতরের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং শিশুর জন্মগত ত্রুটি (Neural Tube Defects) রোধ করতে ফলিক অ্যাসিড অত্যন্ত জরুরি।

- উৎস: গাঢ় সবুজ শাকসবজি (পালং শাক, ব্রকলি), ডাল, শিম, মটরশুঁটি, কমলা লেবু এবং চিকিৎসকের পরামর্শে ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট।

খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈমাসিক (৪-১০ মাস) উচ্চ প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার: এই সময়ে শিশুর হাড়, পেশি ও মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ ঘটে। তাই উচ্চ প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার বেশি বেশি গ্রহণ করতে হবে।

- আমিষ বা প্রোটিন (Protein): শিশুর শরীরের কোষ গঠনের জন্য প্রতিদিন প্রোটিন প্রয়োজন।
- উৎস: ডিম (প্রতিদিন অন্তত ১-২টি সেদ্ধ ডিম), ছোট ও বড় মাছ, চর্বিহীন মাংস, ডাল, বাদাম ও দুগ্ধজাত খাবার।
- ক্যালসিয়াম (Calcium): শিশুর হাড় ও দাঁত মজবুত করতে এবং মায়ের হাড়ের ক্ষয় রোধে এটি অপরিহার্য।
- উৎস: প্রতিদিন অন্তত ১ থেকে ২ গ্লাস খাঁটি দুধ, দই, পনির, ছোট মাছ (কাটাসহ) এবং সবুজ শাক।

গ) আয়রন ও রক্তস্বল্পতা দূরকারী খাবার: গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে রক্তের পরিমাণ প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পায়। তাই রক্তস্বল্পতা (Anemia) দূর করতে আয়রনযুক্ত খাবার খাওয়া আবশ্যক।

- উৎস: কলিজা, লাল মাংস, কচুশাক, ডালিম, আপেল, খেজুর, কিশমিশ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ও ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার (ভিটামিন-সি আয়রন শোষণে সাহায্য করে)।

ঘ) আঁশযুক্ত খাবার ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণ: গর্ভাবস্থায় হরমোনের পরিবর্তনের কারণে মায়েরা প্রায়ই কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এমন ধরনের খাবার পরিমাণ মতো খেতে হবে।

- উৎস: লাল চালের ভাত, লাল আটার রুটি, ওটস, ইসবগুলের ভুষি এবং তাজা ফলমূল ও শাকসবজি।

তরল খাবার ও পানির প্রয়োজনীয়তা: গর্ভবতী মায়ের শরীরে পানির ভারসাম্য ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। পানিশূন্যতা হলে মায়ের প্রস্রাবে ইনফেকশন এবং সময়ের আগে প্রসব (Preterm labor)-এর ঝুঁকি বাড়ে।

- করণীয়: প্রতিদিন অন্তত ৩ থেকে ৪ লিটার (১২-১৪ গ্লাস) নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। এছাড়া ডাবের পানি, তাজা ফলের রস, এবং পাতলা স্যুপ খাওয়া যেতে পারে।

যে সমস্ত খাবার সম্পূর্ণ বর্জনীয়: গর্ভবতী মায়ের সুস্থতার জন্য কিছু খাবার ও অভ্যাস এড়িয়ে চলা অত্যন্ত জরুরি:

- কাঁচা বা আধা-সেদ্ধ খাবার: আধা-সেদ্ধ ডিম, কাঁচা মাংস বা সামুদ্রিক মাছ (এতে সালমোনেলা বা লিস্টিরিয়া ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ হতে পারে)।
- অতিরিক্ত ক্যাফেইন: চা, কফি বা কোল্ড ড্রিঙ্কস অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না (দিনে ১ কাপের বেশি কফি নয়), কারণ এটি শিশুর কম ওজনের কারণ হতে পারে।
- উচ্চ পারদযুক্ত মাছ: বড় টুনা মাছ বা সামুদ্রিক হাঙ্গর জাতীয় মাছ।
- বাইরের খোলা ও বাসি খাবার: রাস্তার ধারের চাট, ফুচকা বা অস্বাস্থ্যকর তৈলাক্ত খাবার, যা গ্যাস্ট্রিক ও ডায়রিয়ার সৃষ্টি করে।

উল্লেখ্য যে, অনেক অসৎ ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের জন্য খাদ্য-দ্রব্যে ফরমালিন ও নানা প্রকারের বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রণ করে। যা খাওয়া সকলের জন্যই ক্ষতিকর। তাই এই ধরনের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় মা ও শিশু উভয়ের শরীর শঙ্কা ও ঝুঁকিতে থাকবে।

বিশেষ পরামর্শ: গর্ভাবস্থায় যেকোনো খাবার বা পুষ্টির সাপ্লিমেন্ট (আয়রন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি) গ্রহণের আগে একজন গাইনোকোলজিস্ট বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উত্তম।

৪. গর্ভকালীন সমস্যা:

গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের কিছু সমস্যা হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এতে ভয় পাওয়া বা ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বরং অভিজ্ঞ ডাক্তারের নিকট গিয়ে সমস্যা নির্ণয় করে তার প্রতিকার বিধান করা উচিত। গর্ভকালীন সময়ে যেসব সমস্যা হতে পারে তা হলো কোষ্ঠকাঠিন্য, কোমর ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, অর্শ্বরোগ, অনিদ্রা, অবসাদ, ক্ষুধামন্দা, তল পেটে ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া, বমি হওয়া, নাক অথবা দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত বের হওয়া, ইত্যাদি। তবে এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই যে, আমাদের দেশে প্রতিবছর গর্ভকালীন বিভিন্ন জটিলতা, সমস্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার কারণে অনেক গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু ঘটে। আবার অনেক গর্ভধারী

মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা মৃত সন্তান প্রসব করে। তাই এ সময়ে অসচেতন থাকা মোটেই উচিত নয়। কোনো রোগকেই অবহেলা করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং যত দ্রুত সম্ভব তার প্রতিকার বিধান করা আবশ্যক।

৫. গর্ভাবস্থায় ইবাদত-বন্দেগি:

গর্ভাবস্থায় মায়ের কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, চাল-চলন ও কথা-বার্তার বিস্তর প্রভাব গর্ভস্থশিশুর উপর পড়ে। এ সময়ে গর্ভবতী মা যদি বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি করেন; আল্লাহ তা'আলার যিকির-আযকার করেন; কুরআন তেলাওয়াত করেন; ইসলামী বই-পুস্তক পাঠ করেন; কথা-বার্তা, চাল-চলন ও আচার-আচরণে ইসলামী রীতিনীতির অনুসরণ করেন, তাহলে একদিকে মা যেমন অশেষ সওয়াবের অধিকারী হবেন এবং আল্লাহ তা'লার কাছে অত্যন্ত প্রিয় হবেন। অন্যদিকে গর্ভস্থ সন্তানের উপর এর ভালো প্রভাব পড়বে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এ সন্তান নেক ও সৎ হয়ে গড়ে উঠবে। গর্ভবতী মায়ের জন্য বিশ্রাম ও ঘুম বেশি জরুরী। তা না হলে মা ও গর্ভস্থশিশু উভয়ের স্বাস্থ্যহানী ঘটতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে। তাই ডাক্তারগণ গর্ভবতী নারীদেরকে অধিক ঘুমের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর ফলে অনেক গর্ভধারীনি মা অনেক সকাল অবধি ঘুমান। অলসতা ও অবহেলা করে ফজরের নামায কাযা করে দেন। কিন্তু কখনোই এমনটি করা উচিত নয়। কেননা ইসলামী শরী'আতে নামাযের গুরুত্ব অনেক। যথাসময়ে নামায আদায় করা ফরয। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا .

'নিশ্চয়ই নামায মুমিনদের জন্য এক সময়-নির্ধারিত ফরয।' (সূরা নিসা, ১০৩)

কাজেই নিজের স্বাস্থ্যের দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, অনুরূপভাবে নামাযের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। কেননা সময়মত নামায আদায় না করা গুরুতর অপরাধ। এর শাস্তি খুবই ভয়াবহ। তাই ঘুমের চাপ বেশি হলে ইশার নামাযের পরপরই ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত। যেন ফজরের নামাযের সময় ঘুম থেকে উঠতে কোনো অসুবিধা না হয়। ঘুমের চাপ খুব বেশি হলে ফজরের নামায আদায়ের পরও কিছু সময় ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য নামাযও যথা সময়ে আদায় করা আবশ্যক। তবে গর্ভবতী মায়ের নামায আদায়ের সময় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন রুকু-সেজদা করার সময় পেটের উপর চাপ না পড়ে এবং গর্ভস্থ শিশু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। প্রয়োজনে ইশারায় রুকু-সেজদা করে নামায আদায় করবে। তবুও নামায ছেড়ে দেওয়া কিংবা নামাযের

প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই। নামায ছেড়ে দেওয়ার ভয়াবহতা প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

'তাদের পরে আসলো এমন এক নষ্ট প্রজন্ম, যারা নামাযকে বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং তারা অচিরেই জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' (সূরা মারইয়াম, ৫৯।)

আর সময়মত নামায আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগিও করা উচিত। বিশেষত বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকির-আযকার করা। আর রমযান মাসে যদি গর্ভবতী মায়ের কোনো অসুবিধা না হয়, তাহলে রোযা রাখতে হবে। যদি রোযা রাখার কারণে গর্ভবতী মায়ের অথবা গর্ভস্থ শিশুর জীবনের ঝুঁকি ও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে এবং ডাক্তার রোযা না রাখার পরামর্শ দেন, তাহলে রোযা ভেঙে ফেলা উচিত। তবে সুস্থ হওয়ার পর ভেঙে ফেলা রোযাগুলোর কাযা আদায় করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববতীদের জন্য যেমন রোযা ফরয করা হয়েছিল, তেমনি তোমাদের জন্যও ফরয করা হলো। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (এই রোযা) নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য, তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে (এবং এ কারণে তাকে নির্ধারিত দিনের রোযা ছাড়তে হয়,) তাহলে সে অন্য দিনগুলোতে রোযা রেখে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করবে। যাদের রোযা রাখতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তারা ফিদিয়া হিসেবে (একটি রোযার জন্য) একজন গরীবকে (একদিনের) খাদ্য দিবে। তবে স্বেচ্ছায় যে সৎ কাজ করবে তার জন্য তা অধিকতর মঙ্গলজনক হবে। রোযা রাখাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞানী হও। রমযান মাস-এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন, মানুষের জন্য দিকনির্দেশনা এবং সৎপথ ও ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডের স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে

তারা যেন রোযা রাখে। আর যে অসুস্থ কিংবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে রোযা রেখে রোযার সংখ্যা পূর্ণ করবে। (সূরা বাকারা, ১৮৩-১৮৫।)
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান। তিনি তোমাদের জন্য কঠিন চান না, যেন তোমরা দিনের সংখ্যা পূর্ণ করো। আর আল্লাহ যে তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন সেজন্য তার মহিমা বর্ণনা করো এবং তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকো।'
এ আয়াতগুলোর দ্বারা রোযার গুরুত্ব ও ফজিলত বুঝা যায়। পাশাপাশি আরেকটি বিষয় সর্ম্পকে জানা যায় যে, যদি রোযা রাখা কোনো ব্যক্তির জন্য কষ্টকর হয় এবং তার শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়, কিংবা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে ইসলামী শরী'আত এমতাবস্থায় রোযা না রাখার অবকাশ দিয়েছে। তবে সুস্থ হওয়ার পর ভেঙে ফেলা রোযাগুলো অবশ্যই কাযা আদায় করতে হবে।

■ শিশু জন্মের পর করণীয়:

১. স্বাগত জানানো: কোনো মুসলিম ভাইয়ের সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে তাকে মোবারকবাদ জানানো, তার আনন্দে আনন্দিত হওয়া এবং তার পরিবার ও সন্তানের জন্য কল্যাণ কামনা করা মুস্তাহাব। হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সন্তানটিকে কবুল করে নিবেন এবং তাকে উত্তমভাবে প্রতিপালন করবেন। এছাড়া এরূপ অন্তরিকতা প্রকাশের দ্বারা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে এবং সামাজিক ঐক্য সুরক্ষিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আনন্দ প্রকাশ করা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং মা ও শিশুকে হাসিমুখে স্বাগত জানানো ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। ইসলামে ছেলে বা মেয়ে—উভয় সন্তানের জন্মেই সমানভাবে আনন্দিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

- **সুসংবাদ দেওয়া ও আনন্দ প্রকাশ:** সন্তান লাভের খবর শুনে একে অপরকে সুসংবাদ দেওয়া কুরআনী সংস্কৃতির অংশ। যেমন আল্লাহ তাআলা হযরত যাকারিয়া (আ.)-কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছিলেন: "অতঃপর ফেরেশতারা তাকে ডাকল, যখন সে কামরায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল—নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন..." (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৯)

- **অভিনন্দন ও দুআ করার নিয়ম:** শিশু ও তার পিতা-মাতাকে শুভেচ্ছা জানানোর একটি চমৎকার নিয়ম তাবেয়ী হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কাউকে অভিনন্দন জানালে এভাবে বলতেন: "আল্লাহ তোমার এই উপহারে (সন্তানে) বরকত দান করুন, তুমি যেন এই সন্তানের দাতার (আল্লাহর) প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারো, সন্তানটি যেন পূর্ণ বয়সে পৌঁছায় এবং তুমি যেন তার সুব্যবহার ও আনুগত্য লাভ করতে পারো।" (আল-আযকার, ইমাম নববী)

২. শিশু জন্মের পর আযান-ইকামত: শিশু দুনিয়াতে আসার পর তার কানে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর তাওহীদ, রিসালাত ও বড়ত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আযান ও ইকামত দেওয়া মুস্তাহাব/সুন্নাত। সাধারণত শিশুর ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিতে হয়। এর ফলে শিশু শয়তানের কুপ্রভাব থেকে নিরাপদে থাকে।

- হযরত রাফে (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "ফাতেমা (রা.)-এর ঘরে যখন হাসান (রা.) ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর কানে নামাযের আযানের মতো আযান দিতে দেখেছি।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৫১৪)

৩. তাহনীক করা: খেজুর বা কোনো মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য চিবিয়ে নরম করে নবজাতকের তালুতে আলতো করে ঘষে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে। কোনো বুযুর্গ, আলেম বা নেককার পরহেযগার ব্যক্তির মাধ্যমে এটি করানো সুন্নাত, যাতে তাঁর নেক আমলের বরকত শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

- হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে নবজাতক শিশুদের আনা হতো, তখন তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাহনীক করে দিতেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৮৬)

৪. মাথা মুণ্ডন করা: জন্মের সপ্তম দিনে শিশুর মাথার চুল সম্পূর্ণ কেটে ফেলা এবং সেই চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা (অথবা তার সমমূল্যের টাকা) আল্লাহর রাস্তায় সদকা করা সুন্নাত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এটি শিশুর মাথার ত্বক পরিষ্কার ও চুল মজবুত করতে সাহায্য করে।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দৌহিত্র হাসান (রা.)-এর আকীকা দেওয়ার সময় ফাতেমা (রা.)-কে বলেছিলেন: "তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজনের সমপরিমাণ রূপা সদকা করো।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১৫১৯)

৫. নামকরণ: শিশুর একটি সুন্দর, অর্থবোধক ও মার্জিত নাম রাখা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব। জন্মের প্রথম দিন বা সপ্তম দিন নাম রাখা সুন্নাত।

শিশুর যে ধরণের নাম রাখবে: ইসলামে এমন নাম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা শুনলে ভালো শোনায় এবং যার অর্থ চমৎকার। সবচেয়ে উত্তম হলো আল্লাহর গুণবাচক নামের শুরুতে 'আব্দ' (বান্দা) যোগ করে নাম রাখা (যেমন: আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান) অথবা নবী-রাসূল ও সাহাবী-সাহাবিয়াতদের নামে নাম রাখা। অহংকার প্রকাশ পায় বা মন্দ অর্থ বহন করে—এমন নাম রাখা নিষিদ্ধ।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আবদুর রহমান (রহমানের বান্দা)।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২১৩২)
- রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও বলেছেন: "কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজের নাম ও বাপের নামে ডাকা হবে, অতএব তোমরা তোমাদের নামগুলো সুন্দর রাখো।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ৪৯৪৮)

৬. আকীকা: সন্তান লাভের শুকরিয়াস্বরূপ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু জবেহ করাকে আকীকা বলে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সুন্নাত (কোনো কোনো ইমামের মতে ওয়াজিব)। ছেলে সন্তানের জন্য দুটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা এবং মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা আকীকা করতে হয়।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ছেলের পক্ষ থেকে দুটি সমমানের ছাগল এবং মেয়ের পক্ষ থেকে একটি ছাগল (আকীকা করবে)।" (সুনানে নাসায়ী, হাদীস: ৪২১৩)

আকীকা করার সময়: আকীকা করার সর্বোত্তম এবং সুন্নাতসম্মত সময় হলো শিশু জন্মের সপ্তম দিন।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "প্রত্যেকটি শিশু তার আকীকার সাথে বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে জবেহ করা হবে, তার নাম রাখা হবে এবং তার মাথা মুণ্ডন করা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: ২৮৩৮)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যদি কোনো কারণে সপ্তম দিনে আকীকা করা সম্ভব না হয়, তবে ১৪ বা ২১ তম দিনে করা উত্তম। তাও সম্ভব না হলে পরবর্তীতে যেকোনো সময় আদায় করা যাবে।

৭. খাৎনা (মুসলমানি): ছেলে শিশুদের খাৎনা বা মুসলমানি করানো ইসলামের অন্যতম 'ফিতরাত' বা প্রাকৃতির স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, খাৎনা করানোর ফলে পুরুষাঙ্গের বিভিন্ন মারাত্মক সংক্রমণ, ক্যানসার ও অন্যান্য রোগবালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "ফিতরাত (প্রাকৃতিক স্বভাব) পাঁচটি: খাৎনা করা, নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়ে ফেলা।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫৮৯১)

খাৎনা করানোর সময়: শৈশবেই খাৎনা করিয়ে নেওয়া উত্তম, কারণ এই সময়ে শিশুর ত্বক কোমল থাকে এবং ক্ষত দ্রুত শুকায়। কোনো কোনো সাহাবী ও তাবেয়ী সপ্তম দিনেই খাৎনা করিয়ে নিতেন। তবে সাধারণত শিশু একটু শক্ত-সমর্থ হলে (৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে) বা সাবালক হওয়ার পূর্বেই খাৎনা সম্পন্ন করা জরুরি।

৮. সন্তানের মৃত্যুতে সবর (ধৈর্য): সন্তানের অকাল মৃত্যু পিতা-মাতার জীবনের সবচেয়ে বড় এবং বেদনাদায়ক পরীক্ষা। এই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর ফয়সালার ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে ধৈর্য (সবর) ধারণ করলে এবং আল্লাহর প্রশংসা করলে পরকালে এর বিনিময় কেবলই জান্নাত।

- আল্লহ বলেন, "যারা বিপদে পতিত হলে বলে—নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত..." (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৫৬-১৫৭)
- রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ হরণ করলে? তারা বলে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা তখন কী বলেছে? ফেরেশতারা বলে, সে আপনার প্রশংসা করেছে এবং 'ইন্নালিল্লাহ...' পড়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমরা আমার এই বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করো এবং তার নাম রাখো 'বাইতুল হামদ' (প্রশংসার গৃহ)।" (সুনানে তিরমিযী, হাদীস: ১০২১)

সপ্তম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য

সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত এবং পিতা-মাতার কাছে একটি পবিত্র আমানত। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অসংখ্য দায়িত্ব রয়েছে। একটি আদর্শ ও নৈতিকতাসম্পন্ন পরিবার গঠনে এবং সন্তানের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে পিতা-মাতার এই দায়িত্বগুলো পালন করা অত্যন্ত জরুরি। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিন্যস্ত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো_

১. সন্তানকে ভালোবাসা (Loving the Children): সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য এক অনন্য উপহার এবং মানব বংশধারা টিকিয়ে রাখার প্রধান মাধ্যম। মানব শিশুর প্রতি পিতা-মাতার অন্তরে যে ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত হয়, তা কেবলই একটি জৈবিক বা মনস্তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং এটি মহান সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক বিশেষ ঐশ্বরিক গুণ বা 'রহমত'। একটি শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পেছনে পিতা-মাতার অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ভূমিকা অপরিসীম। ইসলাম এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান—উভয় শাস্ত্রই সন্তানকে ভালোবাসার বিষয়টিকে মানবীয় গুণাবলির শীর্ষস্থান দিয়েছে।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ ও ধর্মীয় গুরুত্ব: ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে সন্তানকে ভালোবাসা কেবল একটি প্রাকৃতিক অনুভূতিই নয়, বরং এটি একটি অন্যতম ইবাদত এবং পুণ্যময় কাজ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং উম্মতকে সন্তানদের প্রতি গভীর মহব্বত ও দয়া প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

- **ঐশ্বরিক দয়ার অংশ:** মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি যে দয়া ও ভালোবাসা বণ্টন করেছেন, পিতা-মাতার অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তারই একটি অংশ। হাদীসে এসেছে: "আল্লাহ তাআলা রহমতকে একশত ভাগে বিভক্ত করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র এক ভাগ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগৎ একে অপরের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে; এমনকি ঘোড়াও তার বাচ্চার ওপর থেকে খুর তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে যেন আঘাত না পায়।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস* নং: ৬০০০)

- **জান্নাত লাভের মাধ্যম:** সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও স্নেহ প্রদর্শন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত লাভের অন্যতম উসিলা। বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের ভালোবাসার ব্যাপারে ইসলামে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয় (অর্থাৎ কন্যা সন্তান দান করা হয়) এবং সে তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও ভালোবাসা প্রদর্শন করে, সেই কন্যা সন্তানরা কেয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢাল স্বরূপ হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১৪১৮)
- **হাদীসের বাস্তব দৃষ্টান্ত:** আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজের সন্তানদের এবং দৌহিত্রদের (হাসান ও হুসাইন রা.) প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তিনি সমাজে প্রচলিত জাহেলী যুগের কঠোরতা দূর করে সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরা ও ভালোবাসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের ভালোবাসো এবং তাদের প্রতি দয়া করো।" *(সুনানে বায়হাকী, হাদীস নং: ১১০৩৮)*

খ. সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা (Psychological & Sociological Importance): আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্ববিদদের মতে, শৈশবে পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত ভালোবাসা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

নিরাপত্তাবোধ তৈরি (Sense of Security): পিতা-মাতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা শিশুকে একটি নিরাপদ মানসিক পরিবেশ দান করে। শিশু যখন বুঝতে পারে যে সে তার পরিবারের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, তখন তার মধ্যে এক ধরনের আত্মিক শক্তি ও সাহসিকতা জন্ম নেয়।

আবেগীয় বিকাশ (Emotional Development): যে শিশুরা শৈশবে অবহেলা বা ভালোবাসার ঘাটতিতে ভোগে, বড় হয়ে তাদের মধ্যে নানা ধরনের মানসিক জটিলতা যেমন—উদ্বেগ (Anxiety), বিষণ্ণতা (Depression) এবং উগ্র আচরণ দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে, ভালোবাসাপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা মানসিকভাবে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ইতিবাচক চিন্তাসম্পন্ন হয়।

সামাজিকীকরণ ও সহানুভূতিশীলতা: পিতা-মাতার ভালোবাসা দেখে অভ্যস্ত শিশুটি বড় হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য মানুষের প্রতিও সহানুভূতিশীল হতে শেখে। অর্থাৎ, পারিবারিক পরিমণ্ডলে ভালোবাসার চর্চা পরোক্ষভাবে একটি সুন্দর ও অহিংস সমাজ গঠনে অবদান রাখে।

গ. ভালোবাসা প্রকাশের সঠিক রূপ: সন্তানকে ভালোবাসার অর্থ কেবল মুখে 'ভালোবাসি' বলা বা দামি উপহার কিনে দেওয়া নয়। প্রকৃত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিচের বিষয়গুলোর মাধ্যমে:

- সন্তানের সাথে গুণগত সময় (Quality Time) কাটানো।
- তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তাদের অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।
- তাদের ছোট ছোট অর্জন ও ভালো কাজের জন্য প্রশংসা ও উৎসাহ দেওয়া।

সুতরাং সন্তানকে ভালোবাসা পিতা-মাতার কোনো করুণা বা ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি সন্তানের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক অধিকার। ইসলাম সন্তানকে ভালোবাসার মাধ্যমে একদিকে যেমন পরকালীন পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে, অন্যদিকে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের পথ উন্মোচন করেছে। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের প্রতি এই কর্তব্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সচেতন থাকা।

২. পরিমিত আদর-সোহাগ ও স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়া (Proportional Affection and Balanced Love): সন্তানকে স্নেহ-ভালোবাসা দেওয়া যেমন পিতা-মাতার অপরিহার্য দায়িত্ব, তেমনি সেই ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বা আদর-সোহাগের ক্ষেত্রে ‘পরিমিতিবোধ’ বা ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিধান। ইসলাম এবং আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্ব—উভয় শাস্ত্রই অতি-আদর (Over-indulgence) এবং স্নেহহীন কঠোরতা (Emotional detachment)—এই দুই চরমপন্থারই তীব্র বিরোধিতা করে। সন্তানকে এমনভাবে আদর-সোহাগ দিতে হবে যা তার আত্মবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখবে, কিন্তু তাকে জেদি, অহংকারী বা অলস করে তুলবে না।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: স্নেহ ও শাসনের অনবদ্য ভারসাম্য: ইসলামী জীবনদর্শনে 'মধ্যপন্থা' বা ভারসাম্যের (Wasaṭiyyah) ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানদের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তবে তিনি তাদের অন্যায় আবদার বা চারিত্রিক বিচ্যুতিকে কখনোই প্রশ্রয় দিতেন না।

- **স্নেহ প্রদর্শনের সুন্নাহ:** জাহেলী যুগে সন্তানদের (বিশেষ করে কন্যা সন্তানদের) প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা হতো। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজ আচরণ দিয়ে

সেই প্রথা ভেঙেছেন। তিনি শিশুদের চুম্বন করতেন, বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাদের সাথে খেলতেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) (দৌহিত্র) হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে চুম্বন করলেন। তাঁর কাছে আকরা ইবনে হাবিস বসা ছিলেন। আকরা বললেন, "আমার দশটি সন্তান রয়েছে, আমি তাদের কাউকেই কখনো চুম্বন করিনি।" রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, *"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৯৯৭)*

- **অতি-আদরের নেতিবাচকতা এবং সংশোধন:** সন্তানকে অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া বা তার প্রতিটি অন্যায় আবদার মেনে নেওয়াকে ইসলাম সমর্থন করে না। পবিত্র কুরআনে সন্তানকে পিতা-মাতার জন্য 'ফিতনাহ' বা পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে: "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল এক পরীক্ষা।" *(সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৫)*

এখানে পরীক্ষা বলার একটি অন্যতম কারণ হলো, অনেক সময় সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা পিতা-মাতাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে, যার ফলে তারা সন্তানের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। ইসলাম স্নেহ দিতে বলে, কিন্তু যেখানে শাসন প্রয়োজন, সেখানে অত্যন্ত মৃদু ও সংশোধনমূলক উপায়ে শাসনেরও নির্দেশ দেয়, যা পরিমিতিবোধের পরিচায়ক।

খ. আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: অতি-আদর বনাম পরিমিত আদর (Psychological Perspective): আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্বে পিতা-মাতার আচরণকে মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে "Authoritative Parenting" বা 'ভারসাম্যপূর্ণ অভিভাবকত্ব'-কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, যেখানে পরিমিত আদর ও নিয়মানুবর্তিতার এক চমৎকার সমন্বয় থাকে।

১. অতি-আদরের কুফল (The Danger of Spoiling): সন্তান যা চায়, তাকে যদি বিনাপ্রশ্নে এবং পরিমাণের চেয়ে বেশি দেওয়া হয় (Over-indulgence), তবে তার মধ্যে 'উপাধি পাওয়ার মানসিকতা' (Entitlement complex) তৈরি হয়। এমন শিশুরা মনে করে পৃথিবীর সবকিছু তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে। ফলে তারা পরবর্তীতে বাস্তব জীবনের সামান্যতম ব্যর্থতা, কষ্ট বা অন্যের 'না' শব্দটা মেনে নিতে পারে না।

২. স্নেহহীনতার কুফল (The Danger of Deprivation): অন্য চরমপন্থা হলো সন্তানের সাথে সবসময় রুক্ষ আচরণ করা বা তাকে আদর না করা। এর ফলে শিশুর

মধ্যে তীব্র নিরাপত্তাহীনতা (Insecurity) এবং হীনম্মন্যতা (Inferiority complex) তৈরি হয়। তারা স্নেহ খোঁজার জন্য অনেক সময় বাইরের ভুল পথে বা ভুল মানুষের দিকে ধাবিত হয়।

৩. পরিমিত আদরের সুফল: পরিমিত আদর ও সোহাগের মাধ্যমে শিশু বোঝে যে সে ভালোবাসার পাত্র, কিন্তু একই সাথে সে এটাও শেখে যে জীবনের প্রতিটি জিনিসের একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এটি শিশুর মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-regulation) এবং আবেগীয় পরিপক্কতা (Emotional intelligence) তৈরি করে।

গ. পরিমিত আদর ও স্নেহ বজায় রাখার ব্যবহারিক উপায়: গবেষণার আলোকে, পারিবারিক জীবনে এই পরিমিতিবোধ বজায় রাখার জন্য পিতা-মাতার করণীয়সমূহ:

- আচরণ ও আবদারের পার্থক্য বোঝা: সন্তানের অনুভূতির প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল (স্নেহপূর্ণ) হতে হবে, তবে তার অযৌক্তিক বা ক্ষতিকর আবদারের সামনে কঠোর (দৃঢ়) থাকতে হবে।
- ভালো কাজের পুরস্কার, অন্যায়ের সংশোধন: সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে তাকে জড়িয়ে ধরে বা চুমু খেয়ে প্রশংসা করা উচিত। আবার কোনো ভুল করলে আদরের ছলে তাকে আড়ালে ডেকে তার ভুলটি বুঝিয়ে বলা উচিত।
- শর্তহীন ভালোবাসা, কিন্তু শর্তযুক্ত সুবিধা: সন্তানকে বোঝাতে হবে যে পিতা-মাতার ভালোবাসা কোনো শর্তের ওপর নির্ভর করে না (সে ভুল করলেও পিতা-মাতার সন্তানই থাকবে), তবে দামি খেলনা, অতিরিক্ত গ্যাজেট বা বাইরের সুযোগ-সুবিধাগুলো তার আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে।

সুতরাং সন্তান প্রতিপালনে পরিমিত আদর-সোহাগ হলো একটি সুস্বাদু রান্নায় লবণের মতো—যা কম হলে যেমন স্বাদহীন বা রুক্ষ হয়ে যায়, তেমনি বেশি হলে পুরো জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। একজন আদর্শ পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও সুস্থ মানসিকতা গঠনে স্নেহ এবং নিয়মানুবর্তিতার এই সুক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখা অন্যতম প্রধান ঈমানী ও সামাজিক দায়িত্ব।

৩. ছেলে-মেয়ের মাঝে সমতা রক্ষা করা (Maintaining Gender Equality Among Children): পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তানদের মাঝে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান মনস্তাত্ত্বিক ও আইনি দায়িত্ব। বিশেষ করে পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে কোনো প্রকার বৈষম্য না করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাম্য বজায় রাখা

একটি সুস্থ সমাজ ও ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার গঠনের মূল শর্ত। প্রাচীন জাহেলী যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে কন্যা সন্তানের ওপর পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়ার যে নেতিবাচক মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়, ইসলাম এবং আধুনিক মানবাধিকার দর্শন তার তীব্র বিরোধিতা করে।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: বৈষম্যের অবসান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা: ইসলামী শরীআতে সন্তানদের মাঝে 'ইনসাফ' বা ন্যায়বিচার করাকে ওয়াজিব (আবশ্যক) করা হয়েছে। উপহারসামগ্রী প্রদান, সদ্ব্যবহার, শিক্ষা এবং আদর-স্নেহের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

- **জাহেলী মানসিকতার নিন্দা:** পবিত্র কুরআনে প্রাক-ইসলামী যুগের কন্যা সন্তান জন্মের খবর শুনে পিতা-মাতার মুখ কালো হয়ে যাওয়ার কুৎসিত মানসিকতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে: "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে।" *(সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮)*

ইসলাম এই অন্ধকার দূর করে ঘোষণা করেছে যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে—তা সম্পূর্ণ আল্লাহর দান এবং উভয়ই সমান মর্যাদার অধিকারী।

- **আচরণ ও উপহারে সমতার নির্দেশ:** সন্তানদের কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে বা তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা.) কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন।
- আমীর বিন শারাহীল (রা.) থেকে বর্ণিত, নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে আসলেন এবং বললেন, "আমি আমার এই ছেলেকে একটি দাস উপহার দিয়েছি।" রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, *"তুমি কি তোমার সব সন্তানকেই এরূপ উপহার দিয়েছ?"* তিনি বললেন, "না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, *"তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ (সমতা) কায়েম করো।"* বশীর (রা.) ফিরে গিয়ে সেই উপহার প্রত্যাহার করে নেন। *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৫৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৬২৩)*
- **কন্যা সন্তানের বিশেষ মর্যাদা:** তৎকালীন সমাজে কন্যা সন্তানরা সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার হতো বলে, আল্লাহর রাসূল (সা.) কন্যা সন্তানের যত্নে ও ভালোবাসায় সমতা রক্ষাকারীদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন:

"যার তিনটি, দুটি বা একটি কন্যা সন্তান থাকবে, আর সে তাদের জীবিত দাফন করবে না (অপমান করবে না), তাদের ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেবে না এবং তাদের উত্তম দ্বীনি শিক্ষা দেবে—আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৫১৪৬)*

খ. সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা (Psychological & Sociological Framework): পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনের মধ্যে বৈষম্য করা হলে তা শিশুদের মনে স্থায়ী মানসিক ক্ষত তৈরি করে, যা সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

হীনম্মন্যতা ও ক্ষোভের জন্ম (Inferiority Complex and Resentment): যদি কোনো পরিবারে পুত্র সন্তানকে বেশি সুযোগ-সুবিধা, ভালো খাবার বা বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং কন্যা সন্তানকে ঘরের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অবহেলা করা হয়, তবে কন্যা সন্তানের মনে তীব্র হীনম্মন্যতা ও পরিবারের প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া পুত্র সন্তানটি অহংকারী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কে ফাটল: পিতা-মাতার বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে ভাই ও বোনের স্বাভাবিক ও মধুর সম্পর্কে হিংসা ও বিদ্বেষ (Sibling Rivalry) তৈরি হয়। তারা একে অপরকে প্রতিযোগী মনে করতে শুরু করে, যা পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট করে।

সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়া: জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কন্যা সন্তানকে যদি শিক্ষার সুযোগ ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে ছেলের সমান অধিকার না দেওয়া হয়, তবে একটি জাতি কখনো মেধা ও মননে স্বাবলম্বী হতে পারে না।

গ. সমতা রক্ষার ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ (Practical Application Areas): একটি পরিবারে ছেলে ও মেয়ের মাঝে সমতা নিশ্চিত করতে পিতা-মাতাকে প্রধানত ৩টি ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে:

- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্য:** ছেলেকে ভালো প্রতিষ্ঠানে পড়ানো আর মেয়েকে সাধারণ অবহেলায় রাখা যাবে না। উচ্চশিক্ষা ও পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকার উভয়ের জন্য সমান।
- **পারিবারিক দায়িত্ব বণ্টন:** ঘরের কাজ কেবল মেয়েরা করবে আর ছেলেরা শুধু বাইরে ঘুরবে—এই ধারণা পরিহার করতে হবে। ছেলেদেরও ঘরের ছোটখাটো

কাজে অভ্যস্ত করা উচিত এবং মেয়েদেরও বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা উচিত।

- **আবেগীয় মনোযোগ (Emotional Attention):** ছেলের কথা যেমন গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়, মেয়ের মতামত বা আবেগকেও ঠিক ততখানি মূল্যায়ন করতে হবে।

বিঃদ্রঃ মেয়ে সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে অবশ্যই পর্দার পরিবেশ কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় ফিতনা সৃষ্টির আশংকা থাকবে।

সন্তানদের মাঝে ছেলে-মেয়ের সমতা রক্ষা করা কেবল কোনো দয়া বা অনুকম্পা নয়, এটি তাদের জন্মগত ও মানবিক অধিকার। যে পিতা-মাতা শৈশবেই ছেলে ও মেয়ের মাঝে ইনসাফ করতে পারেন না, তাদের সন্তানরা বড় হয়ে দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনেও ইনসাফ বা অধিকারের ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। তাই একটি সুস্থ ও সমতাভিত্তিক আগামী প্রজন্ম গঠনে এই বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. স্বাধীনতা প্রদান ও জবাবদিহিতা (Granting Autonomy and Fostering Accountability): সন্তান প্রতিপালনের (Parenting) ক্ষেত্রে অন্যতম জটিল ও স্পর্শকাতর দিক হলো তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং পারিবারিক জবাবদিহিতার মধ্যে একটি সুস্থ ভারসাম্য বজায় রাখা। সন্তানকে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লোপ পায়; আবার তাকে সীমাহীন ও অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দিলে সে স্বেচ্ছাচারী, লক্ষ্যহীন ও বিপথগামী হয়ে উঠতে পারে। ইসলাম এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞান—উভয় ব্যবস্থাপনাই সন্তানকে বয়সানুযায়ী 'নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা' দেওয়ার পাশাপাশি তার মধ্যে 'জবাবদিহিতার মানসিকতা' গড়ে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেয়।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: আমানতদারী ও দায়িত্বশীলতার চেতনা : ইসলামী সমাজদর্শনে মানুষকে একদিকে যেমন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি (Free Will) দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তার প্রতিটি কাজের জন্য পরকালীন জবাবদিহিতা (Accountability) নিশ্চিত করা হয়েছে। সন্তান প্রতিপালনেও এই দুটি বিষয়ের নিখুঁত সমন্বয় রয়েছে।

- **পিতা-মাতার প্রথম জবাবদিহিতা:** সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়ার আগে পিতা-মাতাকে বুঝতে হবে যে, সন্তান তাদের কাছে একটি পবিত্র আমানত। এই আমানত রক্ষায় অবহেলা করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

- **বয়সানুযায়ী স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতার স্তর:** ইসলামে শিশুর বয়স ও পরিপক্কতা অনুযায়ী তার স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতার পরিধি নির্ধারিত হয়। যেমন—শৈশবে তাকে খেলার ও শেখার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার ওপর ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব অর্পিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তিন শ্রেণীর মানুষের ওপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ তারা জবাবদিহিতার বাইরে): ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, নাবালক শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৪০৩)*

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে সন্তানের নিজস্ব স্বাধীনতা যেমন বাড়ে, তেমনি তার নিজস্ব কাজের জবাবদিহিতাও শুরু হয়। পিতা-মাতাকে এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে (শৈশব থেকে কৈশোর) সন্তানকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সে স্বাধীনতার সঠিক ব্যবহার করতে পারে।

খ. মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Psychological Framework): আধুনিক শিশু মনস্তত্ত্বে প্যারেন্টিং স্টাইলকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, যে পিতা-মাতারা "Authoritative Parenting" (যেখানে ভালোবাসা ও নিয়মের ভারসাম্য থাকে) চর্চা করেন, তাদের সন্তানরা মানসিকভাবে সবচেয়ে বেশি সফল হয়।

স্বাধীনতা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা (The Need for Autonomy): সন্তানকে নিজের পোশাক পছন্দ করা, পড়ার বিষয় বেছে নেওয়া বা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান নিজে করার স্বাধীনতা দিলে তার মধ্যে 'আত্ম-কার্যকারিতা' (Self-efficacy) তৈরি হয়। এটি তাকে ভবিষ্যতের বড় বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহসী করে তোলে।

জবাবদিহিতা না থাকার কুফল (The Danger of Unchecked Freedom): যদি সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় কিন্তু সে কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে, টাকা কীভাবে খরচ করছে—তার কোনো হিসাব বা জবাবদিহিতা না থাকে, তবে সে সহজেই মাদকাসক্তি, কিশোর অপরাধ (Juvenile delinquency) বা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

সুস্থ জবাবদিহিতা বনাম গোয়েন্দাগিরি: জবাবদিহিতা মানে সন্তানের ওপর ২৪ ঘণ্টা গোয়েন্দাগিরি করা বা তাকে সারাক্ষণ সন্দেহের চোখে দেখা নয়। এটি হবে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, যেখানে সন্তান নিজ থেকেই তার সারাদিনের কর্মকাণ্ড, ভুলত্রুটি বা সফলতা পিতা-মাতার সাথে শেয়ার করবে।

গ. পারিবারিক জীবনে স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা সমন্বয়ের ব্যবহারিক রূপ:

- **সীমানা নির্ধারণ (Setting Boundaries):** সন্তানকে বোঝাতে হবে, "তুমি স্বাধীন, তবে তোমার স্বাধীনতার সীমা ততটুকুই যতটুকুতে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না এবং নিজের নৈতিক ক্ষতি হয় না।"
- **ভুলের দায় নেওয়া শেখানো:** সন্তান কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তাকে সরাসরি কঠোর শাস্তি না দিয়ে, সেই ভুলের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি তাকে নিজেকেই মোকাবেলা করতে দেওয়া উচিত। এতে সে বুঝতে পারবে যে তার প্রতিটি স্বাধীন সিদ্ধান্তের একটি ফলাফল (Consequence) রয়েছে।

সন্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হলো তার ডানাকে শক্তিশালী করা, আর জবাবদিহিতা শেখানো হলো তাকে দিকনির্দেশনা (Compass) দেওয়া, যেন সে ঝড়ের মধ্যেও সঠিক পথে উড়তে পারে। একটি আদর্শ পরিবারে পিতা-মাতা সন্তানকে এমন এক নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দেবেন, যা তাকে খাঁচামুক্ত করবে ঠিকই, কিন্তু উশৃঙ্খল করবে না।

৫. সন্তানদের সাথে হাস্য-রসিকতা (Humor and Playfulness with Children): পারিবারিক আবহে পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ককে মধুর, প্রাণবন্ত ও সুদৃঢ় করার অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক মাধ্যম হলো সন্তানদের সাথে সুস্থ হাস্য-রসিকতা ও কৌতুক করা। অনেক পরিবারে পিতা-মাতাকে কেবলই এক কঠোর শাসক বা গম্ভীর অভিভাবক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা সন্তানের মানসিক বিকাশে এক ধরনের ভীতিকর দূরত্ব তৈরি করে। ইসলাম এবং আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্ব—উভয় শাস্ত্রই এই দূরত্বের দেয়াল ভেঙে সন্তানের সাথে মাঝেমধ্যে কৌতুক ও আনন্দঘন মুহূর্ত কাটানোর জোর তাগিদ দেয়। এটি সন্তানের আবেগীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং তাকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখতে সাহায্য করে।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ: ইসলাম একটি স্বভাবজাত ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের স্বভাবসুলভ আনন্দ-বিনোদন ও হাস্যরসকে বারণ করে না; বরং একে চারিত্রিক সৌন্দর্যের অংশ মনে করে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সন্তানদের, দৌহিত্রদের এবং মদীনার শিশুদের সাথে অত্যন্ত মধুর কৌতুক ও রসিকতা করতেন।

- **শিশুদের সাথে কৌতুকের সুন্নাহ:** আল্লাহর রাসূল (সা.) অত্যন্ত গম্ভীর বা ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, বিশেষ করে শিশুদের সামনে তিনি ছিলেন এক পরম বন্ধু। হাদীসে এসেছে: হযরত আনাস ইবনে মালিক

(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে এত বেশি মিশতেন এবং কৌতুক করতেন যে, তিনি আমার ছোট ভাইকে (যার একটি পোষা পাখি মারা গিয়েছিল, তার মন ভালো করতে) রসিকতা করে বলতেন, *"হে আবু উমাইর! তোমার নুগায়ের (ছোট পাখিটি) কী করেছে?" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬১২৯)*

- **দৌহিত্রদের সাথে আনন্দঘন মুহূর্ত:** রাসূল (সা.) তাঁর দুই দৌহিত্র হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর সাথে মাটিতে উবু হয়ে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতেন এবং তাদের পিঠে চড়াতেন। তিনি তাদের আনন্দ দিতে নিজের জিহ্বা বের করে দেখাতেন, যা দেখে শিশুরা হেসে কুটি কুটি হতো। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত হাসান বা হুসাইন (রা.)-এর জন্য নিজের জিহ্বা বের করতেন। শিশুটি যখন জিহ্বার লাল আভা দেখত, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। *(আবু বকর ইবনে আবি শায়বাহ, আল-মুসান্নাফ)*
- **রসিকতার সীমারেখা:** ইসলামে রসিকতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে তাতে মিথ্যা, প্রতারণা বা কাউকে ছোট করার মানসিকতা থাকা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আমি রসিকতা করি ঠিকই, তবে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলি না।" *(জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯৯০)*

অতএব, পিতা-মাতা সন্তানের সাথে কৌতুক করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন কোনো অসত্য বা কাউকে উপহাস করার বিষয় তাতে যুক্ত না হয়।

খ. মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষামূলক গুরুত্ব (Psychological & Educational Benefits): আধুনিক শিশু-মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, যে পরিবারে পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে হাসিখুশি ও কৌতুকপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন, সেই পরিবারের শিশুরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া দেয়।

ভয় ও দূরত্বের অবসান (Bridging the Communication Gap): পিতা-মাতা যদি সারাক্ষণ গম্ভীর থাকেন, তবে সন্তান তাদের ভয় পেতে শুরু করে। ফলে সে নিজের মনের কথা, সমস্যা বা ভুলত্রুটি পিতা-মাতার কাছে লুকিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে, হাস্য-রসিকতার পরিবেশ থাকলে সন্তান পিতা-মাতাকে তার সবচেয়ে নিরাপদ বন্ধু মনে করে।

মানসিক চাপ হ্রাস ও প্রফুল্লতা: পড়াশোনার চাপ বা পারিপার্শ্বিক নানা কারণে শিশুরা মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। পারিবারিক হালকা কৌতুক ও হাসি-ঠাট্টা শিশুর

মস্তিস্কে 'ডোপামিন' ও 'এন্ডোরফিন' হরমোন নিঃসরণ বাড়ায়, যা তার মানসিক চাপ দূর করে মনকে সতেজ করে তোলে।

শিক্ষাদানের সহজ মাধ্যম: কৌতুকের ছলে বা হাসিখুশি পরিবেশে কোনো নীতিশিক্ষা দিলে শিশুরা তা খুব দ্রুত এবং আনন্দের সাথে গ্রহণ করে। কঠোর আদেশের চেয়ে আনন্দের মাধ্যমে দেওয়া শিক্ষা শিশুর মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

গ. সন্তানদের সাথে হাস্য-রসিকতার ব্যবহারিক রূপ:

- **একসাথে খেলাধুলা ও গল্প করা:** প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝেও কিছুটা সময় সন্তানের সাথে গল্প বলা, মজার ধাঁধা ধরা বা হালকা ইনডোর গেমসে মেতে ওঠা উচিত।
- **ভুলকে হাসিমুখে সংশোধন করা:** সন্তান কোনো ছোটখাটো বা অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তা নিয়ে চিৎকার না করে, মাঝেমধ্যে হালকা রসিকতার ছলে তাকে ভুলটি বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- **কাউকে নিয়ে উপহাস না করা:** রসিকতার ছলে সন্তানকে যেন অন্য কোনো মানুষকে (যেমন: গায়ের রঙ, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বা পেশা নিয়ে) উপহাস করা না শেখানো হয়। কৌতুক হবে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত।

সন্তানদের সাথে হাস্য-রসিকতা করা কোনো অহেতুক বা সময় নষ্টকারী বিষয় নয়, বরং এটি একটি চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিপালন শৈলী (Parenting Tool) এবং সুন্নাহর অনুকরণ। একটি সুখী, সুস্থ এবং ভারসাম্যপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ গঠনে পিতা-মাতার গম্ভীরতার খোলস ভেঙে সন্তানের হাসির খোরাক হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

৬. শাসনের সঠিক পন্থা (The Correct Method of Discipline): সন্তান প্রতিপালনের (Parenting) ক্ষেত্রে 'শাসন' একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং অপরিহার্য প্রক্রিয়া। তবে শাসনের মূল উদ্দেশ্য সন্তানকে কষ্ট দেওয়া বা তার ওপর ক্রোধ প্রকাশ করা নয়, বরং তাকে সংশোধন করা এবং একজন সুনাগরিক ও নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। ইসলাম এবং আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্ব—উভয় শাস্ত্রই প্রথাগত নিষ্ঠুর বা নির্যাতনমূলক শাসনের তীব্র বিরোধিতা করে এবং একটি ইতিবাচক ও সংশোধনমূলক অনুশাসন পদ্ধতির ওপর জোর দেয়। সন্তানকে এমন এক সুশৃঙ্খল পন্থায় শাসন করতে হবে, যা তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই তাকে ভুলের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে।

ক. ইসলামিক দৃষ্টিকোণ: দয়া ও সংশোধনমূলক অনুশাসন: ইসলামী অনুশাসনে সন্তানের ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামে শাসনের মূল ভিত্তি হলো 'দয়া' এবং 'সংশোধন'।

- **শিক্ষাদানে নম্রতার নীতি:** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনো কোনো শিশু বা অধীনস্থের গায়ে হাত তোলেননি। তিনি সবসময় নম্রতা ও বুঝানোর মাধ্যমে ভুল সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বক্ষেত্রে নম্রতা পছন্দ করেন।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬০২৪)। অন্য হাদীসে এসেছে: "নম্রতা যেখানেই থাকে, তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; আর যেখান থেকেই নম্রতা ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তাকে কলঙ্কিত করে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৫৯৪)*
- **ধাপভিত্তিক শাসন ও সর্বোচ্চ সীমা:** ইসলামে নামাজ বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অভ্যাসের ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিক শাসনের নীতি দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তাদের সালাতের নির্দেশ দাও, আর যখন দশ বছর হবে (তখনও সালাত না পড়লে) তার জন্য তাদের মৃদু শাসন করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।" *(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৯৫)*

ইসলামিক স্কলার ও ফকীহদের ব্যাখ্যা: এই হাদীসে উল্লেখিত 'প্রহার' বা শাসনের অর্থ কখনোই চড়-থাপ্পড় বা লাঠি দিয়ে আঘাত করা নয়। ফকীহগণের মতে, এটি হলো একটি প্রতীকী বা মৃদু শাসন, যা শরীরে কোনো দাগ বা জখম সৃষ্টি করবে না, মুখে বা সংবেদনশীল অঙ্গে আঘাত করা যাবে না এবং তা কেবলই সন্তানের অবহেলার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। রাসুল (সা.) রাগের মাথায় বা প্রতিশোধমূলকভাবে শাসন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

খ. আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ: ইতিবাচক অনুশাসন (Positive Discipline): আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্বে কঠোর শারীরিক ও মানসিক শাস্তিকে (Corporal Punishment) শিশুর ব্যক্তিত্ব ধ্বংসের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পরিবর্তে মনস্তত্ত্ববিদগণ "Positive Discipline" বা 'ইতিবাচক অনুশাসন' পদ্ধতির পরামর্শ দেন।

কঠোর বা সহিংস শাসনের কুফল: শিশুকে মারধর বা সবার সামনে অপমান করলে তার আচরণ সাময়িকভাবে সুধরেছে মনে হলেও, দীর্ঘমেয়াদে তার মনে পিতা-মাতার প্রতি ক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং জেদ তৈরি হয়। এমন শিশুরা বড় হয়ে মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত হয় (শাস্তি থেকে বাঁচতে) এবং তাদের মধ্যে উগ্র ও সহিংস আচরণ (Aggressive behavior) প্রকাশ পায়।

আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে বলা: সন্তান কোনো ভুল করলে তাকে সমাজ বা পরিবারের অন্য সদস্যদের সামনে অপমান না করে, আড়ালে ডেকে তার ভুলের নেতিবাচক প্রভাবটি বুঝিয়ে বলা উচিত। এতে সন্তানের আত্মমর্যাদাবোধ (Self-esteem) আঘাতপ্রাপ্ত হয় না।

যৌক্তিক ফলাফল (Logical Consequences): সন্তানকে সরাসরি আঘাত না করে তার ভুলের জন্য কিছু সাময়িক সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া যেতে পারে। যেমন: সন্তান কথা না শুনলে বা ভুল করলে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার প্রিয় খেলনা ব্যবহার করতে না দেওয়া বা তার কার্টুন দেখার সময় কমিয়ে দেওয়া। একে মনস্তত্ত্বে ‘টাইম-আউট’ বা 'যৌক্তিক পরিণতি' বলা হয়।

গ. পিতা-মাতার জন্য শিক্ষণীয় বর্জনীয় দিকসমূহ:

- **রাগের মাথায় শাসন না করা:** রাগ যখন চরমে থাকে, তখন কোনো সিদ্ধান্ত বা শাসন করা যাবে না। নিজেকে শান্ত করে তারপর সন্তানের সাথে কথা বলতে হবে।
- **তুলনা না করা:** "অমুকের ছেলে কত ভালো, তুমি এত খারাপ"—এভাবে অন্য শিশুর সাথে তুলনা করে সন্তানকে হীনম্মন্যতায় ভোগানো যাবে না।
- **আচরণ বনাম ব্যক্তি:** সন্তানের আচরণটি যে খারাপ তা তাকে বোঝাতে হবে, কিন্তু তাকে ব্যক্তি হিসেবে 'খারাপ' বা 'অপদার্থ' বলে গালি দেওয়া যাবে না। (যেমন: "তুমি ছেলে হিসেবে খুব ভালো, কিন্তু আজকে তুমি যে কাজটি করেছ তা একদম ঠিক হয়নি।")

সুতরাং শাসনের সঠিক পন্থা হলো দয়া ও দৃঢ়তার এক অপূর্ব মিশ্রণ। শাসন হতে হবে ডাক্তারের দেওয়া তেতো ওষুধের মতো, যা রোগীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় বরং রোগমুক্ত করার জন্য দেওয়া হয়। একজন আদর্শ পিতা-মাতা কখনোই সন্তানের প্রতি হিংস্র বা কঠোর হবেন না, বরং ভালোবাসার চাদরে জড়িয়ে তাকে সঠিক পথের দিশা দেবেন।

৭. সুন্দরভাবে কথা বলা শেখানো (Teaching Courteous Speech): কথাবার্তা ও বাচনভঙ্গি মানুষের ব্যক্তিত্বের আয়না। শৈশবে পরিবার থেকেই শিশুর ভাষারীতির ভিত্তি তৈরি হয়। সন্তানকে সত্য, স্পষ্ট এবং নম্র ভাষায় কথা বলা শেখানো পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য।

- পবিত্র কুরআনে কণ্ঠস্বর নিচু ও মার্জিত রাখার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। হযরত লোকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: "আর তোমার পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো; নিশ্চয়ই সব চেয়ে অপ্রীতিকর আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।" *(সূরা লোকমান, আয়াত: ১৯)*
- রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো কোনো অশোভন বা গালিগালাজপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করতেন না। তিনি বলেছেন: "মুমিন কখনো লানতকারী (অভিশাপকারী), গালিগালাজকারী, অশ্লীলভাষী বা কটুভাষী হতে পারে না।" *(জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯৭৭)*

সন্তানকে সুন্দরভাবে কথা বলা শেখানো কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি তার সামাজিক ও চারিত্রিক যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। ভাষা হলো মনের ভাব প্রকাশের বাহন; সেই বাহনটি যদি সুন্দর ও মার্জিত হয়, তবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তান সফল ও সমাদৃত হবে। পারিবারিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে পিতা-মাতাকে সন্তানের বাচনভঙ্গি গঠনে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে।

৮.শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন (Developing the Child's Personality): শিশুকে ছোট থেকেই একজন স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে সম্মান দেওয়া উচিত। তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য না করে বড়দের মজলিশে বসার সুযোগ দেওয়া, সালাম দেওয়া এবং তার যুক্তিসঙ্গত মতামতকে গুরুত্ব দিলে তার মধ্যে এক সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব (Personality) ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

- আল্লাহর রাসূল (সা.) শিশুদের ছোট মনে করতেন না, বরং বড়দের মতোই তাদের অধিকার ও মতামতকে সম্মান দিতেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ডানপাশে একজন বালক (ইবনে আব্বাস) এবং বামপাশে বয়োবৃদ্ধরা বসা ছিলেন। রাসূল (সা.) পানীয় পান করার পর বালকটিকে বললেন, "তুমি কি আমাকে অনুমতি দেবে যেন আমি এদের (বৃদ্ধদের) আগে দিই?" বালকটি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার বরকতের

ব্যাপারে আমি কাউকে প্রাধান্য দেব না।" অতঃপর রাসূল (সা.) সেটি তার হাতেই দিলেন। *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৩৫১)*

রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের দেখলে আগে সালাম দিতেন, যা শিশুর আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে দারুণ ভূমিকা রাখত। *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২১৬৮)*

৯.শিশুর মানসিক পরিচর্যা (Mental and Psychological Care): সন্তানের কেবল শারীরিক চাহিদাই নয়, তার মানসিক অবস্থা, ভয়, আনন্দ ও অনুভূতির প্রতি পিতা-মাতাকে সমান যত্নশীল হতে হবে। কোনো কারণে সন্তান মানসিক চাপে থাকলে তাকে ধমক না দিয়ে তার পাশে থাকা ও তাকে আশ্বস্ত করা পিতা-মাতার কর্তব্য।

- রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের মনস্তত্ত্ব গভীরভাবে বুঝতেন। তিনি সালাত দীর্ঘ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। তিনি বলেছেন: "আমি সালাত দীর্ঘ করার নিয়তে দাঁড়াবো, এমন সময় কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনলে আমার সালাত সংক্ষিপ্ত করি; কারণ আমি জানি যে তার মায়ের মন কতখানি ব্যথিত ও ব্যাকুল হয়।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭০৭)*

১০. আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করা (Awakening Self-Esteem): সন্তানকে এমন এক নৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে হবে যেন সে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতে পারে এবং কোনো অন্যায় বা অনৈতিক কাজের সামনে মাথা নত না করে। একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করার চেতনা শিশুর মনে প্রকৃত আত্মমর্যাদা তৈরি করে।

- আল্লাহর রাসূল (সা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে তাঁর শৈশবেই এই মহান আত্মমর্যাদার পাঠ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন: "হে বৎস! যখন তুমি কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে; আর যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছেই করবে। জেনে রেখো, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ যদি তোমার কোনো উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখেছেন তার বাইরে কোনো উপকার করতে পারবে না." *(জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ২৫১৬)*

১১. ধৈর্য ও সহনশীলতার অনুশীলন করানো (Cultivating Patience and Resilience): জীবনের নানা প্রতিকূলতা, ব্যর্থতা বা মনের মতো পরিস্থিতি না পেলেও সন্তান যেন ভেঙে না পড়ে, সেজন্য তাকে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতার বাস্তব শিক্ষা

দিতে হবে। পিতা-মাতার নিজেদের জীবনের ধৈর্যশীল আচরণই সন্তানের জন্য বড় পাঠশালা।

- লোকমান (আ.) তাঁর সন্তানকে জীবনের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছিলেন, যা কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে: "হে বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং তোমার ওপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এগুলো দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" *(সূরা লোকমান, আয়াত: ১৭)*

১২. জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেওয়া (Setting Life Goals and Vision): সন্তান যেন কেবল বৈষয়িক ও অন্ধ ক্যারিয়ারের দৌড়ে শামিল না হয়, বরং তার জীবনের মূল লক্ষ্য যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে একজন সফল ও কল্যাণকামী মানুষ হওয়া। পিতা-মাতা তাকে এই উচ্চ লক্ষ্য (Vision) নির্ধারণে দিকনির্দেশনা দেবেন।

- পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতাকে নিজেদের ও পরিবারের সদস্যদের পরকালীন জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।" *(সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬)*

১৩. স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া (Teaching Self-Reliance and Independence): সন্তানকে অলস ও পরনির্ভরশীল বানিয়ে না রেখে তাকে নিজের কাজ নিজে করা এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর হালাল উপার্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করার শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

- ইসলামে নিজের শ্রমে স্বাবলম্বী হওয়াকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন: "কারো জন্য নিজের হাতের উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আর আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের হাতের কামাই বা উপার্জন থেকে খেতেন।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২০৭২)*

১৪. সদুপদেশ ও নসীহত প্রদান করা (Offering Sound Advice and Counsel): পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো সময় ও সুযোগ বুঝে সন্তানকে দ্বীন, নৈতিকতা, সমাজ এবং বাস্তব জীবনমুখী সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও নসীহত দেওয়া, যা সন্তানের জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করবে।

- সন্তানদের নিয়মিত সদুপদেশ দেওয়া নবীদের সুন্নাহ। হযরত লোকমান (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক নসীহতের কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন: "স্মরণ করো, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুলুম।" *(সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩)*
- একইভাবে হযরত ইয়াকুব (আ.) মৃত্যুর পূর্বেও সন্তানদের নসীহত করেছিলেন: "ইয়াকুব তার সন্তানদের বলেছিল, হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" *(সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩২)*

অষ্টম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান ও সচ্চরিত্র গঠন

শিক্ষা মানব জীবনের উন্নতির সোপান। শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে; জীবন পরিচালনায় সঠিক পথের সন্ধান দেয়; আত্মোপলব্ধি, ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করে, শরীর ও আত্মার পরিপূর্ণ প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়। শিক্ষা মানুষের সুস্থ দেহ, পরিচ্ছন্ন মন ও সুন্দর ভবিষ্যৎ বির্নিমাণে সহায়তা করে এবং মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করে।

শিক্ষা বলতে সাধারণত কাউকে লিখে, বলে বা অন্যকোনো উপায়ে কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান দেওয়াকে বুঝায়, যা মানুষ তার পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকৃতি ও ব্যক্তি বিশেষের কাছ থেকে লাভ করে থাকে। ইসলামী শরী'আত শিক্ষা গ্রহণে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দিয়েছে। তাই আমাদের সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থ বিকাশ, সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বির্নিমাণ এবং পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সফলতা ও কল্যাণ লাভের জন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নিম্নে শিক্ষার পরিচয়, প্রকারভেদ, শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষা লাভের ধরণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

■ **শিক্ষার পরিচয় ও গুরুত্ব:**

ক. শিক্ষার পরিচয় (Definition of Education): 'শিক্ষা' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হলো 'তা'লীম' (التعليم), যার অর্থ জ্ঞানদান করা বা কোনো কিছু শেখানো। এর সাথে আরেকটি শব্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তা হলো 'তারবিয়াহ' (التربية), যার অর্থ হলো লালন-পালন, মানসিক পরিচর্যা ও চরিত্র গঠন। অতএব, ইসলামী পরিভাষায় শিক্ষা হলো—মানুষের সুপ্ত মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তাকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

খ. শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (Importance of Education): ইসলামে জ্ঞানার্জন করাকে প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক (ফরজ) করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূর করতে ইসলামের প্রথম বাণীই ছিল শিক্ষা সংক্রান্ত।

মহান আল্লাহ ওহীর সূচনালগ্নেই নির্দেশ দিয়েছেন: *"পাঠ করো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১)*

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: *"জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ (আবশ্যিক)।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ২২৪)*

■ শিক্ষার প্রকারভেদ (Types of Education):

শিক্ষা প্রধানত দুই প্রকার। ইসলাম জ্ঞানকে মানবজাতির কল্যাণের নিরিখে বিবেচনা করে। সন্তানকে ভারসাম্যপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পিতা-মাতাকে দুই ধরণের শিক্ষারই সমন্বয় করতে হবে:

ক. ইসলামী শিক্ষা (Islamic Education): যে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে, হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝে এবং পরকালীন মুক্তির পথ খুঁজে পায়, তাকে ইসলামী শিক্ষা বা দ্বীনি শিক্ষা বলা হয়। এটি মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে।

খ. সাধারণ শিক্ষা (General/Secular Education): পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান, গণিত, প্রযুক্তি, সমাজবিজ্ঞান ও ভাষা শিক্ষার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ অর্জন করা সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে এবং হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে এই শিক্ষা অর্জন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

■ শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি (Methodology of Education):

একজন ব্যক্তি জন্মের পর থেকে নানা উপায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা গ্রহণের এই প্রক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১.অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education): জন্মের পর থেকে মানুষ তার পরিবার, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রকৃতি থেকে আপনা আপনি যা শিখে থাকে, তাকে সাধারণত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। প্রতিটি মানুষ স্বভাবতই এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের একজন শিক্ষার্থী। এই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ও কৃত্রিম আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। জীবন যুদ্ধে অন্যকে দেখে, অন্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, কোনো ভালো কিংবা বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মানুষ এই অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করে থাকে। পৃথিবীতে যখন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না, তখন মানুষ এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতিই ছিল তখন শিক্ষা গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। আধুনিক

যুগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আধিপত্য থাকলেও শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, আচার-আচরণ, সামাজিকতা, শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্র গঠনে এখনো এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যকারিতা ও প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আগের যুগে শিশু-কিশোরদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও পারপার্শ্বিক অবস্থা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতো। কিন্তু আধুনিক যুগে এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সাথে যুক্ত হয়েছে রেড়িও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট এবং আরো অনেক কিছু। শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই এসব মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। একজন নিরক্ষর ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিও জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির একজন শিক্ষার্থী। এক কথায় বলতে গেলে, পৃথিবীর সবাই এই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়া শিশু তার পরিবার, বিশেষ করে পিতা-মাতার আচরণ, পারিবারিক পরিবেশ এবং চারপাশ থেকে অনুকরণের মাধ্যমে যা শেখে, তা-ই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"প্রত্যেক শিশুই স্বভাবজাত দ্বীনের (ইসলামের) ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ১৩৮৫)*

— এটি প্রমাণ করে শিশুর প্রাথমিক গঠনে পরিবারের প্রভাব কতটা তীব্র।

২.উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education): যুগের চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গিয়ে অল্প খরচে দক্ষতা প্রদানের জন্য সাময়িকভাবে যে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়, সেটাই হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Non-formal Education)। এটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মতো একেবারে প্রাকৃতিক ও অপরিকল্পিত নয়, আবার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মতো গুছানো, পরিমার্জিত ও নিয়ন্ত্রিতও নয়। বরং এ দু'টির মাঝামাঝি হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি। গণশিক্ষা ও স্বাক্ষরতা কর্মসূচী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যেসব লোকেরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে যুক্ত হতে পারেনি কিংবা যুক্ত হওয়ার পরও কোনো কারণে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রণীত হয়েছে। এ শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শুধু সার্টিফিকেট অর্জনই মূল উদ্দেশ্য নয়,

বরং একজন ব্যক্তির কার্যক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ানো হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য।

৩.আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education): আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝায়, যা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত এবং অনেকটা বয়সের সাথে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার সর্বশেষ ও আধুনিকরূপ হচ্ছে এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education)। দীর্ঘ মেয়াদী, সুপরিকল্পিত, স্তরভিত্তিক, উদ্দেশ্যমূলক এবং সার্টিফিকেট প্রাপ্তির সুব্যবস্থা সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার নাম হলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর সর্বত্রই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। যা সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এই তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। শিশুর বয়স যখন পাঁচ থেকে সাত বছর হয়। তখন মকতব, কওমী মাদরাসা, ইবতেদায়ী মাদরাসা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্ডেন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর মাধ্যমে তাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়ে থাকে।

■ শিক্ষ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন:

শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠানোর পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা সেখানে শিক্ষকদের মাধ্যমে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, নীতি-নৈতিকতা, নিয়ম-কানুন, উত্তম আচার-ব্যবহার ও জীবন ঘনিষ্ঠ অন্যান্য বিষয়াবলী শিক্ষা দেওয়া হয়, যা শিশু-কিশোরদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া শিশু-কিশোররা তাদের শিক্ষকদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মনে করে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা ও রীতিনীতিকে অনুকরণীয় আদর্শ মনে করে।

এ বিষয়টি অস্বীকারের সুযোগ নেই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশু-কিশোরদের মন-মানসিকতা ও চরিত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এই বয়সে তাদের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রে যে ছাপ অঙ্কিত হয়, তা সারাজীবন বিদ্যমান থাকে। তাই নিজেদের সন্তানাদির সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্র গঠনের জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে, যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মহোদয়গণ অধিক বিজ্ঞ, ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক ও স্নেহপরায়ণ, চরিত্রবান ও নীতিবান, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ করে, সদা সত্য বলে, কোমল ও মিষ্টভাষী, যারা

বৈষয়িক বিষয়াবলী শিক্ষা দানের পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে এবং যে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অত্যন্ত নিরাপদ, উন্নত ও মনোরম।

উল্লেখ্য যে, আজকের পৃথিবীতে যারা যতো বেশি শিক্ষিত, তারা ততো বেশি সভ্য জাতি হিসেবে স্বীকৃত। তাদের জীবন যাত্রার মান ততো বেশি উন্নত। আর যারা শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় যতো বেশি পিছিয়ে রয়েছে, তারা ততো বেশি অবহেলিত।

তাদের জীবন যাত্রার মান ততো বেশি অনুন্নত। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা একটি জাতির জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ। এই অশিক্ষার অভিশাপ থেকে আমাদের সবাইকে বেরিয়ে আসতে হবে। কেননা যদি আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা না থাকে, তাহলে আমরা যেমন দুনিয়াবী কাজ-কর্ম ভালোভাবে সম্পাদন করতে পারবো না, তেমনি দীনি কাজগুলোও সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হবো না। অনুরূপভাবে আমাদের সন্তানেরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারে, তবে তাদের জীবন হবে অসুন্দর এবং ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকারময়। তাই তাদের সুন্দর জীবন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বির্নিমাণে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। শিক্ষা গ্রহণের শুরুতে তাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে দিতে হবে। তাদের এ শিক্ষা গ্রহণ যেন হয় আত্মউন্নয়ন ও মানব সেবার মাধ্যমে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন। চাই সে শিক্ষা জাগতিক শিক্ষা হোক কিংবা ইসলামী শিক্ষা। কেননা শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য যদি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তবে এই শিক্ষা দ্বারা দুনিয়াতে লাভবান হওয়া গেলেও তা আখেরাতে কোনো কাজে আসবে না। সন্তানের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সঠিক পরিবেশ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান বেছে নেওয়া পিতা-মাতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি যেন কেবল জিপিএ (GPA) বা ক্যারিয়ার সচেতন না করে, বরং নৈতিকতা ও দ্বীনদারীর চর্চা বজায় রাখে—তা নিশ্চিত করতে হবে।

সন্তানকে এমন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো পিতা-মাতার জন্য বৈধ নয় যা তার ঈমান ও চরিত্র ধ্বংস করে।

■ ধর্মীয় ও ঈমানী ভিত্তির বিকাশ:

ক. ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে উৎসাহিত করা: জ্ঞান হলো আলো। জ্ঞান মানুষকে পথ দেখায়। জ্ঞান মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। তবে ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া শুধুমাত্র দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেকে পরকালীন জীবনে

সফলতা অর্জনের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুনিয়াবী জীবনে সফলতা অর্জনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তারা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং যারা ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, তাদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অথচ প্রকৃত জ্ঞান হলো ধর্মীয় জ্ঞান, দীনি জ্ঞান। ধর্মীয় জ্ঞান একদিকে যেমন পার্থিব জীবনকে সুন্দর করে, সম্মান ও সফলতা এনে দেয়, অন্যদিকে আখেরাতে মুক্তি লাভের পথ দেখায়। আখেরাতের অনন্ত জীবনে কল্যাণ ও সফলতা লাভ এবং জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখায় দগ্ধ হওয়া থেকে মুক্তি পেতে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই আমাদের নিজেদের যেমন ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করতে হবে, তেমনি আমাদের সন্তানদেরকেও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা (إقرأ)তুমি পড়ো সম্বোধনের মাধ্যমে মানবজাতিকে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ধর্মীয় জ্ঞান মানুষকে আল্লাহর পরিচয় পেতে সাহায্য করে, আল্লাহর আদেশ পালন ও নিষেধ বর্জনে উৎসাহিত করে। ধর্মীয় জ্ঞান মানুষকে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা দান করে। আল্লাহ তা'আলা ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

'মুমিনদের একসঙ্গে (অভিযানে) বের হওয়া সমীচীন হবে না। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ কেনো বের হয় না? (অর্থাৎ প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ বের হওয়া উচিত) যাতে তারা (শহরে অবস্থানকারীরা) দীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং তাদের লোকেরা (অভিযান থেকে) ফিরে এলে তাদেরকে (শিক্ষাদানের মাধ্যমে) সতর্ক করতে পারে।'(সূরা তাওবা, ১২২)

আল কুরআনের আরো অনেক আয়াতে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ধর্মীয় বিষয়াবলী জানার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনের পাশাপাশি হাদীসেও ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পর তা অন্যদেরকে শেখাতে বলা হয়েছে। কেননা ধর্মীয় জ্ঞান হলো নবীগণের মীরাস বা রেখে যাওয়া সম্পদ। আলেমগণ যার উত্তরাধিকারী। আর প্রত্যেক মীরাসের উত্তরাধিকারীগণ তাদের সম্পদ পরবর্তীদের জন্য রেখে যান। তেমনি নবীগণের উত্তারাধিকারী হিসেবে প্রাপ্তসম্পদ দীনি ইলম শুধু নিজেরা শিখে আমল করলে হবে না, বরং তা পরবর্তী

প্রজন্মকেও শিখিয়ে যেতে হবে এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। হাদীসে ধর্মীয় জ্ঞানার্জনকারীর অনেক মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান (ফিকহ) দান করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭১)*

সন্তানের কচি মনে আল্লাহর প্রতি মহব্বত এবং দ্বীনি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হবে।

খ. পরিশুদ্ধ ঈমানের শিক্ষা দেওয়া: চরিত্র গঠনের প্রথম ধাপ হলো সঠিক আকীদা বা পরিশুদ্ধ ঈমান। সন্তানকে শিরকমুক্ত খাঁটি তাওহীদের শিক্ষা শৈশবেই দিতে হবে, ঠিক যেভাবে হযরত লোকমান (আ.) দিয়েছিলেন।

"স্মরণ করো, যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোনো শরিক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুলুম।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৩)

গ. ধর্মীয় রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া: সালাত, সিয়াম, পরিচ্ছন্নতা এবং হালাল-হারামের প্রায়োগিক নিয়মসমূহ শৈশব থেকে অভ্যাসে পরিণত করাতে হবে।

■ **অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা:**

ক. সন্তানদের অবাধে টাকা-পয়সা না দেওয়া: জীবন ধারণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো টাকা-পয়সা। মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ জন্য সকলের উচিত বৈধভাবে হালাল পন্থায় তা উপার্জন করা। শরী'আত নির্দেশিত বৈধ পথে তা ব্যয় করা। ইসলামী শরী'আত সন্তান ভূমিষ্ঠের পর থেকে তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর অর্পণ করেছে। পিতা-মাতার অবর্তমানে নিকটাত্মীয়গণ সে দায়িত্ব পালন করবে। বিশেষত তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনীয় পোশাক-আশাক দেওয়া, লেখা-পড়ার ব্যয়-ভার বহন করা। আর সামর্থ্য থাকলে মাঝে মাঝে উপহার দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে ভালোকাজে উৎসাহিত করা। অনেক পিতা-মাতা সন্তানদের অবাধে টাকা-পয়সা দিয়ে থাকেন। তারা যখন যা বলে, যা চায় পূর্বাপর না ভেবে তা-ই দিয়ে থাকেন। অনেক সময় এতে সন্তানদের ভালো করতে গিয়ে অমঙ্গল হয়ে যায়। তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পেয়ে অধিক হারে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশে। এ সময় তারা বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভালো-মন্দের বাছবিচার করে না। এরূপ খারাপ সঙ্গীদের প্ররোচনায় তারা নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ করে। অপরাধ

প্রবনতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাদকাসক্ত হয়ে যায়। লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়। নিজের সুন্দর জীবন গঠনের কথা ভুলে যায়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের চিন্তা-চেতনাও তাদের হৃদয় থেকে বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এক অন্ধকার জগতের দিকে ধাবিত হয়। এভাবে একসময় বিপথগামীতার প্রান্তসীমায় পৌঁছে যায়। তাই প্রতিটি পিতা-মাতার এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। সন্তানদের প্রয়োজনে টাকা দিবে। তবে তার যথাযথ হিসেব নিবে। টাকা-পয়সা সত্যিকার অর্থেই দরকারি ও ভালো কাজে ব্যয় হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবে। কখনো প্রয়োজন পূরণের পর টাকা অতিরিক্ত হলে তা কৌশলে নিয়ে নিবে, যেন তা সন্তানের বিপথগমীতা ও সুন্দর জীবন ধ্বংসের কারণ না হয়। সন্তানকে তার চাহিদার অতিরিক্ত বা অবাধে টাকা-পয়সা দিলে সে অপচয়, বিলাসিতা এবং মরণঘাতী মাদকের পথে ধাবিত হতে পারে। ইসলামে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে।

"নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ২৭)

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে: *"এবং তোমরা মূর্খ ও নির্বোধদের হাতে তোমাদের সেই ধন-সম্পদ তুলে দিও না, যা আল্লাহ তোমাদের জীবন ধারণের মাধ্যম করেছেন।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫)*

খ. বন্ধু নির্বাচন (Peer Selection): কৈশোরে মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় তার বন্ধুদের দ্বারা। তাই সন্তান কার সাথে মিশছে, তার বন্ধুরা কেমন—পিতা-মাতাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং ভালো বন্ধু নির্বাচনে গাইড করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন বা আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব, তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৮৩৩)*

■ চরিত্র ও শিষ্টাচার গঠন (Character & Etiquette Building):

চরিত্র মানব জীবনের এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরী'আত ঈমানের পর উত্তম চরিত্র গঠনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করেছে, উত্তম চরিত্রকে নেক আমল হিসেবে অভিহিত করেছে। চরিত্রবান ব্যক্তি পরকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ লাভ করবে বলে সুসংবাদ প্রদান করেছে। সৎচরিত্রবান ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। পার্থিব জীবনেও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি লাভ করবে। মানুষের নিকট সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এ দৃষ্টিকোণ

থেকে বলা হয়, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তা'আলার অতিপ্রিয় ও পছন্দনীয় বান্দা।

ইসলামে উত্তম চরিত্র বলতে মানবীয় সত্ত্বার সামগ্রিক সুকুমার বৃত্তিকে বুঝানো হয়। যা প্রতিটি মানবসত্ত্বা পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে লাভ করে থাকে। জন্মগতভাবে প্রতিটি মানব সন্তানের চরিত্রের দু'টি দিক থাকে। কু-প্রবৃত্তি ও সু-প্রবৃত্তি। শৈশব থেকে প্রতিটি শিশু যেন কু-প্রবৃত্তিকে পদদলিত করে সু-প্রবৃত্তির উপর সুদৃঢ় থাকতে পারে, সেভাবে গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কেননা পরিবার-ই হলো প্রতিটি শিশুর প্রথম শিক্ষালয়। এই পরিবার থেকেই তাদের চরিত্র, চিন্তা-চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, মতাদর্শ ও সঠিক বিশ্বাসের জন্ম নেয়। যা পরবর্তীতে তাদের সামগ্রিক জীবনে প্রতিফলিত হয়। নিম্নে শিশু-কিশোরদের সৎচরিত্র গঠনে পিতা-মাতার করণীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো।

ক.শিষ্টাচার (Teaching Etiquette and Good Manners): সন্তানের সচ্চরিত্র গঠনের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো 'শিষ্টাচার'। আরবী ভাষায় একে বলা হয় 'আদব' (الأدب)। ইসলামী জীবনদর্শনে 'আদব' বা শিষ্টাচার কেবল একটি প্রশংসনীয় সামাজিক গুণই নয়, বরং এটি দ্বীনদারী ও ঈমানের পূর্ণতার পরিমাপক। শৈশবে পরিবার থেকে সন্তান যে সামাজিক ও ধর্মীয় শিষ্টাচার শেখে, তা-ই তার ভবিষ্যৎ জীবনের সামাজিক মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে। একজন সন্তান উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও তার মধ্যে যদি শিষ্টাচারের অভাব থাকে, তবে সমাজ ও পরিবারের কাছে সে কখনো সমাদৃত হতে পারে না। তাই সন্তানকে সুন্দর আদব ও শিষ্টাচার শেখানো পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান আমানতদারী ও দায়িত্ব।

শ্রেষ্ঠ উপহার ও নবীগণের আদর্শ: ইসলামী ঐতিহ্যে জ্ঞানার্জনের চেয়েও আদব বা শিষ্টাচার অর্জনকে অগ্রগণ্য মনে করা হতো। সালাফগণ (পূর্বসূরিগণ) বলতেন, "তুমি জ্ঞান অর্জনের আগে আদব বা শিষ্টাচার শেখো।" পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হলো এই শিষ্টাচার। সন্তানদের বৈষয়িক ধন-সম্পদ দেওয়ার চেয়ে তাদের সুন্দর শিষ্টাচার শেখানোকে রাসূলুল্লাহ (সা.) শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: *"কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপহার দিতে পারে না।" (জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯৫২)*

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্মান করো (অর্থাৎ তাদের সাথে মার্জিত আচরণ করো) এবং তাদের উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং: ৩৬৭১)*

সমাজে ছোটদের প্রতি স্নেহ এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ইসলামের একটি মৌলিক সামাজিক শিষ্টাচার, যা শৈশবেই পরিবারে চর্চা হওয়া উচিত।

আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের মতে, শৈশবে শেখা শিষ্টাচার শিশুর "Emotional Intelligence" (আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা) এবং "Social Skills" (সামাজিক দক্ষতা) বৃদ্ধি করে।

আচরণিক সৌন্দর্য ও গ্রহণযোগ্যতা: যে শিশু বড়দের দেখলে সম্মান করতে জানে, সুন্দরভাবে কথা বলে এবং বিনয়ী আচরণ করে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত সব জায়গায় সবার স্নেহ ও সহযোগিতা লাভ করে।

পারিবারিক সংস্কৃতির প্রতিফলন: সন্তানের আচরণ মূলত তার পরিবারের দর্পণ। একটি শিশু যখন বাইরে অভদ্রতা বা অশিষ্টাচার প্রদর্শন করে, তখন পরোক্ষভাবে তার পিতা-মাতার শিক্ষা ও পারিবারিক সংস্কৃতির ওপর আঙুল ওঠে। তাই পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার্থেও সন্তানকে আদব শেখানো জরুরি।

নম্রতা ও অহংকার মুক্তি: শিষ্টাচারের অবহেলা শিশুকে আত্মকেন্দ্রিক ও অহংকারী করে তোলে। পক্ষান্তরে, আদব বা বিনয়ের চর্চা শিশুর কচি মন থেকে অহংকার দূর করে তাকে একজন বিনম্র মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

সন্তানকে শেখানোর মতো মৌলিক শিষ্টাচারসমূহ:

- **অনুমতি গ্রহণের শিষ্টাচার (Privacy):** সন্তানকে শেখাতে হবে যে, কারো ব্যক্তিগত কক্ষে বা ঘরে প্রবেশ করার আগে অনুমতি নেওয়া এবং সালাম দেওয়া আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: *"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদের সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।" (সূরা আন-নূর, আয়াত: ২৭)*
- **আহারের শিষ্টাচার:** রাসূলুল্লাহ (সা.) ওমর ইবনে আবু সালামা নামক এক বালককে খাওয়ার টেবিলে হাত নাড়াচাড়া করতে দেখে অত্যন্ত স্নেহের সাথে শিষ্টাচার শিখিয়েছিলেন: *"হে বৎস! আল্লাহর নাম নাও (বিসমিল্লাহ বলো), তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাও।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৫৩৭৬)*

শিষ্টাচার হলো মানুষের জীবনের ভূষণ। সুন্দর পোশাক যেমন মানুষের শরীরকে আবৃত করে, তেমনি সুন্দর আদব মানুষের আত্মাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানদের কেবল জাগতিক বিদ্যায় পারদর্শী করলেই হবে না, বরং তাদের চাল-চলন, কথাবার্তা ও আচরণে ইসলামের শাশ্বত শিষ্টাচারের বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

খ.নিয়মানুবর্তিতা (Cultivating Discipline and Punctuality): সন্তানের সচ্চরিত্র ও সফল জীবন গঠনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হলো নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধ। আরবী পরিভাষায় একে 'আন-নিযাম' (النظام) বলা যায়। নিয়মানুবর্তিতা হলো—জীবনের প্রতিটি কাজ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম, শৃঙ্খলা এবং সঠিক সময়ে সম্পাদন করার অভ্যাস। ইসলাম কেবল কিছু বিশ্বাসের সমষ্টি নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। শৈশবে পরিবার থেকে সন্তান যে শৃঙ্খলার পাঠ পায়, তা-ই তার ভবিষ্যৎ কর্মজীবন, শিক্ষাজীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি তৈরি করে। সন্তানকে অলসতা ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত করে একটি সুশৃঙ্খল রুটিনে অভ্যস্ত করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

সময়ের মূল্য ও ইবাদতের শৃঙ্খলা: ইসলামী জীবনদর্শনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সময়ের কসম বা শপথ খেয়েছেন (যেমন—সূরা আল-আসর: "সময়ের কসম")। এছাড়া ইসলামের প্রতিটি মৌলিক ইবাদত মানুষকে নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ের পাবন্দি শেখায়।

- **সময়ের বাধ্যবাধকতা ও নিয়মানুবর্তিতা:** ইসলামে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো সালাত বা নামাজ, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা বাধ্যতামূলক। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সময়ের শৃঙ্খলা এনে দেয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন: *"নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয করা হয়েছে।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১০৩)।* পিতা-মাতা যখন সন্তানকে শৈশব থেকেই ঠিক সময়ে নামাজ পড়ার অভ্যাস করাবেন, তখন পরোক্ষভাবে তার মধ্যে সময়ের সঠিক ব্যবহারের (Punctuality) অভ্যাস গড়ে উঠবে।
- **শৃঙ্খলার গুরুত্ব:** আল্লাহর রাসূল (সা.) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা পছন্দ করতেন। জামায়াতে সালাত আদায়ের সময় তিনি কাতার সোজা করার ওপর তীব্র জোর দিতেন, যা উম্মতের সামগ্রিক শৃঙ্খলার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (সা.)

বলেছেন: *"তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করো, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে বৈরিভাব বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেবেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৭১৭)*

- **শৈশবেই অভ্যাসের নির্দেশ:** সালাতের মাধ্যমে সন্তানকে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধার প্রক্রিয়াটি সাত বছর বয়স থেকেই শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা একটি দীর্ঘমেয়াদী মনস্তাত্ত্বিক অভ্যাসের (Habit formation) অংশ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তাদের সালাতের নির্দেশ দাও" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং: ৪৯৫)*

আধুনিক শিশু-মনস্তত্ত্বে নিয়মানুবর্তিতাকে শিশুর **"Executive Functioning Skills"** (কার্যকরী পরিচালন দক্ষতা) বৃদ্ধির প্রধান মাধ্যম বলা হয়।

মানসিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাবোধ: যে শিশুরা একটি সুনির্দিষ্ট রুটিন বা নিয়মের (যেমন: নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানো, খাওয়া, পড়া ও খেলাধুলা) মধ্যে বড় হয়, তারা মানসিকভাবে বেশি স্থিতিশীল থাকে। অনিয়ন্ত্রিত ও রুটিনহীন জীবন শিশুর মনে এক ধরণের অবাধ্যতা ও অস্থিরতা তৈরি করে।

অলসতা ও দীর্ঘসূত্রিতা (Procrastination) মুক্তি: নিয়মানুবর্তিতা শিশুকে অলসতা থেকে দূরে রাখে। ইসলামে অলসতাকে মারাত্মক নিন্দনীয় বলা হয়েছে। রাসূল (সা.) দোয়া করতেন: *"হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৮২৩)*। সন্তানকে সময়নিষ্ঠা শেখালে সে নিজের কাজ সঠিক সময়ে শেষ করতে শেখে।

ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য: শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে পেশাদার কর্মজীবন—সর্বত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষেরা নেতৃত্ব দেয়। শৈশবের এই পারিবারিক শৃঙ্খলাই সন্তানকে বড় হয়ে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক ও পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

নিয়মানুবর্তিতা হলো সেই চালিকাশক্তি যা সন্তানের মেধা ও প্রতিভাকে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যায়। শৃঙ্খলাহীন প্রতিভা বা মেধা দিকভ্রান্ত নৌকার মতো। একজন আদর্শ পিতা-মাতা কেবল সন্তানকে আদেশ দিয়ে নয়, বরং নিজেদের জীবনকে নিয়মের শৃঙ্খলে সাজিয়ে (যেমন: রাতে জলদি ঘুমানো ও ভোরে ওঠা) সন্তানের সামনে এক জীবন্ত রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করবেন।

গ. সহমর্মিতাবোধ জাগ্রত করা (Empathy): সন্তানকে শুধু নিজের সুখের কথা চিন্তা করা স্বার্থপর মানুষ না বানিয়ে সমাজ, দরিদ্র ও দুঃখী মানুষের প্রতি দয়া ও সহমর্মিতা প্রকাশ করতে শেখাতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: *"তোমরা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন (আল্লাহ) তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ১৯২৪)*

ঘ. দেশপ্রেম (Teaching Patriotism and Civic Responsibility): সন্তানের সচ্চরিত্র গঠনের একটি অপরিহার্য সামাজিক ও নৈতিক দিক হলো দেশপ্রেম ও স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ। আরবী পরিভাষায় একে বলা হয় 'হুব্বুল ওয়াতান' (حب الوطن)। দেশপ্রেম কেবল একটি আবেগীয় অনুভূতি নয়, বরং এটি মানুষের ঈমানের বহিঃপ্রকাশ এবং সামাজিক দায়িত্বশীলতার অন্যতম প্রধান শর্ত। যে মাটিতে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, যার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠে এবং যার সম্পদ ভোগ করে বেঁচে থাকে—সেই মাটি ও মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা থাকা একটি স্বভাবজাত মানবিক গুণ। সন্তানকে শৈশব থেকেই নিজের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দেশের মানুষের সেবা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব।

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ: ইসলামী জীবনদর্শনে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগত থাকাকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের জন্মভূমি মক্কাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং হিজরতের সময় তাঁর সেই স্বদেশপ্রেমের এক অনন্য আবেগঘন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রচিত হয়েছে।

- **জন্মভূমির প্রতি রাসূল (সা.)-এর হৃদয়ের আকুতি:** মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের কারণে যখন আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করছিলেন, তখন তিনি মক্কার সীমানায় দাঁড়িয়ে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন: *তুমি কতই না উত্তম শহর! আমার কাছে তুমি কতই না প্রিয়! যদি আমার কওম (জাতি) আমাকে তোমার থেকে বের করে না দিত, তবে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কোথাও বসবাস করতাম না।" (জামে আত-তিরমিযী, হাদীস নং: ৩৯২৬)*

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, নিজের জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা রাখা এবং তা ছেড়ে যাওয়ার সময় দুঃখ প্রকাশ করা আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণের সুন্নাহ ও স্বভাবজাত আদর্শ।

- **নতুন স্বদেশের কল্যাণে দোয়া:** মদীনায় হিজরতের পর মদীনা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নতুন স্বদেশ ও ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্র হলো, তখন তিনি মদীনার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন: *"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের কাছে মদীনাকে তেমনি প্রিয় করে দিন, যেমন প্রিয় করেছিলেন মক্কাকে; বরং তার চেয়েও বেশি প্রিয় করে দিন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩৭৫)*
- **দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা:** একটি দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত পুণ্যময় কাজ।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান এবং নাগরিক শিক্ষার (Civic Education) মূল কথাই হলো—একটি উন্নত জাতি গঠনে শৈশব থেকে শিশুর মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে।

নাগরিক দায়িত্ববোধ (Civic Responsibility): দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ হলো দেশের আইন মেনে চলা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ (যেমন: রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানি, পরিবেশ) রক্ষা করা। সন্তান যদি শৈশবে এই শিক্ষা না পায়, তবে সে বড় হয়ে দুর্নীতি, কর ফাঁকি বা দেশের ক্ষতি করতে দ্বিধাবোধ করবে না।

স্বার্থপরতা থেকে মুক্তি: দেশপ্রেম মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হতে দেয় না। এটি শিশুকে শেখায় কীভাবে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের ও দশের কল্যাণে কাজ করতে হয়।

ইতিবাচক সামাজিকীকরণ (Positive Socialization): যে শিশু নিজের দেশের বীরত্বগাঁথা, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং গৌরবময় ইতিহাস জেনে বড় হয়, তার মধ্যে এক ধরণের আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তাবোধ তৈরি হয়, যা তাকে বিশ্বমঞ্চে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

- **দেশপ্রেম মানে কেবল স্লোগান নয়:** সন্তানকে বোঝাতে হবে যে, দেশপ্রেম মানে কেবল মুখে স্লোগান দেওয়া বা নির্দিষ্ট দিনে উৎসব করা নয়; বরং দেশের আইন মেনে চলা, সততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করা, কর ফাঁকি না দেওয়া এবং দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করাই হলো প্রকৃত দেশপ্রেম।

দেশপ্রেম ঈমানের একটি মহৎ শাখা যা মানুষের চরিত্রকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বিশালতা দান করে। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন সে কেবল একজন ভালো মুসলিম বা ভালো মানুষই না হয়, বরং সে যেন তার নিজের দেশ ও মাটির জন্য এক মহান সম্পদে (Human Resource) পরিণত হয়।

নবম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং)সন্তানদের ধর্মীয় অনুশাসনে অভ্যস্ত করা

সন্তানদের শৈশব থেকেই ধর্মীয় অনুশাসন, নৈতিকতা ও সুন্দর চরিত্রের ওপর গড়ে তোলা প্রতিটি অভিভাবকের পবিত্র দায়িত্ব। এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলো সন্তানকে একজন আদর্শ মানুষ ও খাঁটি মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। নিচে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো:

■ **পবিত্রতা ও ইবাদতের অভ্যাস গঠন:** ইসলামে পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। সন্তানদের আত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার পবিত্রতার শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

পবিত্রতা (Cleanliness): সন্তানকে শেখাতে হবে কীভাবে শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। অপবিত্রতা (নাজাসাত) থেকে কীভাবে দূরে থাকতে হয় এবং কীভাবে তা দূর করতে হয়, তা হাতে-কলমে শেখানো উচিত।

অযু (Wudu): নামাযের প্রধান শর্ত হলো অযু। সন্তানকে অযুর ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলগুলো শেখাতে হবে। তারা যেন নিখুঁতভাবে অযু করতে পারে, অভিভাবক নিজে অযু করে তা দেখিয়ে দেবেন।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দিয়ে বিশেষ নিয়মে শরীরের নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ ধৌত করা এবং মাসেহ করাকে ওজু বলে। নামায আদায়, কুরআন তিলওয়াত ও কা'বা শরীফ তাওয়াফের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য ওজু করা ফরয বা আবশ্যক।

ওজুর আহকাম বা নিয়মগুলোকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব। নিচে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

ওজুর ফরয (৪টি): ফরয মানে অত্যন্ত আবশ্যক। ওজুর সময় এই চারটির যেকোনো একটি বাদ পড়লে বা শরীরের নির্দিষ্ট স্থানের সামান্য অংশও শুকনো থাকলে ওজু হবে না। ওজুর ফরয মোট ৪টি:

- ১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া: মাথার ওপরের চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল একবার ধোয়া।
- ২. দুই হাত কনুইসহ ধোয়া: ডান ও বাম—উভয় হাত কনুইসহ অন্তত একবার ভালোভাবে ধোয়া।

- ৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহ করা: ভেজা হাত দিয়ে মাথার চার ভাগের এক ভাগ অন্তত একবার মোছা বা মাসেহ করা।
- ৪. দুই পা টাখনুসহ ধোয়া: উভয় পায়ের টাখনু বা গিরাসহ অন্তত একবার ধোয়া।

ওজুর সুন্নত (১৬টি): রাসুলুল্লাহ (সা.) যেভাবে ওজু করতেন, সে অনুযায়ী ওজু করা সুন্নত। সুন্নত পালন করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং ওজু পরিপূর্ণ হয়, তবে ভুলবশত কোনোটি বাদ পড়লে ওজু ভেঙে যায় না। ওজুর প্রধান সুন্নতগুলো হলো:

- ১. ওজুর শুরুতে মনে মনে নিয়ত করা।
- ২. বিসমিল্লাহ বলে ওজু শুরু করা।
- ৩. ওজু শুরুর আগে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধোয়া।
- ৪. ওজুর শুরুতে মিসওয়াক করা (মিসওয়াক না থাকলে আঙুল দিয়ে দাঁত মাজা)।
- ৫. ডান হাত দিয়ে তিনবার কুলি করা।
- ৬. ডান হাত দিয়ে তিনবার নাকে পানি দেওয়া এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
- ৭. ঘন দাড়ি থাকলে, পানি দিয়ে দাড়ির ভেতরের অংশ খিলাল করা।
- ৮. হাত ও পায়ের আঙুলগুলো একে অপরের ভেতর ঢুকিয়ে খিলাল করা।
- ৯. ফরয অঙ্গগুলো (মুখ, হাত ও পা) এক বারের জায়গায় তিনবার করে ধোয়া।
- ১০. পুরো মাথা একবার একসাথে মাসেহ করা।
- ১১. মাথা মাসেহ করার সাথে সাথেই দুই কান মাসেহ করা।
- ১২. ওজুর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় ধারাবাহিকভাবে ধোয়া (যেমন: মুখের পর হাত, হাতের পর মাথা)।
- ১৩. ওজুর অঙ্গগুলো একটির পর আরেকটি বিরতিহীনভাবে ধোয়া, যেন প্রথম অঙ্গটি শুকানোর আগেই পরেরটি ধোয়া শেষ হয়।
- ১৪. ডান দিকের অঙ্গ আগে এবং বাম দিকের অঙ্গ পরে ধোয়া (যেমন: আগে ডান হাত, পরে বাম হাত)।
- ১৫. হাত-পা ধোয়ার সময় আঙুলের ডগা বা অগ্রভাগ থেকে ধোয়া শুরু করা।
- ১৬. ঘাড় মাসেহ করা (অনেক ফকীহর মতে এটি মুস্তাহাব)।

ওজুর মুস্তাহাব (আদব): ওজুর সৌন্দর্য ও সওয়াব বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু করণীয় রয়েছে, যেগুলোকে মুস্তাহাব বা আদব বলা হয়। এগুলো না করলে কোনো গুনাহ নেই। ওজুর উল্লেখযোগ্য মুস্তাহাবগুলো হলো:

- ১. ওজু করার সময় কিবলামুখী হয়ে বসা।
- ২. উঁচু স্থানে বসে ওজু করা, যেন ব্যবহৃত পানি শরীরে ছিটকে না আসে।
- ৩. ওজু করার সময় দুনিয়াবী বা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা না বলা।
- ৪. পানি ব্যবহারে অপচয় না করা (প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ঢালা মাকরূহ)।
- ৫. ওজু শেষ করার পর দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে ওজুর দোয়া এবং কালমা শাহাদাত পাঠ করা:"আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"
- ৬. ওজু শেষে সম্ভব হলে দুই রাকাত নফল নামায (তাহিয়াতুল ওজু) আদায় করা।

★১ বার ধুলে ফরজ আদায় হয়ে যায়। ৩ বার ধোয়া সুন্নত। ৩ বারের বেশি অযথা ধোয়া অপছন্দনীয় (মাকরুহ) বলে গণ্য করা হয়। তবে মাথা মাসেহ সাধারণত একবারই করা হয়।

গোসল: গোসল শব্দের অর্থ পুরো শরীর পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দিয়ে বিশেষ নিয়মে সমস্ত শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে। সন্তান বড় হওয়ার সাথে সাথে তার ওপর কখন গোসল ফরয হয় এবং ফরয গোসলের নিয়ম কী (কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া এবং সারা শরীরে পানি পৌঁছানো), তা অত্যন্ত শালীনতার সাথে শিক্ষা দিতে হবে।

অযুর মতোই গোসলের নিয়মগুলোকেও প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব। নিচে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হলো:

গোসলের ফরয (৩টি): গোসলের ফরয মানে অত্যন্ত আবশ্যকীয় আমল। এই তিনটির যেকোনো একটি বাদ পড়লে বা শরীরের সামান্য অংশও শুকনো থাকলে গোসল হবে না এবং অপবিত্রতা দূর হবে না। গোসলের ফরয মোট ৩টি:

- ১. গড়গড়াসহ কুলি করা: মুখের ভেতরের প্রতিটি অংশে যেন পানি পৌঁছায়, সেভাবে কুলি করা। (তবে রোযা রাখা অবস্থায় গড়গড়া করা যাবে না, সাধারণ কুলি করলেই হবে)।

- ২. নাকে পানি দেওয়া: নাকের নরম অংশ বা বাঁশরি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো এবং বাম হাত দিয়ে নাক ভালো করে পরিষ্কার করা।
- ৩. সারা শরীরে পানি পৌঁছানো: মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরের চামড়া ও চুলের গোড়ায় এমনভাবে পানি ঢালা, যেন একটি চিলতেও শুকনো না থাকে। (যেমন: নাভি, কানের লতি বা আঙুলের ফাঁকা জায়গাগুলোতে পানি পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে)।

গোসলের সুন্নত (৫টি): রাসুলুল্লাহ (সা.) যেভাবে গোসল করতেন, সেই নিয়ম অনুসরণ করা সুন্নত। এতে গোসলের সওয়াব ও পরিপূর্ণতা বৃদ্ধি পায়। গোসলের সুন্নতগুলো হলো:

- ১. মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা এবং শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা।
- ২. প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে নেওয়া।
- ৩. শরীরের কোনো স্থানে নাপাকী বা ময়লা লেগে থাকলে প্রথমে তা ধুয়ে পরিষ্কার করা।
- ৪. এরপর লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধৌত করা।
- ৫. পুরো শরীর ধোয়ার আগে নামাযের অযুর মতো করে একটি পূর্ণাঙ্গ অযু করা। (তবে গোসলের স্থানে পানি জমে থাকলে পা দুটি সবার শেষে ধুতে হবে)।

গোসলের মুস্তাহাব ও আদব: গোসল করার সময় কিছু আদব বজায় রাখলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং কাজটি সুন্দর হয়:

- ১. এমন স্থানে গোসল করা যেখানে অন্য কারও নজর না পড়ে (পর্দার অন্তরালে)।
- ২. গোসল করার সময় অপ্রয়োজনে কথাবার্তা না বলা।
- ৩. সারা শরীরে প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাম দিকে পানি ঢালা।
- ৪. পানি ব্যবহারে অপচয় না করা।
- ৫. গোসল শেষ করার পর দ্রুত শরীর মুছে পোশাক পরিধান করা।

সন্তানদের যখন বয়স বাড়বে, তখন তাদের ওপর কখন গোসল ফরয হয় (যেমন: প্রাপ্তবয়স্ক হলে বা স্বপ্নদোষ হলে) এবং কীভাবে ফরয গোসল করতে হয়, তা অত্যন্ত শালীনতা ও স্নেহের সাথে শিখিয়ে দেওয়া বাবা-মায়ের দ্বীনি দায়িত্ব।

তায়াম্মুম: শব্দের অর্থ হলো 'সংকল্প করা' বা 'উদ্যোগ নেওয়া'। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানি ব্যবহারে অসুস্থতা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলে—পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়ে মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করাকে তায়াম্মুম বলে।

এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য একটি বিশেষ উপহার ও সহজ সাবলীল ব্যবস্থা, যাতে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতেও মানুষের ইবাদত (বিশেষ করে নামায) বন্ধ না হয়।

তায়াম্মুমের ফরয (৩টি): তায়াম্মুম সঠিক হওয়ার জন্য এই তিনটি কাজ করা ফরয বা বাধ্যতামূলক। এর যেকোনো একটি বাদ পড়লে তায়াম্মুম হবে না:

- ১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা: মনে মনে এই সংকল্প করা যে, "আমি নামায আদায়ের জন্য বা পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুম করছি।"
- ২. সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করা: পবিত্র মাটিতে দুই হাত মেরে তা দিয়ে পুরো মুখমণ্ডল (অযুতে যতটুকু ধুতে হয়) সুন্দরভাবে একবার মুছে বা মাসেহ করা।
- ৩. উভয় হাত কনুইসহ একবার মাসেহ করা: পুনরায় মাটিতে দুই হাত মেরে, বাম হাত দিয়ে ডান হাত কনুইসহ এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাত কনুইসহ একবার মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নতসমূহ: রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী তায়াম্মুমকে পরিপূর্ণ করতে নিচের সুন্নতগুলো পালন করতে হয়:

- ১. শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলা।
- ২. মাটিতে হাত রাখার সময় হাতের আঙুলগুলো খোলা বা প্রসারিত রাখা।
- ৩. মাটিতে হাত মারার পর হাত দুটিতে অতিরিক্ত ধুলোবালি লেগে গেলে তা ঝেড়ে ফেলা বা ফুঁ দিয়ে হালকা করে নেওয়া।
- ৪. প্রথমে মুখমণ্ডল এবং পরে হাত মাসেহ করা (ধারাবাহিকতা বজায় রাখা)।
- ৫. বিরতি না দিয়ে পর পর দুই ধাপে কাজগুলো সম্পন্ন করা।
- ৬. প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত মাসেহ করা।

যেসব কারণে তায়াম্মুম করা জায়েয বা বৈধ: পানি থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তায়াম্মুম করা যাবে না। কেবল নিচের বিশেষ পরিস্থিতিগুলোতে তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে:

- পানির অনুপস্থিতি: আশেপাশে চারদিকের অন্তত এক মাইলের মধ্যে যদি ব্যবহারের উপযোগী কোনো পানি না পাওয়া যায়।
- অসুস্থতার ভয়: শরীরে এমন রোগ থাকলে যা পানি ব্যবহার করলে মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার বা নিরাময় বিলম্বিত হওয়ার নিশ্চিত আশঙ্কা থাকে।
- পানির স্বল্পতা: কাছে যে পানি আছে তা কেবল নিজের বা সঙ্গীদের খাওয়ার জন্য বা জীবন বাঁচানোর জন্য প্রয়োজন হলে।
- শত্রু বা হিংস্র পশুর ভয়: পানির উৎস জানা থাকা সত্ত্বেও সেখানে গেলে শত্রু, চোর বা হিংস্র পশুর আক্রমণের ভয় থাকলে।

যেসব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়: পবিত্র মাটি কিংবা মাটি জাতীয় যেকোনো শুষ্ক বস্তু, যার ওপর ধুলোবালি পড়ে বা যা পুড়লে ছাই হয় না, তা দিয়ে তায়াম্মুম করা যায়। যেমন:

- পবিত্র শুকনা মাটি।
- বালু বা পাথর।
- ইট বা ইটের গুঁড়ো।
- পাকা দেয়াল (যদি তার ওপর চুন বা প্লাস্টিক পেইন্টের মোটা প্রলেপ না থাকে, অর্থাৎ মাটির অস্তিত্ব অনুভূত হয়)।

তায়াম্মুম যেসব কারণে ভেঙে যায়: যেসব কারণে অযু বা গোসল ভেঙে যায় (যেমন: প্রাকৃতিক হাজত, হাওয়া নির্গত হওয়া ইত্যাদি), সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভেঙে যায়। এছাড়া আরও দুটি বিশেষ কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়:

- ১. যে ওযর বা সমস্যার কারণে (যেমন: রোগ বা পানি না পাওয়া) তায়াম্মুম করা হয়েছিল, তা দূর হয়ে গেলে (যেমন: পানি পাওয়া গেলে বা রোগ সুস্থ হয়ে উঠলে)।
- ২. পানি ব্যবহারের সামর্থ্য ফিরে পেলে।

সন্তানদের শেখাতে হবে যে, ইসলাম অত্যন্ত সহজ ও সুন্দর। আল্লাহ আমাদের কষ্ট দিতে চান না বলেই তায়াম্মুমের মতো সহজ বিধান দিয়েছেন। বাড়ির ছাদ বা বারান্দার শুকনো টবে হাত রেখে সন্তানদের এটি হাতে-কলমে অনুশীলন করিয়ে রাখা চমৎকার একটি পারিবারিক শিক্ষা হতে পারে।

নামায আদায় (Establishing Prayer): রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাকে নামাযের নির্দেশ দাও। তাই এই বয়স থেকেই তাদের সাথে

নিয়ে নামায পড়া, মসজিদের পরিবেশে অভ্যস্ত করা এবং ১০ বছর বয়সে নিয়মিত নামাযের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত।

রোযা রাখা (Fasting): সন্তান যখন সহ্য করার মতো বয়সে পৌঁছাবে (সাধারণত ৯-১০ বছর), তখন থেকেই তাকে দু-একটি করে রোযা রাখার অভ্যাস করাতে হবে। এতে শৈশব থেকেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্যের মাধ্যমে আত্মসংযমের শিক্ষা তৈরি হয়।

কুরআন তেলাওয়াত (Quran Recitation): প্রতিদিন সকালে সন্তানকে কুরআন তেলাওয়াতের অভ্যাস করাতে হবে। সহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন শেখানোর পাশাপাশি ছোট ছোট সূরার অর্থ ও শিক্ষা তাদের বুঝিয়ে বলা উচিত।

■ **আত্মিক উন্নয়ন ও আদর্শ চরিত্র গঠন:** ইবাদতের পাশাপাশি সন্তানের মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং মানবিক গুণাবলী জাগ্রত করা আবশ্যক।

নবী প্রেম (Love for the Prophet): সন্তানদের মনে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা তৈরি করতে হবে। এজন্য নবীজীর জীবনীর (সীরাত) সুন্দর ও শিক্ষণীয় গল্পগুলো তাদের শোনানো উচিত, যেন তারা নবীজীকে তাদের জীবনের একমাত্র 'রোল মডেল' মনে করে।

সত্যবাদিতা (Truthfulness): সন্তানকে শেখাতে হবে যে, সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে। যেকোনো পরিস্থিতিতেই হোক না কেন, তারা যেন সত্যি কথা বলে—এমন অভয় ও শিক্ষা পরিবার থেকে দিতে হবে।

আমানতদারীতা (Trustworthiness): অন্যের কোনো জিনিস বা কথা নিজের কাছে রাখলে তা সযত্নে রক্ষা করার নাম আমানতদারীতা। সন্তানকে শেখাতে হবে, কারও কোনো জিনিস না বলে নেওয়া বা নষ্ট করা যাবে না।

ন্যায়পরায়ণতা (Justice): ছোট-বড় সবার প্রতি ন্যায়বিচার ও সমতা বজায় রাখার শিক্ষা দিতে হবে। খেলার মাঠে বা ভাই-বোনদের সাথে আচরণের সময় যেন তারা কারও প্রতি অবিচার না করে, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

ক্ষমা ও উদারতা (Forgiveness and Generosity): কেউ অন্যায় করলে বা কষ্ট দিলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার মানসিকতা সন্তানের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করা যে মহান গুণ, তা তাদের বোঝাতে হবে।

বিনয়-নম্রতা (Humility): অহংকার পতনের মূল। সন্তান যেন চাল-চলনে, কথাবার্তায় এবং আচার-আচরণে বিনয়ী হয়। ছোট-বড় সবার সাথে যেন তারা মৃদু স্বরে ও ভদ্রভাবে কথা বলে।

দানশীলতা (Charity): সন্তানদের হাত দিয়ে গরিব-দুখীকে দান করানোর অভ্যাস করুন। এতে তাদের মন থেকে কৃপণতা দূর হবে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ পাবে।

■ **জীবনমুখী ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা:** সামাজিক জীবনে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু বিশেষ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন।

অল্পেতুষ্টি (Contentment): আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকার নাম অল্পেতুষ্টি। সন্তানকে শেখাতে হবে, অন্যের দামি জিনিস দেখে লোভ না করে নিজের যা আছে, তা নিয়ে যেন তারা আলহামদুলিল্লাহ বলতে শেখে।

মিতব্যয়িতা (Frugality): অপচয়কারী শয়তানের ভাই। সন্তানকে টাকা-পয়সা, খাবার, পানি বা বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হতে শেখাতে হবে। প্রয়োজন ছাড়া কোনো কিছু অপচয় করার কুফল তাদের বোঝাতে হবে।

লজ্জাশীলতা (Modesty/Shyness): লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। পোশাক-আশাকে শালীনতা বজায় রাখা, দৃষ্টি অবনত রাখা এবং যেকোনো অশ্লীল কাজ ও কথা থেকে নিজেকে দূরে রাখার শিক্ষা শৈশব থেকেই দিতে হবে।

সুধারণা (Positive Thinking/Good Assumptions): ইসলামে অন্যের প্রতি কুধারণা (সন্দেহ) করা নিষিদ্ধ। সন্তানকে শেখাতে হবে, স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা পোষণ না করে সবসময় ইতিবাচক বা সুধারণা রাখতে।

হালাল উপার্জন (Halal Livelihood): সন্তানের মনে এই বিশ্বাস গেঁথে দিতে হবে যে, কম হলেও হালাল উপার্জনই বরকতময়। কোনো ধরনের অসদুপায়, চুরি বা ফাঁকি দিয়ে কোনো কিছু অর্জন করা যাবে না।

পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা (Consultation): পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সন্তানদের মতামতকেও গুরুত্ব দিন। এতে তারা বড় হয়ে যেকোনো কাজে একা সিদ্ধান্ত না নিয়ে 'শূরা' বা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করার গুরুত্ব বুঝবে।

পার্থিব লোভ-লালসা ত্যাগ (Detachment from Worldly Greed): দুনিয়ার মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সন্তানকে বোঝাতে হবে যে, এই পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়, পরকালই আমাদের আসল ঠিকানা। তাই অতিরিক্ত বৈষয়িক লোভ-লালসা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে হবে।

ইখলাস (Sincerity/Pure Intention): যেকোনো ভালো কাজ—তা নামায, দান বা পড়াশোনা যাই হোক না কেন—তা যেন লোকদেখানো না হয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। এই খাঁটি নিয়ত বা ইখলাসের শিক্ষা সন্তানকে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

দু'আ (Supplication): সবশেষে, সন্তানকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর কাছে দু'আ করার অভ্যাস করাতে হবে। ঘুমানোর সময়, খাওয়ার আগে-পরে, বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়কার ছোট ছোট মাসনুন দু'আগুলো মুখস্থ করিয়ে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে দিতে হবে।

সন্তানদের ওপর জোরপূর্বক কোনো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে, পিতা-মাতা ও পরিবারের বড়দের নিজেদের জীবনে এই গুণগুলোর চর্চা করতে হবে। কারণ সন্তানরা উপদেশ শোনার চেয়ে বড়দের অনুকরণ করতে বেশি ভালোবাসে।

দশম অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের সুন্নাতী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা

সন্তানদের শৈশব থেকেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুন্নাহ শুধু ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি চমৎকার ও মার্জিত গাইডলাইন। নিচে কতিপয় জরুরী সুন্নাত এবং পোশাক-পরিচ্ছদের শরীয়তের বিধানগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

■ **কতিপয় জরুরী সুন্নাতের বিবরণ:**

ক. পানাহারের সুন্নাত (Sunnah of Eating and Drinking): খাওয়ার আদব সন্তানের স্বভাব ও স্বাস্থ্যে গভীর প্রভাব ফেলে। পানাহারের প্রধান সুন্নাতগুলো হলো:

- খাওয়ার আগে ও পরে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে ধোয়া।
- খাওয়ার শুরুতে উচ্চস্বরে (যেন অন্যরা শুনতে পায়) "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ" বা "বিসমিল্লাহ" বলা। শুরুতে বলতে ভুলে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে "বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু" বলা।
- ডান হাত দিয়ে খাওয়া এবং পান করা। বাম হাত দিয়ে শয়তান আহার করে, তাই এটি শক্তভাবে বর্জন করা।
- বসে খাওয়া এবং সোজা হয়ে বসে খাওয়া (হেলান দিয়ে না বসা)।
- নিজের প্লেটের বা পাত্রের সামনের অংশ থেকে খাওয়া। মাঝখান থেকে না খাওয়া।
- খাবারে কোনো খুঁত বা দোষ না ধরা। ভালো লাগলে খাওয়া, না লাগলে চুপ থাকা।
- খাবার শেষে আঙুল ও পাত্র চেটে পরিষ্কার করা এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দু'আ পড়া: "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমীন।"
- পানি বা যেকোনো পানীয় বসে, ডান হাতে, পাত্রের বাইরে ৩ শ্বাসে পান করা। পাত্রের ভেতরে শ্বাস না ছাড়া।

খ. সালাম (The Sunnah of Greeting): সালাম হলো পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তি বৃদ্ধির সর্বোত্তম মাধ্যম।

- সালামের গুরুত্ব: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দাও।" সন্তানকে শেখাতে হবে যে, ঘরে প্রবেশ করতে, রাস্তায় কারও সাথে দেখা হলে বা কথা শুরু করার আগে সালাম দেওয়া সুন্নাত।
- সালামের পদ্ধতি: সালামের পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো— "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু" (আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক)। উত্তরে বলতে হবে— "ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"।
- নিয়ম: আরোহী ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তিকে, হেঁটে চলা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্প সংখ্যক মানুষ বেশি সংখ্যক মানুষকে আগে সালাম দেবে। ছোটরা বড়দের আগে সালাম দেবে, তবে বড়রা ছোটদের অহংকার ভাঙার জন্য আগে সালাম দিলে তাও অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।

গ. অনুমতি নেওয়া (Seeking Permission): অন্যের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা ইসলামের একটি বড় শিক্ষা। সন্তানকে অন্যের রুমে বা ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়ার অভ্যাস করাতে হবে।

- অনুমতি নেওয়ার পদ্ধতি: কারও ঘরে বা কক্ষে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে বাইরে থেকে সালাম দিতে হবে, তারপর নিজের নাম বলে প্রবেশ করার অনুমতি চাইতে হবে। (যেমন: "আসসালামু আলাইকুম, আমি [নাম], ভেতরে আসতে পারি?")।
- তিনবার নক বা আহ্বান: সর্বোচ্চ তিনবার অনুমতি চাওয়া যাবে (নক করে বা ডেকে)। তিনবার সাড়া না পাওয়া গেলে কোনো ক্ষোভ না রেখে সুন্দরভাবে ফিরে আসতে হবে।
- দরজার সামনে দাঁড়ানোর নিয়ম: দরজার ঠিক মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না, কারণ দরজা খুললে ভেতরের আব্রু নষ্ট হতে পারে। দরজার ডানে বা বামে পাশে চেপে দাঁড়াতে হবে।

ঘ. মজলিসের সুন্নাত (Etiquettes of Gathering): মজলিস বা বসার স্থানের কিছু সুন্নাত ও আদব রয়েছে যা সন্তানকে সামাজিক করে তোলে:

- মজলিসে গিয়ে যেখানে জায়গা খালি পাওয়া যাবে, সেখানেই বসে পড়া। মাঝখান থেকে কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসা সম্পূর্ণ নিষেধ।

- দুইজন মানুষ পাশাপাশি বসে কথা বললে, তাদের অনুমতি ছাড়া তাদের মাঝখানে গিয়ে না বসা।
- মজলিসে কোনো গোপন বা কানাকানি কথা না বলা, যা অন্য তৃতীয় ব্যক্তির মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে।
- মজলিস থেকে ওঠার সময় মজলিসের কাফফারা বা দু'আটি পড়া: "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লা আন্তা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।" এতে মজলিসের ছোটখাটো ভুলত্রুটি ক্ষমা হয়ে যায়।

ঙ. রোগীর সেবা (Visiting the Sick): অসুস্থ মানুষের খোঁজখবর নেওয়া ও সেবা করা মুসলমানের অন্যতম বড় দায়িত্ব।

- কোনো আত্মীয়, বন্ধু বা প্রতিবেশী অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া সুন্নাত।
- রোগীর সামনে গিয়ে তার সুস্থতার জন্য সান্ত্বনাদায়ক কথা বলা এবং তার দীর্ঘায়ুর জন্য আশা জাগানো।
- রোগীর পাশে বেশি সময় বসে থেকে তাকে বিরক্ত না করা (যদি না সে নিজে চায়)।
- রোগীর জন্য দু'আ করা: "লা বা'সা তহুরুন ইনশাআল্লাহ" (ভয় নেই, আল্লাহর ইচ্ছায় এই অসুস্থতা গুনাহ থেকে পবিত্রকারী)।
- রোগীর কাছে নিজের জন্য দু'আ চাওয়া, কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

চ. তাকওয়া অর্জন (Attaining Piety): তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি, অর্থাৎ সবসময় মনে এই সচেতনতা রাখা যে "আল্লাহ আমাকে দেখছেন।" সন্তানদের শৈশব থেকেই এই অনুভূতি দিতে হবে যে, কেউ না দেখলেও আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কাজ ও চিন্তা দেখছেন। এই তাকওয়াই সন্তানকে গোপনে বা প্রকাশ্যে সব ধরণের গুনাহ থেকে দূরে রাখবে।

■ পোশাক-পরিচ্ছদের সুন্নাত ও শরীয়তের বিধান:

পোশাক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। সন্তানকে শৈশব থেকেই মার্জিত পোশাকের অভ্যস্ত করা উচিত।

ক. শালীন ও মার্জিত পোশাক পরিধান করানো:

- পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আব্রু (সতর) ঢাকা এবং শরীরকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করা।
- সন্তানদের এমন পোশাক পরিধান করাতে হবে যা ঢিলেঢালা, মার্জিত এবং যা দেখলে মনে সম্ভ্রম ও ভদ্রতার উদয় হয়।
- পোশাক পরার সময় ডান দিক থেকে পরা (যেমন: ডান হাতা বা ডান পা আগে দেওয়া) এবং খোলার সময় বাম দিক থেকে খোলা সুন্নাত। নতুন পোশাক পরার পর আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

খ. যেসব পোশাক পরিধান করা হারাম: ইসলামে বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে শালীনতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিচের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন পোশাক পরিধান করা সম্পূর্ণ হারাম:

- অঙ্গ প্রকাশকারী পোশাক: পুরুষ বা নারী—উভয়ের জন্যই এমন পাতলা বা আঁটসাঁট (টাইটফিট) পোশাক পরা হারাম, যা পরিধান করলে শরীরের ভেতরের অংশ বা অঙ্গের গঠন প্রকাশ পেয়ে যায়।
- বিজাতীয় ও কাফেরদের সদৃশ পোশাক: ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিকভাবে অমুসলিমদের বিশেষ ধর্মীয় প্রতীক বা অতি উগ্র সংস্কৃতির সদৃশ পোশাক পরিধান করা নিষেধ।
- পুরুষের নারীর পোশাক এবং নারীর পুরুষের পোশাক পরা: রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐসব পুরুষদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা নারীর বেশ ধরে এবং ঐসব নারীদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের বেশ ধারণ করে।

গ. স্বর্ণালঙ্কার ও রেশমী কাপড় পুরুষের জন্য হারাম:

- রাসুলুল্লাহ (সা.) একহাতে স্বর্ণ এবং অন্যহাতে রেশমী কাপড় নিয়ে বলেছিলেন: "এই দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং নারীদের জন্য হালাল।"
- অতএব, ছেলে সন্তানদের শৈশব থেকেই সোনার চেইন, আংটি বা খাঁটি রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে, যেন বড় হয়ে তারা এর প্রতি আসক্ত না হয়।

ঘ. অহঙ্কার ও খ্যাতি অর্জনের জন্য পোশাক পরিধান হারাম:

- টাখনুর নিচে কাপড় পরা (পুরুষের জন্য): পুরুষদের জন্য প্যান্ট, লুঙ্গি, পায়জামা বা জুব্বা টাখনুর (পায়ের গিঁট) নিচে ঝুলিয়ে পরা অহংকারের লক্ষণ এবং তা

হারাম। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই টাখনুর ওপরে কাপড় পরার অভ্যাস করাতে হবে।

- খ্যাতি বা দেখনদারির পোশাক (লিবাসুশ শুহরাহ): সমাজে নিজেকে জাহির করার জন্য, অহংকার দেখানোর জন্য অত্যন্ত বিলাসবহুল ও মাত্রাতিরিক্ত দামি পোশাক পরা, কিংবা নিজেকে দরবেশ প্রমাণ করার জন্য কৃত্রিমভাবে ছেঁড়া-ফাঁটা ও জীর্ণ পোশাক পরা—উভয়টিই ইসলামে নিষিদ্ধ।

ঙ. শৈশব থেকেই পর্দার অনুশীলন করানো:

- পর্দা কেবল প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরের বিষয় নয়, এর মানসিকতা গড়ে ওঠে শৈশবে।
- মেয়ে সন্তানদের বয়স ৭-৮ বছর হওয়ার পর থেকেই বাইরে যাওয়ার সময় ঢিলেঢালা পোশাক ও মাথায় ওড়না বা হিজাব ব্যবহারের অভ্যাস করাতে হবে।
- একইভাবে, ছেলে সন্তানদেরও দৃষ্টি অবনত রাখার (দৃষ্টির পর্দা) শিক্ষা দিতে হবে, যেন তারা অন্য নারীর দিকে কুনজরে না তাকায়।
- সন্তানদের বয়স ১০ বছর হলে তাদের শোবার বিছানা পৃথক করে দেওয়া শরীয়তের নির্দেশ, যা পারিবারিক পর্দার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সন্তানদের সুন্নাতী জীবন শেখানোর সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো পিতা-মাতার নিজস্ব আমল। ঘরটি যদি সুন্নাতী আলোয় আলোকিত হয়, তবে সন্তানরা প্রাকৃতিকভাবেই এই সুন্দর অভ্যাসের দিকে ধাবিত হবে।

একাদশ অধ্যায়: (প্যারেন্টিং) সন্তানদের অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা

কোনো সমাজের সকল সদস্যের মাঝে যদি সুসম্পর্ক, ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম-ভালোবাসা ও আল্লাহর ভয় বিদ্যমান থাকে, তারা পরস্পরের প্রতি সহমর্মী হয়, অন্যের বিপদ-আপদে এগিয়ে আসে, ন্যায় ও নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, অন্যদের অধিকার আদায় করে তাহলে সেই সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, সেই সমাজের সকল সদস্যদের মাঝে শান্তি বিরাজ করে এবং সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। আর যে সমাজের সদস্যরা একে অন্যের অধিকার আদায়ে সচেতন হয় না, যে সমাজের লোকদের মাঝে আল্লাহর ভয় থাকে না, একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে না, সেই সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সে সমাজের মানুষের মনে অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করে, তারা সব সময় চিন্তা-পেরেশানী ও হতাশার মাঝে দিনাতিপাত করে। চুরি, হত্যা, রাহাজানী থেকে শুরু করে সব রকমের অন্যায় ও গর্হিত কাজগুলো সে সমাজে অহরহ ঘটতে থাকে। এছাড়াও অধিকার আদায় না করে মারা যাওয়ার কারণে তাদের পরকালের পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং অনন্তকাল ধরে তাদের জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। তাই সমাজের সকল ব্যক্তিকে অন্যের অধিকার আদায়ে সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি সন্তানদের মাঝেও অন্যের অধিকার আদায় সম্পর্কে সচেতনাবোধ জাগ্রত করতে হবে। যাতে তারা শৈশব থেকে অন্যের অধিকার আদায়ের অনুশীলনের মাধ্যমে বেড়ে উঠে এবং বড় হওয়ার পর তা যথাযথভাবে আদায় করে। তাহলে তাদের দুনিয়ার জীবন হবে সুন্দর এবং আখেরাতের জীবন হবে সাফল্যময়। নিম্নে অন্যের অধিকার আদায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ: সন্তানকে প্রথমেই বোঝাতে হবে যে, মানুষের ওপর প্রধানত দুই ধরনের অধিকার বা হক রয়েছে:

হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার): এর অর্থ আল্লাহর প্রতি মানুষের দায়িত্ব। যেমন— একত্ববাদে বিশ্বাস করা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাত আদায় করা। আল্লাহ চাইলে তাঁর নিজের অধিকার বা ভুলত্রুটি ক্ষমা করতে পারেন।

হাক্কুল ইবাদ (বান্দার অধিকার): এর অর্থ আল্লাহর সৃষ্টি বা মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব। ইসলামে হাক্কুল ইবাদ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কোনো বান্দা যদি অন্য বান্দার হক

নষ্ট করে, তবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলাও তা ক্ষমা করেন না।

২. বাবা-মায়ের অধিকার: সন্তানদের শেখাতে হবে যে, আল্লাহর ইবাদতের পরেই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি অনুগত থাকা।

শ্রদ্ধা ও ওফাদারি: বাবা-মায়ের সাথে কখনো উচ্চস্বরে কথা না বলা এবং তাঁদের অবাধ্য না হওয়া।

বার্ধক্যে সেবা করা: বাবা-মা যখন বৃদ্ধ হন, তখন তাঁদের যত্ন নেওয়া, ভালোবাসানো এবং উফ শব্দটিও না করা।

আর্থিক ও মানসিক স্বস্তি দেওয়া: সামর্থ্য অনুযায়ী বাবা-মায়ের প্রয়োজন পূরণ করা এবং তাঁদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

সন্তানদের উচিত পিতামাতার জন্য বেশি বেশি দুয়া করা: রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা।

৩. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার (আত্মীয়তার বন্ধন): পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার শিক্ষা সন্তানদের শৈশব থেকেই দিতে হবে।

যোগাযোগ রাখা: রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের (দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-ফুফু, মামা-খালা) সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং কুশল বিনিময় করা।

বিপদে পাশে দাঁড়ানো: কোনো আত্মীয় অর্থনৈতিক বা মানসিকভাবে সংকটে পড়লে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করা। ইসলামে একে 'সিলাহ রাহমি' বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা বলা হয়, যা রিজিক ও আয়ু বৃদ্ধি করে।

৪. প্রতিবেশীর অধিকার: প্রতিবেশী হলেন ঘরের কাছের মানুষ, যারা বিপদে-আপদে সবার আগে এগিয়ে আসেন। সন্তানদের শেখাতে হবে:

কষ্ট না দেওয়া: উচ্চশব্দে গান বাজিয়ে, ময়লা-আবর্জনা ফেলে বা যেকোনো আচরণে প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট না করা।

সহযোগিতার হাত বাড়ানো: প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকলে তাকে খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *"সে মুমিন নয়, যে নিজে তৃপ্তি সহকারে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।"*

৫. শিক্ষকের অধিকার: শিক্ষক হলেন মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পিতা, যিনি অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করে আলোর পথ দেখান।

সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া: শিক্ষকের সামনে বিনীত থাকা, তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এবং তাঁকে সালাম ও শ্রদ্ধা জানানো।

সমালোচনা না করা: শিক্ষকের কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লেও তা নিয়ে আড়ালে সমালোচনা বা উপহাস না করা।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ: জীবন গঠনে শিক্ষকের অবদানের কথা আজীবন মনে রাখা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা।

৬. বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়সীদের অধিকার: সামাজিক জীবনের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকে বন্ধু-বান্ধব। সন্তানদের শেখাতে হবে ভালো বন্ধুত্বের মূলনীতি:

পারস্পরিক বিশ্বস্ততা: বন্ধুর গোপন কথা রক্ষা করা এবং বিপদের সময় পিঠটান না দিয়ে পাশে থাকা।

পরনিন্দা না করা: বন্ধুদের আড়ালে তাদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা গিবত না করা।

ভালো কাজের পরামর্শ দেওয়া: বন্ধু কোনো ভুল পথে গেলে তাকে বুঝিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়া।

৭. অমুসলিমদের অধিকার: ইসলাম একটি বৈশ্বিক ও মানবিক ধর্ম। সমাজে বসবাসকারী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচরণের শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্মান: অন্য ধর্মের মানুষের উপাসনা ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের দেব-দেবী বা ধর্মীয় অনুভূতির ওপর আঘাত না করা।

সামাজিক ন্যায়বিচার: অমুসলিম প্রতিবেশীর বিপদে এগিয়ে যাওয়া, তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেনে শতভাগ সততা বজায় রাখা এবং কোনোভাবেই তাদের ওপর জুলুম না করা।

যথাসম্ভব অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া।

৮. বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ: জাতীয়তা, বর্ণ, ভাষা বা ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে পুরো মানবজাতিকে একটি পরিবার হিসেবে দেখার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

বর্ণবাদ ও বৈষম্যহীনতা: গায়ের রঙ, ভাষা বা বংশের কারণে কাউকে ছোট না করা। সব মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান—এই চেতনা জাগ্রত করা।

মানবিক বিপর্যয় রোধে ভূমিকা: পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মানুষ (যেমন—যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষ) কষ্টে থাকলে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সম্ভব হলে সাহায্যের হাত বাড়ানো।

৯. পশু-পাখি ও জীব-জন্তুর অধিকার: ইসলামে কেবল মানুষের নয়, অবলা জীব-জন্তুর অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে। সন্তানদের দয়ার্দ্র হৃদয়ের মানুষ করতে এটি শেখানো জরুরি:

অহেতুক কষ্ট না দেওয়া: খেলার ছলে কোনো পশু-পাখিকে ঢিল না মারা, খাঁচায় বন্দী করে কষ্ট না দেওয়া বা তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা না চাপানো।

ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ: অবলা প্রাণীকে সময়মতো খাবার ও পানি দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন পাপী নারী কেবল একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে জান্নাতি হয়েছিল, আবার অন্য এক নারী একটি বিড়ালকে আটকে রেখে না খাইয়ে মেরে ফেলার কারণে জাহান্নামী হয়েছিল।

সন্তানদের এই অধিকারগুলো শুধু মুখে শেখালে হবে না, বাবা-মাকে নিজের আচরণের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করতে হবে। যখন একটি শিশু দেখবে তার বাবা-মা প্রতিবেশীর খোঁজ নিচ্ছেন বা পশু-পাখির প্রতি দয়া করছেন, তখন সে নিজে থেকেই এই গুণগুলো ধারণ করবে।

দ্বাদশ অধ্যায়: তরুণ ছেলেমেয়েদের কিছু সমস্যা ও সমাধান

মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো তারুণ্য ও যৌবনকাল। একটি দেশ, একটি জাতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও হলো তরুণ ও যুবসমাজ। একটি সমাজ ও জাতির তরুণ ও যুবকরা যদি সচ্চরিত্রবান, আদর্শবান হয়, ঈমান-আকীদায় পরিশুদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী হয়, তবে সমাজ ও জাতির অন্য সদস্যরাও এমনিতেই আদর্শ, উন্নত চরিত্র ও সফল জীবনের সন্ধান পায়। একমাত্র যুব সমাজই একটি জাতির মাঝে জাগরণ এনে তাদের মাঝে আমূল পরিবর্তন-পরিবর্ধন এনে দিতে সক্ষম। এ সময় যেমন তাদের গায়ে থাকে প্রচণ্ড শক্তি, তেমনি তাদের চিন্তা-ধারাও হয় শানিত ও ক্ষুরধার। ইলম ও জ্ঞান অন্বেষণের জন্য যেমন যৌবনকাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেশের জন্য যুদ্ধ করাসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সকল কাজ সমাধার জন্যও যৌবনকাল উপযুক্ত সময়।

মুসলমানদের গৌরবোজ্জল অতীত ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়- ইসলামের সেবায় যুব সমাজই সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলো। আলী (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.), আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রা.), মাআয বিন জাবাল (রা.), যায়িদ বিন সাবিত (রা.) সহ প্রমুখ যুবক সাহাবায়ে কেরামই মহানবী সা. এর রেখে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ মিরাস ইলমুল হাদীসকে সংরক্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে যত্নের সাথে পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যদিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ও মুসান্না বিন হারিসা (রা.) এর মত প্রমুখ যুবক সাহাবীরা সমর নায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে সারা পৃথিবীতে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজকের যুবকেরাও নবী যুগের যুবক সাহাবায়ে কেরামগণের উত্তরসুরী। সুতরাং সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধানে, দীন ইসলাম রক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারে এ যুগের যুবসমাজকে সে যুগের যুবসমাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে।

■ তরুণ ও যুবকদের কিছু প্রধান সমস্যা ও সমাধান:

বর্তমান যুগের যুবকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা সমাজের বিপরীত ও ক্ষতিকর স্রোতধারায় গা ভাসিয়ে দেয়। সমাজের অন্যরা কী করছে, শুধু তার অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিবেচনা করার চেষ্টা করে না, এই স্রোতধারায় নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া তার জন্য কল্যাণকর হবে নাকি ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক হবে তা অনুধাবনের চেষ্টা করে না। অনুকরণ প্রিয় হওয়ায় খুব সহজেই

তারা বিভিন্ন খারাপ ও অনর্থক কাজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। রেড়িও, টেলিভিশন ইত্যাদিতে গান শুনা, সিনেমা দেখা, অশ্লীল ভিডিও দেখা, অশ্লীল ম্যাগাজিন, পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি পাঠে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের চরিত্র কলুষিত হয়ে উঠছে। আচার-ব্যবহার ও আকীদা-বিশ্বাস দূষিত হচ্ছে। তাদের মাঝে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবের জন্ম হচ্ছে। অনেকের মাঝে আবার নাস্তিকতার বীজ রোপিত হচ্ছে। আর এসবের মূল কারণ একটাই, তারা সামনে যা পাচ্ছে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সব গোগ্রাসে গিলছে। বর্তমান যুগের যুব সমাজের আরেকটি সমস্যা হলো দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি উদাসীনতা। এর কারণ হলো, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দীন সম্পর্কে পর্যাপ্ত শিক্ষা না দেওয়া। যার ফলে তারা ভালো-মন্দ, উপকারী-অপকারী, কল্যাণকর-অনিষ্টকর বিষয়গুলো সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। হালাল-হারামের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। এমনকি পার্থক্য করার প্রয়োজনও মনে করে না। এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করা প্রয়োজন। আমাদের স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিগুলোতে ঈমান, আমল, হালাল-হারামের পরিচয়, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ও পূর্ণ ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরী। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিগুলোতে এসব শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জনের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। তাই আমাদের সন্তানদেরকে পারিবারিক ও ঘরোয়াভাবে দীন সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাদেরকে দীনি বিষয়ে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করা আবশ্যক। কিংবা যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীন সম্পর্কে স্পষ্ট ও সহীহ-শুদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানে আমাদের সন্তানদের পড়ালেখার ব্যবস্থা করা দরকার। দীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের পর তাদেরকে স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে অধ্যয়ন করানোতে কোনো ক্ষতি নেই। দ্বিতীয়ত সন্তানদেরকে বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী আলেমদের সংশ্রব গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে তারা তাদের যাবতীয় সমস্যাগুলো আলেমদের কাছে বলে এবং তাদের থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়ে জীবন পরিচালনা করতে পারে। তৃতীয়ত তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও উপকারী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে হবে। যাতে তারা এসব তথ্য-উপাত্ত থেকে দীন ইসলাম সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পায় এবং সে অনুযায়ী নিজেকে পরিচালালনা করতে পারে। বর্তমান তরুণ ও যুবসমাজের মাঝে কিছু সমস্যা ভয়াবহ ও প্রকট আকার ধারণ করেছে। নিম্নে তা উল্লেখ করে সমাধানের সম্ভাব্য উপায় উপস্থাপন করা হলো।

ক. ধর্মবিমুখতা: বর্তমান যুগের তরুণদের একটি বড় অংশের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসন ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি উদাসীনতা দেখা যায়। পশ্চিমা জীবনধারা এবং ভোগবাদী মানসিকতা এর অন্যতম কারণ।

সমাধান: শৈশব থেকেই পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করা। সন্তানদের যান্ত্রিকভাবে ধর্ম না শিখিয়ে, ধর্মের সুন্দর, যৌক্তিক ও মানবিক দিকগুলো বন্ধুসুলভ আচরণে বুঝিয়ে বলা।

খ. গোঁড়ামি ও চরমপন্থা: ধর্মবিমুখতার ঠিক বিপরীত পিঠ হলো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও চরমপন্থা (Extremism)। সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে কিছু তরুণ উগ্রবাদী ও উগ্র চিন্তাভাবনার দিকে ধাবিত হয়, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক।

সমাধান: ইসলামে মধ্যপন্থা (Moderation) অবলম্বনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তরুণদের বোঝাতে হবে যে, ইসলামে কোনো ধরনের উগ্রতা বা নিরপরাধ মানুষের ওপর আঘাতের স্থান নেই। আলেম সমাজ ও পরিবারের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত ও উদার বাণী তরুণদের কাছে পৌঁছাতে হবে।

গ. ধূমপান: ধূমপানকে অনেক তরুণ 'স্মার্টনেস' বা আভিজাত্যের প্রতীক মনে করে ভুল পথে পা বাড়ায়। এটি পরবর্তী সময়ে বড় ধরনের মাদকাসক্তির প্রবেশদ্বার (Gateway) হিসেবে কাজ করে।

সমাধান: ধূমপানের স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক ক্ষতি নিয়ে তরুণদের সচেতন করা। সন্তান কার সাথে মিশছে, তার বন্ধুদের খোঁজখবর রাখা।

ঘ. মাদকাসক্তি: হতাশা, বন্ধুদের প্ররোচনা, পারিবারিক কলহ বা কৌতুহলের বশে তরুণরা মাদক (যেমন: ইয়াবা, আইস, ফেন্সিডিল ইত্যাদি) গ্রহণ শুরু করে। এটি একটি জীবন ও পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়।

সমাধান: পরিবারে সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, যেন তারা যেকোনো মানসিক চাপ বাবা-মায়ের সাথে শেয়ার করতে পারে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সেবামূলক কাজে তরুণদের ব্যস্ত রাখা। আসক্ত হয়ে পড়লে কোনো সংকোচ না করে দ্রুত রিহ্যাবিলিটেশন (কাউন্সেলিং ও চিকিৎসা) সেন্টারের সাহায্য নেওয়া।

ঙ. তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার: স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের অতিরিক্ত আসক্তি (Screen Addiction) তরুণদের পড়াশোনা, বাস্তব সামাজিক জীবন এবং ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। এর ফলে সাইবার ক্রাইম, পর্নোগ্রাফি আসক্তি এবং মানসিক বিষণ্ণতা বাড়ছে।

সমাধান: প্রযুক্তির ব্যবহারে 'প্যারেন্টাল কন্ট্রোল' নিশ্চিত করা। ডিভাইস ব্যবহারের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া। ভার্চুয়াল জগৎ ছেড়ে মাঠের খেলাধুলা এবং বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।

চ. অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন: সংস্কৃতির প্রভাব ও ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে বিয়ের আগে অবাধ মেলামেশা ও অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া তরুণদের মাঝে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এর ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া, প্রতারণা এবং আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটছে।

সমাধান: সন্তানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ (Self-control) এবং লজ্জাশীলতার শিক্ষা দেওয়া। উপযুক্ত বয়সে পৌঁছালে এবং সামর্থ্য থাকলে বিয়ের বিষয়টিকে সহজ করা এবং পারিবারিকভাবে সমর্থন দেওয়া।

ছ.কথা-বার্তায় বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: মাতৃভাষা বাংলার সাথে অহেতুক হিন্দি, ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষার বিকৃত মিশ্রণ ঘটিয়ে (বাংলিশ বা কোড-মিক্সিং) কথা বলাকে অনেকে আধুনিকতা মনে করে। এর ফলে নিজস্ব ভাষার গৌরব ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সমাধান: পরিবারে শুদ্ধ বাংলা ভাষা চর্চার পরিবেশ তৈরি করা। নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ইতিহাস তরুণদের সামনে তুলে ধরা।

জ. পোশাক-আশাকে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: শালীনতা ও নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় না রেখে ওয়েস্টার্ন বা বিদেশী সিনেমার অন্ধ অনুকরণে খোলামেলা বা দৃষ্টিকটু পোশাক পরিধানের প্রবণতা বাড়ছে।

সমাধান: ফ্যাশনের নামে শালীনতার পরিপন্থী পোশাক পরিহার করার শিক্ষা দেওয়া। ইসলাম ও দেশীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী শালীন ও মার্জিত পোশাক পরিধানে উৎসাহিত করা।

ঝ. দিবস পালনের নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ: থার্টি ফার্স্ট নাইট, ভ্যালেন্টাইনস ডে (ভালোবাসা দিবস), হ্যালোইন ইত্যাদির নামে অপসংস্কৃতি, মদ্যপান, ডিজে পার্টি এবং বেহায়াপনার জোয়ারে তরুণরা ভেসে যাচ্ছে।

সমাধান: তরুণদের বোঝানো উচিত যে, আনন্দের নামে এমন কোনো উৎসব করা উচিত নয় যা নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দেশীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। বিকল্প হিসেবে জাতীয় উৎসব ও সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা।

তরুণদের এই সমস্যাগুলো শুধু শাসন বা বকাঝকা করে দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ভালোবাসা, সময় এবং সঠিক দিকনির্দেশনা।

১. পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা: বাবা-মাকে সন্তানের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হতে হবে।

২. নৈতিক শিক্ষা: শুধু প্রাতিষ্ঠানিক জিপিএ-৫ এর পেছনে না ছুটিয়ে সন্তানকে নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

৩. ভালো সঙ্গ নিশ্চিত করা: সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। সন্তান কেমন বন্ধুদের সাথে সময় কাটাচ্ছে, সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

বিশেষ কিছু নসিহত

১. আবাসন ও প্রতিবেশী নির্বাচন:

বাড়ি বানানোর জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন ও নকশা তৈরি: একটি বাড়ি শুধু ইট-পাথরের দেয়াল নয়, এটি মানসিক শান্তি ও ইবাদতের কেন্দ্র।

- **জায়গা নির্বাচন:** আবাসন তৈরির জন্য এমন জায়গা বেছে নেওয়া উচিত যেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, যাতায়াত ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা রয়েছে। বিশেষ করে কাছাকাছি মসজিদ এবং একটি ভালো পরিবেশ থাকা জরুরি।
- **নকশা তৈরি:** বাড়ির নকশা করার সময় পরিবারের গোপনীয়তা (Privacy) এবং পর্দার বিধানের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। ড্রয়িং রুম বা বসার ঘরটি এমনভাবে রাখা উচিত যাতে বাইরের মেহমানরা এলে ঘরের ভেতরে থাকা নারীদের চলাচলে কোনো অসুবিধা না হয়।

বাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন: আরবিতে একটি বিখ্যাত প্রবাদ আছে— *"আল-জারু ক্বলাদ-দার"* (বাড়ি কেনার আগে প্রতিবেশী খোঁজো)।

- অসৎ বা ঝগড়াটেই প্রতিবেশীর কারণে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে, যা আপনার সন্তানদের মানসিক বিকাশেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- দীনদার ও ভালো প্রতিবেশী বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায় এবং নেক কাজে উৎসাহিত করে। তাই আবাসন চূড়ান্ত করার আগে চারপাশের মানুষজন কেমন, তা একটু খোঁজ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

২. ঘরের অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও আরামের ব্যবস্থা:

প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ ও আরামের জিনিস পর্যাপ্ত রাখা: ইসলাম বৈরাগ্যবাদ সমর্থন করে না; সাধ্যের মধ্যে জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করা অন্যায় নয়।

- **রক্ষণাবেক্ষণ:** ঘরে কোনো ভাঙাচোরা বা ত্রুটি (যেমন: পানির লাইনে লিক, বৈদ্যুতিক সমস্যা) থাকলে তা দ্রুত মেরামত করা উচিত, যাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
- **পর্যাপ্ত আরাম:** ক্লান্তি দূর করার জন্য ঘরে প্রয়োজনীয় আসবাব, আরামদায়ক বিছানা বা গরম-ঠাণ্ডার অনুকূল পরিবেশ (যেমন ফ্যান বা এসি) রাখা ভালো,

যাতে পরিবারের সদস্যরা ঘরে প্রশান্তি পায় এবং সুস্থ শরীরে ইবাদত করতে পারে।

৩. আধ্যাত্মিক ও শারঈ পরিবেশ রক্ষা:

ঘরে কুকুর ও মূর্তি না রাখা: ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী, যে ঘরে কুকুর এবং (প্রাণীর) ছবি বা মূর্তি থাকে, সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

- **কুকুর প্রীতি বর্জন:** শিকার বা বাড়ি পাহারার মতো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া শখ করে ঘরের ভেতরে কুকুর রাখা ও তাদের পেছনে অতিরিক্ত অর্থ-সময় ব্যয় করা ইসলামে নিষিদ্ধ।
- **মূর্তি ও ছবি বর্জন:** ঘরে কোনো ধরনের ভাস্কর্য, মূর্তি বা দেয়ালে টাঙানো প্রাণীর ছবি রাখা যাবে না। এগুলো রহমত থেকে ঘরকে বঞ্চিত করে।

হারাম কাজ ও শরিয়ত বিরোধী জিনিস বন্ধ করা: ঘরকে আল্লাহর অবাধ্যতার আখড়া বানানো যাবে না। গান-বাজনা, জুয়া, বা যেকোনো ধরনের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থেকে ঘরকে মুক্ত রাখতে হবে। যে ঘরে আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলওয়াত হয়, সে ঘরে শান্তি ও বরকত নেমে আসে।

ঘরে ধূমপান নিষিদ্ধ করা: ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং এটি একটি অপচয়। ঘরের ভেতর ধূমপান করলে পরিবারের অন্য সদস্যরা (বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা) পরোক্ষ ধূমপানের (Second-hand smoking) শিকার হয়। তাই ঘরকে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত (Smoke-free Zone) ঘোষণা করতে হবে।

টেলিভিশন/মনিটর অপসারণ বা নিয়ন্ত্রণ: টেলিভিশন বা বড় মনিটর অনেক সময় পারিবারিক সময় নষ্ট করে এবং এর মাধ্যমে ঘরে অশ্লীলতা ও অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। যদি এটি পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব না হয়, তবে এর ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—যাতে কেবল শিক্ষণীয়, তথ্যমূলক বা দীনদারী বৃদ্ধি করে এমন বিষয়ই দেখা যায়।

৪. নিরাপত্তা, পর্দা ও পারিবারিক শৃঙ্খলা:

দৈনন্দিন হিফাজতের আমল করা: ঘরকে শয়তানের কুপ্রভাব ও নজর (বদনজর) থেকে বাঁচাতে দৈনিক আমল জরুরি।

- ঘরে প্রবেশের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা ও সালাম দেওয়া।
- নিয়মিত সূরা আল-বাকারাহ তিলওয়াত করা (হাদিস অনুযায়ী, যে ঘরে সূরা বাকারাহ পড়া হয়, সেখান থেকে শয়তান পালিয়ে যায়)।

- সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন দোয়াসমূহ এবং আয়াতুল কুরসি পাঠ করা।

স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়রে-মাহরাম পুরুষের প্রবেশ রোধ: পারিবারিক পবিত্রতা ও নিরাপত্তার জন্য এটি অত্যন্ত সংবেদনশীল একটি বিষয়। স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোনো গায়রে-মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ, যেমন: দেবর, ভাসুর, খালতো/ফুপাতো ভাই বা বাইরের কোনো পুরুষ) পুরুষকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না। রাসুলুল্লাহ (সা.) দেবর/ভাসুরকে 'মৃত্যু'র সাথে তুলনা করে এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন।

পারিবারিক সাক্ষাতে নারী-পুরুষের ভিন্ন ব্যবস্থা: পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠান বা আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে বেড়াতে এলে 'মিক্সড গ্যাদারিং' বা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পরিহার করতে হবে।

- পুরুষ মেহমানদের বসার জন্য আলাদা কক্ষ (ড্রয়িং রুম) এবং নারীদের জন্য ভেতরের আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে উভয় পক্ষই স্বাচ্ছন্দ্যে ও পর্দার সাথে সময় কাটাতে পারে।

গৃহকর্মী ও গাড়ি চালকদের ব্যাপারে সতর্কতা: বাড়ির কাজের লোক বা ড্রাইভাররা ঘরের ভেতরের অনেক গোপনীয় বিষয় জেনে ফেলার সুযোগ পায়।

- তারা যেন ঘরের মূল অন্দরে অবাধে যাতায়াত করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- বিশেষ করে সাবালক কাজের ছেলে বা পুরুষ ড্রাইভারদের সাথে ঘরের নারীদের পর্দার বিধান কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক।

মেয়েলি স্বভাবের পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা: কিছু পুরুষ স্বভাবগত বা কৃত্রিমভাবে নারীদের মতো আচরণ করে (যাদের হিজড়া বা মেয়েলি স্বভাবের পুরুষ বলা হয়)। অনেক সময় সরল বিশ্বাসে এদের ঘরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয়। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এরাও পুরুষ, তাই ঘরের মা-বোনদের নিরাপত্তা ও পর্দার স্বার্থে এদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করা জরুরি।

এই নাসিহা বা উপদেশগুলো মেনে চললে একটি বাড়ি কেবল চার দেয়ালের বাসস্থান থাকবে না, বরং তা দুনিয়াতেই একটি 'জান্নাতী সুকুন' বা পরম শান্তির নীড়ে পরিণত হতে পারে, ইন শা আল্লহ।

উপসংহার

পরিবার হ'ল সমাজের মৌলিক ভিত্তি, সামাজিক জীবনের প্রথম ক্ষেত্র, মানবসমাজের শান্তি-সুখের নীড়, পারস্পরিক সহযোগিতার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি ও উত্তম সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিবার হচ্ছে সভ্যতার একক, মানুষ গড়ার মূল কেন্দ্র, কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক অনন্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। মানববংশের জন্যে এক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। পারিবারিক জীবন সমাজের প্রাণকেন্দ্র, মানবসমাজের লালন ক্ষেত্রে, স্নেহ-ভালোবাসা, দয়ামায়া, ক্ষমা-করুণার মতো উত্তম মানবিক গুণাবলীর সৃজনভূমি। কঠিন পৃথিবীর বুকে পরিবার হচ্ছে আপন অস্তিত্ব বিকাশের এক অনন্য পীঠস্থান। একে সামগ্রিক জীবনের প্রথম ভিত্তি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পরিবারকে রাষ্ট্রেরও প্রথম স্তর বলা যায়। বস্তুতঃ পরিবারেরই বিকশিত ও বিস্তৃত রূপই রাষ্ট্র। পরিবার ও সমাজের সুসংবদ্ধ দৃঢ়তার উপর রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তাই পরিবার রাষ্ট্রের এক-একটি দুর্গ। আর পারিবারিক জীবন অনাবিল প্রেম-ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা এবং শান্তি ও স্বস্তির কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারই মানুষকে প্রদান করে সমষ্টিগত ভবিষ্যত নির্মাণের মহান লক্ষ্য। আর এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নে মানুষ নিজের মেধা ও বিবেক দিয়ে সাধ্যমত কাজ করে বরে তারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। প্রাচীনকাল থেকেই বিপদ-মুছীবতে পরস্পরের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্যরা একাত্ম হয়ে থেকেছে।

মানুষ পরিবার প্রথা অবলম্বনের মাধ্যমে সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণ করেছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল আয়োজনে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলেছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ পারিবারিক জীবন মন ও প্রাণের গভীর মিলনসূত্রে গ্রথিত নয়; মন-প্রাণ ও দেহের মিলন ও একাত্মতার নিরাপদ ঠিকানা নয়। তাই পরিবার ও পারিবারিক জীবন অনেকটাই বিপর্যস্ত। অথচ মানুষকে ভালোবাসা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সম্প্রীতি-সম্ভাব ও সহানুভূতি প্রভৃতি সুকোমল বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করে দিলে তখন আর মানুষ প্রকৃত মানুষ থাকে না। পরিবার প্রথা যেখানে ভগ্নপ্রায়, মানসিক প্রশান্তি সেখানে অনুপস্থিত। আমাদের দিনের শুরু ও শেষটা হয় ঘর থেকেই। নারী-পুরুষের সম্মিলিত ও পরস্পরের সম-অধিকারসম্পন্ন যৌথ প্রতিষ্ঠান পরিবার গড়েই ওঠে উচ্চতর এক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। সামাজিক বিধান বাস্তবায়নে পরিবারই সমাজে সার্থক ভূমিকা পালন করতে

পারে, যাতে সুস্থ সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা লাভ হয়। পরিবারকে কেন্দ্র করেই আত্মীয়তা, সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ কাজের মাধ্যমে তা সফলতা লাভ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও নারীর সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে এবং মানুষের ব্যক্তিগত মানবিক উন্নয়ন ও বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে পরিবারের কোন বিকল্প নেই।

পরিবার প্রথা মানুষকে সৃষ্টির সেরা প্রাণী হিসাবে জগতের বুকে স্থান করে দিয়েছে। যুগে যুগে মানুষের কল্যাণ সাধন করে এসেছে। দিনে দিনে এর গুরুত্ব ও কাজের ক্ষেত্র আরও বেড়ে চলেছে। পরিবারই সম্মিলন ঘটায় এমন স্থায়ী সঙ্গী ও একান্ত নির্ভরযোগ্য সাথীদের, যারা জীবন সংগ্রামে কষ্টকর অভিযানে সকল ক্ষেত্রে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ছায়ার মতো সহযোগী হয়ে থাকে। অকৃত্রিম সঙ্গী, দরদী সাথী, অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবে দায়িত্ব পালন করে এবং তারা হয় প্রকৃত সহযাত্রী ও পরম সান্ত্বনা দানকারী একান্ত আশ্রয়। ব্যক্তির যাবতীয় বিকাশ, মননগত উন্মেষ ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় পারিবার থেকেই। তাই সমাজ ও সামাজিক জীবনের সাফল্যের জন্যে পরিবার অপরিহার্য। স্মর্তব্য যে, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা, উন্নতি ও অগ্রগতি ইত্যাদি পারিবারিক সুস্থতা ও দৃঢ়তার উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। পরিবারের লক্ষ্য হচ্ছে এক উন্নত নৈতিক, নির্দোষ-নিষ্কলুষ ও পবিত্র জীবন যাপন। প্রকৃত প্রেম-ভালোবাসা ও প্রীতি-প্রণয় পরিবারের মধ্যেই বিকশিত হয়। তাই সুষ্ঠু রীতি-নীতির ভিত্তিতে পরিবার গঠন, সুন্দর আচরণের মাধ্যমে পরিবার সুরক্ষা এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের মাধ্যমেই সামগ্রিক কল্যাণের পথে সমাজ অগ্রসর হ'তে পারে। আধুনিক যুগে শিশুদেরকে সুনাগরিক করে গড়ে তোলার এবং বয়স্কদের মানসিক প্রশান্তির জন্য পরিবারের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখ্য যে, পরিবার অপরাধ, হিংস্রতা ও সন্ত্রাস ইত্যাদি দমনের শক্তিশালী মাধ্যম। সমাজ থেকে এসব দূরীকরণে পরিবার বাস্তব ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিশুর সঠিক মানসিক বিকাশের জন্য পরিবারের সান্নিধ্য অতীব জরুরি। শান্তি-সুখ, তৃপ্তি-নিশ্চিন্ততা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ এবং জীবনে সত্যিকার সাফল্য ও কল্যাণ লাভে প্রয়োজনীয় কর্মপ্রেরণা সুস্থ ও সুন্দর পরিবার থেকেই আসে। পারিবারিক জীবন আদর্শভিত্তিক, পবিত্র ও মাধুর্যপূর্ণ না হলে সমগ্র জীবনের সার্বিক দিক ও বিভাগ নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত, বিষাক্ত ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে পড়বে। তাই এদিকে সবাইকে সজাগ ও সচেতন হওয়া দরকার। পরিবারে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করলে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে স্ব-স্ব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করলে এবং একে অপরের হক আদায় করলে পারিবারিক

জীবনে বইবে শান্তির মৃদু সমীরণ; পরিবার হবে সুখের আকর। সম্প্রীতি-সদ্ভাব আর প্রীতির বন্ধনে সবাই থাকবে আবদ্ধ। এজন্য নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তির নামে আন্দোলন-সংগ্রাম, সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করার কোন দরকার হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে অনুরূপ পরিবার গঠনের তাওফীক দিন-আমীন!

তথ্যসূত্র

বই:

১. ইসলামি পরিবার গঠনের উপায়

২ .কুরআন হাদিসের আলোকে ইসলামি পরিবার গঠন ও সন্তান প্রতিপালন

৩. ইসলামি পরিবার সিরিজ

৪. ফ্যামিলি ম্যানেজমেন্ট

৫. আদর্শ দ্বীনি পরিবার (আদব ও শিষ্টাচার)

৬. আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ টি উপদেশ

সোস্যাল প্লাটফর্ম:

১. আই ফতোয়া

২. মাসিক আল কাউসার

৩. ChatGPT

৪. Google ইত্যাদি